এক বৃন্ত দুই কুসুম

সম্পাদক উদয় চক্রবর্তী

পাণ্ডুলিপি
২৬/২বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

EK BRINTA DUI KUSUM
Editor : Uday Chakrabarti

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬৪

মূল প্রাপ্তিস্থান :
কমলা প্রকাশনী
১৪, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য
অলংকরণ : উদয় চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ৯১ ☐ প্রকাশক : মানস ভট্টাচার্য, প্রযত্নে : মাণিক দাস, ২৬/২বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ ☐ মুদ্রণে : নির্মলা প্রেস, দুলালচন্দ্র ঘোষ, ৩২/ই জয় মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৫ ☐ প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ওয়েলনোন প্রিন্টার্স, কলকাতা-৯

প্রসঙ্গত

এই সমাজদেহে এখন অনেক রকমের ক্ষত। বিষাক্ত ক্ষত। এ-বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। সময়ের সরণী ধরে মাত্র কয়েক পা পিছু হাঁটলেই ইতিহাস আমাদের উপহার দেবে বেশ কিছু দাঙ্গা নয়ত গৃহযুদ্ধ। স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারত বিভাগকে কেন্দ্র করে ভয়ঙ্করতম দাঙ্গা বেঁধেছিল. হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। সেও বেশিদিন আগের কথা নয়। তারই আশু ফলস্বরূপ আমরা হয়েছি শুধুই শোষিত আর বঞ্চিত। প্রার্থিত হিন্দুস্থান যেমন সার্বিক গড়ে ওঠেনি, তেমনি মুসলমানদের স্বপ্নের স্বদেশও কি গড়ে উঠেছে? অজস্র শবের মিছিল কিংবা অবিরত রক্তের স্রোত পেরিয়ে ছিন্নমূল অসংখ্য মানুষ শুধুই সহ্য করেছে সব হারানোর বেদনা। আমরা মাথা পেতে নিয়েছি কিছু অমিমাংসীত সমস্যা আর ভাই-ভাইয়ের পারস্পরিক রুদ্ধ অভিমান।

এখন এই সময় আবার আমরা একটা দাঙ্গা প্রচেষ্টার একেবারে সামনে। আগেও যেমন রাজনৈতিক ফয়দা, স্বার্থপর ভণ্ডামী ও অনৈতিক উস্কানী ছিল দাঙ্গার বীজ, এখনও ঠিক তেমনই আছে। মাঝে রয়েছে অশিক্ষার খানিকটা অন্ধকার আর ধর্মের অনিবার্য আফিঙ। রামজন্মভূমি-বার্বার মসজিদ কোন সমস্যা নয়। কিছু সুযোগ সন্ধানী মাতব্বরের রাজনৈতিক কূট-কৌশলের শিকার এখন আমরা। এ যেন আগুন নিয়ে খেলা।

রামজন্মভূমি-বার্বার মসজিদ বিতর্কের অশুভ সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে। বেনিয়া ইংরেজদের মস্তিষ্কপ্রসূত বিকৃত ঐতিহাসিক নথিপত্রে এই চক্রান্তকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যে, এখন যেখানে বার্বার মসজিদের অবস্থান, সেই স্থানেই রামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। সেখানেই নাকি প্রতিষ্ঠিত ছিল রাম জন্মভূমি মন্দির। মোঘল সম্রাট বাবর তারই একাংশ ভেঙে ঐতিহাসিক বার্বার মসজিদ তৈরী করেছিলেন। এই সংশয়-পীড়িত সম্পূর্ণ অনুমান-নির্ভর তথ্যের যোগানদার হলেন যথাক্রমে পি. কার্নেগী (হিস্টোরিক্যাল স্কেচ অব তহসিল ফৈজাবাদ, জিলা ফৈজাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ১৮৭০), এইচ. আর নেভিল (ফৈজাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, এলাহাবাদ, ১৯০৫) ও বাবরের স্মৃতিকথার (তুঝক-ই-বার্বার) অনুবাদিকা এ. এফ. বেভারিজ। মূল তুঝক-ই-বাবরিতে কোথাও কিন্তু তথাকথিত অযোধ্যার রামমন্দির ভাঙার উল্লেখ নেই। কেবল একটি পাদটীকায় শ্রীমতী বেভারিজ এর উল্লেখ করেন, যা তাঁর মনগড়া।

শ্রীমতী বেভারিজের এই অসত্য অনুমান বাবরের ধর্মনীতির কারণে। কিন্তু যদি বাবর মন্দির ধ্বংসের আদেশ দিয়েই থাকেন, তাহলে তাঁর স্মৃতিকথায় তার উল্লেখ নেই

কেন ? অথচ একই স্মৃতিকথায় গোয়ালিয়রের উরওয়া উপত্যকায় অশ্লীল মনে করে নগ্ন জৈন মূর্তিগুলি ধ্বংসের সগর্ব উল্লেখ আছে। কেবল মুসলমান ছিলেন বলে বাবর হিন্দু-বিদ্বেষবলে রামমন্দির ধ্বংস করেছিলেন এ ভাবনা ভিত্তিহীন। তাছাড়া বাবর এমন একটি ধ্বংসলীলা চালালেন অথচ সম-সাময়িক কোন রক্ষণশীল হিন্দু, এমন কি তাঁর মাত্র ২৫ বৎসর পরের ঐতিহাসিক ব্যক্তি 'রামচরিতমানসের' রচয়িতা রামভক্ত তুলসীদাসও সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করলেন না। এ অবিশ্বাস্য।

অথচ এই নিয়েই ভারতের বহু ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তর্জাল যাত্রার চক্রান্ত করা হচ্ছে আজও। সুনীতিকুমার ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার স্মরণ নেওয়া যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'কবি, তব জন্মভূমি / রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' সুনীতিকুমারের বক্তব্যও প্রায় এমনতর। তিনি বলেছেন—'ভারতীয় কোন পণ্ডিতই এখন মনে করেন না যে, রামায়ণের রাম ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন, যাঁকে কোন ঐতিহাসিক সময় সীমার মধ্যে চিহ্নিত করা যায়।' অতএব আর দাঙ্গা নয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ্যতার আদর্শই হোক আমাদের জীবন পথের পাথেয়।

বাংলা সাহিত্য দীর্ঘ সময়ের পথ পরিক্রমা করেছে। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে আমরা প্রবেশ করেছি সাহিত্যের মন্ময় নির্মিত ছোটগল্পের সার্থক ভুবনে। তারপর হিন্দু-মুসলমান অনেক ছোট গল্পকারই বিপরীতমুখী দুই জীবনধারায়, ধর্মীয় বোধে সম্পৃক্ত হতে হতে এমন অসংখ্য ছোট গল্প উপহার দিয়েছেন যেখানে পরস্পরের নিবিড় বন্ধনের সবুজ ছাপটি বেশ স্পষ্ট।

এই সংকলনে এমন কুড়িটি ছোট গল্প রয়েছে, যেখানে হিন্দু লেখকদের কলমে ফুটে উঠেছে মুসলমান জীবন আর মুসলমান লেখকদের কলমে হিন্দু জীবন। রবীন্দ্রনাথের পর থেকে বাংলা ছোট গল্প ক্রমে সাবালকত্ব অর্জন করতে করতে বিশ্বসাহিত্যে তার স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। ফলত আমরা এত বিপুল সংখ্যক ছোট গল্পকার পেয়েছি, তা যেমন গর্বের তেমনই আনন্দের। এই সংকলনকে কোন সময়ের নিরিখে বাঁধতে চাওয়া হয়নি। তাই ধারা বাহিকতা রক্ষারও কোন চেষ্টা করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ছড়ানো গল্পগুলি থেকে কিছু প্রয়োজন মাফিক গল্পকে খুঁজে নেওয়া হয়েছে মাত্র। সংকলনের গল্পগুলিকে লেখকদের জন্ম সালের ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

সূচীপত্র

মুসলমানীর গল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খসড়া

তখন অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিঘাতে দোলায়িত হত দিন রাত্রি। দুঃস্বপ্নের জাল জড়িয়েছিল জীবনযাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্থ কেবলই দেবতার মুখ তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাল্পনিক আশঙ্কায় মানুষের মন থাকত আতঙ্কিত। মানুষ হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কেবলই চোখের জলের দোহাই পাড়তে হত। শুভ কর্ম এবং অশুভ কর্মের পরিণামের সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। চলতে চলতে পদে পদে মানুষ হোঁচট খেয়ে খেয়ে পড়ত দুর্গতির মধ্যে।

এমন অবস্থায় বাড়িতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্যবিধাতার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা সবাই বলত 'পোড়ারমুখী বিদায় হলেই বাঁচি'। সেই রকমেরই একটা আপদ এসে জুটেছিল তিন-মহলার তালুকদার বংশীবদনের ঘরে।

কমলা ছিল সুন্দরী, তার বাপ-মা গিয়েছিল মারা, সেই সঙ্গে সেও বিদায় নিলেই পরিবার নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু তা হল না, তার কাকা বংশী অত্যন্ত স্নেহে অত্যন্ত সতর্ক-ভাবে এতকাল তাকে পালন করে এসেছে।

তার কাকী কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, "দেখ্ তো ভাই, মা-বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে। কোন্ সময় কী হয় বলা যায় না। আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারই মাঝখানে ও যেন সর্বনাশের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে, চারি দিক থেকে কেবল দুষ্টলোকের দৃষ্টি এসে পড়ে। ঐ একলা ওকে নিয়ে আমার ভরাডুবি হবে কোন্‌দিন, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না।"

এতদিন চলে যাচ্ছিল এক রকম করে, এখন আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেই ধূমধামের

মধ্যে আর তো ওকে লুকিয়ে রাখা চলবে না। ওর কাকা বলত, "সেই জন্যই আমি এমন ঘরে পাত্র সন্ধান করছি যারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।"

ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তবিল চেপে বসে আছে, বাপ ম'লেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ছেলেটি ছিল বেজায় শৌখিন—বাজপাখি উড়িয়ে, জুয়ো খেলে, বুলবুলের লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই টাকা ওড়াবার পথ খোলসা করেছিল। নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খুব, অনেক ছিল মাল। মোটামোটা ভোজপুরী পালোয়ান ছিল, সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে বলে বেড়াত, সমস্ত তল্লাটে কোন্ ভগ্নীপতির পুত্র আছে যে ওর গায়ে হাত দিতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ একটু শৌখিন ছিল—তার এক স্ত্রী আছে, আর-একটি নবীন বয়েসের সন্ধানে সে ফিরছে। কমলার রূপের কথা তার কানে উঠল। শেঠবংশ খুব ধনী, খুব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হল তাদের পণ।

কমলা কেঁদে বলে, "কাকামণি, কোথায় আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ।"

"তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি থাকলে চিরদিন তোমাকে বুকে করে রাখতুম জানো তো মা।"

বিবাহের সম্বন্ধ যখন হল তখন ছেলেটি খুব বুক ফুলিয়ে এল আসরে, বাজনা-বাদ্দি সমারোহের অন্ত ছিল না। কাকা হাত জোড় করে বললে, "বাবাজি, এত ধুমধাম করা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।"

শুনে সে আবার ভগ্নিপতির পুত্রদের আস্পর্ধা করে বললে, "দেখা যাবে কেমন সে কাছে ঘেঁষে।"

কাকা বললে, "বিবাহ-অনুষ্ঠান পর্যন্ত মেয়ের দায় আমাদের, তারপর মেয়ে এখন তোমার—তুমি ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছবার দায় নাও। আমরা এ দায় নেবার যোগ্য নই, আমরা দুর্বল।"

ও বুক ফুলিয়ে বললে, "কোন ভয় নেই।"

ভোজপুরী দারোয়ানরা গোঁফ চাড়া দিয়ে দাঁড়ালে সব লাঠি হাতে।

কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে, তালতাড়ির মাঠ। মধুমোল্লার ছিল ডাকাতের সর্দার। সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যখন দুই প্রহর হবে, মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। তখন ভোজপুরীদের বড়ো কেউ বাকি রইল না। মধুমোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে পড়লে পরিত্রাণ নেই।

কমলা ভয়ে চতুর্দোলা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধ হবির খাঁ, তাকে সবাই পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত। হবির সোজা দাঁড়িয়ে বললে, "বাবাসকল তফাত যাও, আমি হবির খাঁ।"

ডাকাতরা বললে, "খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না কিন্তু আমাদের ব্যবসা মাটি করলেন কেন।"

যাই হোক তাদের ভঙ্গ দিতেই হল।

হবির এসে কমলাকে বললে, "তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চলো আমার ঘরে।"

কমলা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। হবির বললে, "বুঝেছি তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো—যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চলো, তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব।"

কমলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সঙ্কোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল, "দেখো, আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় কোরো না।"

হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আট-মহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা।

একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, "মা, হিন্দুর ঘরের মতো এ জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।"

কমলা কেঁদে বললে, "দয়া করে কাকাকে খবর দাও তিনি নিয়ে যাবেন।"

হবির বললে, "বাছা, ভুল করছ, আজ তোমার বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে। নাহয় একবার পরীক্ষা করে দেখো।"

হবির খাঁ কমলাকে তার কাকার খিড়কির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে, "আমি এখানেই অপেক্ষা করে রইলুম।"

বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধরে কমলা বললে, "কাকামণি, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না।"

কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কাকী এসে দেখে বলে উঠল, "দূর করে দাও, দূর করে দাও অলক্ষ্মীকে। সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই!"

কাকা বললে, "উপায় নেই মা! আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।"

মাথা হেঁট করে রইল কমলা কিছুক্ষণ, তারপর ধীর পদক্ষেপে খিড়কির দরজা পার হয়ে হবিরের সঙ্গে চলে গেল। চিরদিনের মত বন্ধ হল তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

হবির খাঁর বাড়িতে তার আচার ধর্ম পালন করবার ব্যবস্থা রইল। হবির খাঁ বললে, "তোমার মহলে আমার ছেলেরা কেউ আসবে না, এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে নিয়ে তোমার পূজা-আর্চা, হিন্দুঘরের আচার-বিচার, মেনে চলতে পারবে।"

এই বাড়ি সম্বন্ধে পূর্বকালের একটু ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজ-

পুতানীর মহল। পূর্বকালের নবাব এনেছিলেন রাজপুতের মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা করে রেখেছিলেন। সে শিবপূজা করত, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণেও যেত। তখনকার অভিজাত বংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত। সেই রাজপুতানী এই মহলে থেকে যত হিন্দু বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার-বিচার থাকত অক্ষুণ্ণ। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপুতানীর পুত্র। যদিও সে মায়ের ধর্ম নেয় নি, কিন্তু সে মাকে পূজা করত অন্তরে। সে মা তো এখন আর নেই, কিন্তু তার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে এই রকম সমাজবিতাড়িত অত্যাচারিত হিন্দু মেয়েদের বিশেষভাবে আশ্রয় দান করার ব্রত তিনি নিয়েছিলেন।

কমলা তাদের কাছে যা পেল তা সে নিজের বাড়িতে কোনদিন পেত না। সেখানে কাকী তাকে 'দূর ছাই' করত—কেবলই শুনত সে অলক্ষ্মী, সে সর্বনাশী, সঙ্গে এনেছে সে দুর্ভাগ্য, সে ম'লেই বংশ উদ্ধার পায়। তার কাকা তাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে কাপড়-চোপড় কিছু দিতেন, কিন্তু কাকীর ভয়ে সেটা গোপন করতে হত। রাজপুতানীর মহলে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেলে। এখানে তার আদরের অন্ত ছিল না। চারিদিকে তার দাসদাসী, সবই হিন্দুঘরের ছিল।

অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পৌঁছল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে আনাগোনা শুরু করল কমলার মহলে, তার সঙ্গে মনে-মনে বাঁধা পড়ে গেল।

তখন সে হবির খাঁকে একদিন বললে, "বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবান্‌ই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আঁস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজও আমি ভুলতে পারি নে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম, বাপজান, তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা—তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি—আমার ধর্ম-কর্ম ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না—আমার নাহয় দুই ধর্মই থাকল।"

এমনি করে চলল ওদের জীবনযাত্রা, ওদের পূর্বতন পরিজনদের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা রইল না। এদিকে হবির খাঁ কমলা যে ওদের পরিবারের কেউ নয়, সে কথা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে—ওর নাম হল মেহেরজান।

ইতিমধ্যে ওর কাকার দ্বিতীয় মেয়ের বিবাহের সময় এল। তার বন্দোবস্তও হল পূর্বের মতো, আবার এল সেই বিপদ। পথের মধ্যে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ল সেই

ডাকাতের দল। শিকার থেকে একবার তারা বঞ্চিত হয়েছিল সে দুঃখ তাদের ছিল, এবার তার শোধ নিতে চায়।

কিন্তু তারই পিছন পিছন আর এক হুঙ্কার এল, "খবরদার!"

"ঐরে, হবির খাঁর চেলারা এসে সব নষ্ট করে দিলে।"

কন্যাপক্ষরা যখন কন্যাকে পালকির মধ্যে ফেলে রেখে যে যেখানে পেল দৌড় মারতে চায় তখন তাদের মাঝখানে দেখা দিল হবির খাঁয়ের অর্ধচন্দ্র-আঁকা পতাকা-বাঁধা বর্শার ফলক। সেই বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়েছে নির্ভয়ে একটি রমণী।

সরলাকে তিনি বললেন, "বোন, তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন। যিনি কারও জাত বিচার করেন না।—"

"কাকা, প্রণাম তোমাকে। ভয় নেই, তোমার পা ছোঁব না। এখন এঁকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে অস্পৃশ্য করে নি। কাকীকে বোলো অনেক দিন তাঁর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ হয়েছি, সে ঋণ যে আমি এমন করে আজ শুধতে পারব তা ভাবি নি। ওর জন্যে একটি রাঙা চেলী এনেছি, সে এই নাও, আর একটি কিংখাবের আসন। আমার বোন যদি কখনো দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে, তাকে রক্ষা করবার জন্যে।"

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু, দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিমঝিম করে—যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জাসম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফ্‌রা, বলি ঘরে আছিস ?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে ? বাবার যে জ্বর।

জ্বর ! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড। ম্লেচ্ছ !

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে

আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙ্গা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁজে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খর বাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখছি তেমনি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়!

কি কোরব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দু-খুঁটো খাইয়ে আনব—তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই করে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি—খামারে পড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও একমুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যামনে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন না, ছাড়িস ত ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু-আঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনি? ফ্যানে-জলে দে না এক গামলা খাক।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গরুটার জন্যেও এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই? ব্যাটা কসাই!

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদেকেটে হাতেপায়ে পড়ে বললাম বাবুমশায়, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজা-গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু, না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচিনে!

কিন্তু এ বিদ্রুপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হল না। মাস-দুয়ের খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না।—বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার

অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই—খেয়ে রেখেছিস, দিবিনে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা ত রাম রাজত্বে বাস করিস—ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে কোরব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করিনে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল ত? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোণা যাচ্ছে,—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গরুটাকে দু'দিন পেটপুরে খেতে দিই,—বলিতে বলিতেই সে ধপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু'পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর, ছুঁয়ে ফেলবি না কি

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেচি—এ ক'টি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব—কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিল, ধার নিবি, শুধবে কি করে শুনি?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধবো বাবাঠাকুর তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুলকণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না! যেমন করে পারি শুধবো! রসিক নাগর! যা যা সর্, পথ ছাড়। ঘরে যাই বেলা বয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচকিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর্, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি!

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েচে এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায়? তা বটে! যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই! নে নে পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ। যে শিঙ, কোন্ দিন দেখচি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক গে,—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে

চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে—কিন্তু তুই ত জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিঠের উপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সায় লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি বল্ ? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কি করি। গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেলতে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে-ওদিকে চাহিল, তার পরে ভাঙ্গা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে শিগ্‌গির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—

বাবা ?

কেন মা ?

ভাত খাবে এসো—এই বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ বাবা ?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোনো পচা খড় মা আপনিই ঝরে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার করচ ?

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গেছে, এবং এমন ধারা করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশী জানে ? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে !

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুর কহিল ফ্যানটুকু দে ত মা একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে।

নেই ? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সানকিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা,—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল ?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বললে বড় ক্ষিধে পেয়েচে ?

তখন ? তখন হয়ত জ্বর ছিল না মা।

তা হলে তুলে রেখে দি, সাঁঝের বেলা খেয়ো ?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে ?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল ; কহিল, এক কাজ কর না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা ? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

দুই

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিতমুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই, আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মানিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগ্‌লি!

হাঁ বাবা, সত্যি। তাদের চাকর বললে, তোর বাপকে বল গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে ?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহুপ্রকার দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার হয় নাই। বিশেষতঃ, মানিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না ?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বললে তিনদিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেলবে ?

গফুর কহিল ফেলুক গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে

ইহার উল্লেখমাত্রেই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল খুড়ো, একটা টাকা দিতে হবে,—এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়ের মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব, আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাবলাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়া-গোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড় করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙব না, এই পুরোপুরিই দিলাম,—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বলচি—খবরদার বলচি, ভাল হবে না।

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

গফুর তেমনি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি! আমার জিনিস আমি বেচব না—আমার খুশি। এই বলিয়া সে নোটখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আসতে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে! এই বলিয়া সে ট্যাক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দু'টাকা বেশী নেবে, এই ত? দাও হে পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশী কেউ একটা আধলা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়া বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি? চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে, মাল আর আছে কি?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা বিশ্রী কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ-কথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র-অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল, শিবুবাবু চোখ রাঙ্গা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাইনে। কোথায় বাস করে আছিস, জানিস ?

গফুর হাতজোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাইনে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন, আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদি এবং বদ্‌-মেজাজি বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো কোরব না কর্তা। এই বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল, এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত নাকখত দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবুবাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েছে। আর কখনো এসব মতি-বুদ্ধি করিস নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন, এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্তার পুণ্যপ্রভাবে ও শাসন-ভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যে জন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

তিন

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নাই। কখনো এ রূপের লেশমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে, আবার কোনদিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, আজ এ কথা ভাবিতেও যেন ভয় হয়। মনে হয় সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই---সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামবে না।

এমনি দিনে দ্বিপ্রহর বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জনমজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয় এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড

রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল আমিনা, ভাত হয়েছে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত? কি বললি—হয়নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা!

চাল নেই? সকালে আমাকে বলিস নি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া তাহার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম! রাত্তিরে বললে কারু মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাকবে কি করে? রোগা বাপ খাক আর না খাক, বুড়ো মেয়ে চারবার পাঁচবার করে ভাত গিলবি। এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাবো। দে, একঘটি জল দে,—তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্, তাও নেই।

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কি? এত লোকে মরে তুই মরিস নে!

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল এই তাহার স্নেহশীলা কর্ম-পরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোনদিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা। এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে, তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পরে ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের

চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাকচেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া দাওয়া হয়নি, পরে যাবো।

এতবড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অতবড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে অত ক্ষীণকণ্ঠ অতবড় কানে গিয়া পৌঁছায় না—না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এতবড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোট মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়—ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরীব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছিল। পূর্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদমাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।

একটিবারমাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান

বাহিয়া ফোঁটা-কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা-দুটা তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল!

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর একজোড়া নিমেষহীন গভীর কালোচক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তরের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চকচকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ-সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই—সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু থাকে না, এ-কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি সরিস নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ও-সব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।

ভারতবর্ষ

এস্ ওয়াজেদ আলি
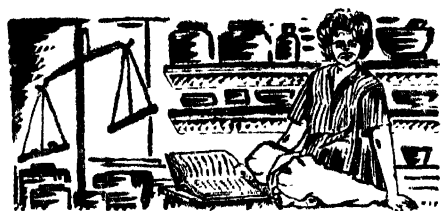
পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স দশ-এগারো বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাওয়া-আসা করতে হত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ত। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চার পাশে তার ধপ্ধপে সাদা চুল, নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা; গম্ভীর শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মতো চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক-এক বার বৃদ্ধের কাছে এসে বসে পাঠ শুনত, আবার খদ্দের এলে, গিয়ে তাদের দেখা-শুনা করত। আমারই বয়সী একটি ছেলে, খালিগায়ে বুড়োর কাছে সর্বদা বসে থাকত। আর তার পাশে থাকত দুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পাঠ শুনত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হত, বিষয়টি তারা বিশেষভাবেই উপভোগ করছে।

বুড়ো কী পড়ছে জানবার জন্য আমায় বিশেষ কৌতূহল হল। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে লাগলুম। রামচন্দ্র কী করে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁচেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলেদের মুখ আনন্দ আগ্রহ আর উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমি যখন সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতুম তখন কেউ-না-কেউ এসে আমায় ডেকে নিয়ে যেত। সেতু বাঁধা হচ্ছিল, তাই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কি না, আর পার হয়েই-বা কী করেছিলেন, তা তখন জানতে পারি নি।

দু-চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে গেলুম। তার পর কোথা থেকে যে কোথা

গেলুম, তার ঠিকানা নেই। পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের কোন-গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল। তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম। এমন কত শত জিনিষ রোজ আমরা ভুলে যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘর-বাড়ি সব বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড়ো বড়ো ম্যান্‌শন (mansion) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগে দু-চারটে রিক্‌শা আর ঘোড়ার গাড়িই সে পথ দিয়ে যেত; এখন বড়ো বড়ো মোটর অনবরত যাওয়া-আসা করছে। আগে মিটমিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলত, এখন ইলেক্‌ট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল সেই পুরানো মুদিখানাটির উপর। সেখানে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নি। জিনিসপত্র ঠিক আগের মতো সাজানো রয়েছে। চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে। বোধহয় পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি।

আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে। পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মতো একটি বৃদ্ধ গদির উপর বসে মোটা একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ছিল। পঁচিশ বছর আগের সেই মধ্য বয়স্ক লোকটির মতোই একটি মধ্যবয়স্ক লোক এক-এক বার এসে সেই পাঠ শুনছিল আর আবশ্যকমত খদ্দেরদের দেখাশুনা করছিল। ঠিক সেই আগের ছেলেটির মতো একটি ছেলে, খালি-গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসে ছিল। তার পাশে বসে ছিল সেই আগেকার মেয়েদের মতো দেখতে দুটি মেয়ে।

কোনো মায়ামন্ত্রবলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এল নাকি? আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কথা—পঁচিশ বছর আগে যা শুনেছিলুম।

আমি আর থাকতে পারলুম না, সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম, "মশায়, মাপ করবেন। ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়তে দেখেছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়ে নি, আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয় নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতুবন্ধনের কাজে ব্যস্ত আছেন?"

বৃদ্ধ তার চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের উপর থেকে চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দুটিকে ভালো করে পুঁছে আবার সেটিকে নাকের উপর চড়ালে। ধীর গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিলে; তারপর বিস্ময়ের স্বরে বললে, "পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?" আমি বললুম "আজ্ঞে হাঁ।" বৃদ্ধ বললে, "তা হলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতামহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন। আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে বসে পাঠ শুনত। ছেলেটি এখন ঐ বড়ো হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতোই হবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে

গেছে। ভগবানের ইচ্ছায় তারা স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। এই ছেলেটি হচ্ছে আমার নাতি, আর মেয়ে দুটি আমার নাতনি—আমার ঐ ছেলের সন্তান।"

বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে বললুম, "এ বইটি কবেকার?"

স্মিত হাস্যে বৃদ্ধ বললে, "এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার ঠাকুরদাদা বটতলায় এটা কিনেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা, আমার তখন জন্ম হয় নি।"

বৃদ্ধকে অভিবাদন করে দোকান ত্যাগ করলুম। মনে হল, আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি! প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল—সেই tradition সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটে নি।

ফকির

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইচু মণ্ডলের আজ বেজায় সর্দি হয়েছে। ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর শীতল প্রভাত। তালি দেওয়া কাঁথা, ওর বৌ, তার নাম নিমি, শেষরাত্রে গায়ে দিয়ে দিয়েছিল। এমন সর্দি হয়েছে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর ভারী। ইচু শুয়েই পা দিয়ে চলের হাঁড়িটা নেড়ে দেখলে, সেটা ওর পায়ের তলার দিকেই থাকে, হাঁড়িটাতে সামান্য কিছু চাল আছে মনে হল তার।

ইচু বললে—আজ আর জনে যাব না। একটু পানি দে দিকি।

ওর বৌ বললে—জনে যাবে না তবে চলবে কিসি?

—কেন, চাল তো রয়েছে তোর হাঁড়িতি, সজনে শাক-মাক সেদ্দ কর আর ভাত। নুন আছে।

এট্টু অমনি পড়ে আছে মালাটার তলায়।

—তবে আর কি? পানি দে—নমাজ করি।

ইচু জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ওজু শেষ করে ফজরের নমাজে বসে গেল। এটি তার জীবনের অতি প্রিয় কাজ বাল্যকাল থেকেই। মজুরি করতে না যেতে পারে সে, কিন্তু নমাজ না করে সে দিনের কাজ কখনও আরম্ভ করেনি।

নিমি বললে—উঠেছ যখন, তখন জনে যাও। আজকাল যুদ্ধের বাজারি দশ আনা করে জন, অন্য সময় তিন আনা হত যে। হাঁড়িতে যদি চাল থাকতি দেখলে, তবে আর তুমি জনে যাবা না। ও ভাল না।

ইচু বললে—নমাজের সময় ঘ্যান ঘ্যান করিস নে বাপু, একটু চুপ কর।

নমাজ শেষ করে ইচু দা হাতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটু থেমে বললে—খিদে পেয়েছে। কি আছে রে ?

—কিছু নেই।

—দেখ না হাঁড়িটা—বড্ড খিদে পেয়েছিল।

—দুটো-কটা পানি দেওয়া ভাত পড়ে আছে, আর কিছু নেই।

—তাই দে। বেনবেলা না খেয়ে গেলি দুপুর বেলা এমন খিদে পায়, দা ধরতি হাত কাঁপে। কাজ করতি পারি নে।

শাইলিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়েই রেল লাইন চলে গিয়েছে।

রেল লাইন পার হয়ে ফাঁকা মাঠ একদিকে, মাঠের মধ্যে বিল, ভরা ভাদ্রের বর্ষায় থৈ থৈ করছে তার জল, ধারে ধারে কাশ বনে সবে ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে, জলে কলমি লতা জালের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। বনখেজুর গাছের মাথায় তেলাকুচো লতার দুলুনি। টুকটুকে লাল তেলাকুচো ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ফিঙে পাখী ঝুলছে রেলের তারে।

রামা গোয়ালা জন-মজুর নিয়ে ধান কাটছে তার নিজের জমিতে। ইচুকে দেখে বললে—যাবা কোথায় ?

—সনেকপুরের বিলি ধান কাটতি।

—কত করে জন দেচ্ছে ?

—সাত সিকি করে বিঘে। তামাকের আগুন দেবা ?

—নিয়ে যাও, ওই বেনা ঝোপের ধার মালসা আছে।

—ভাত খেয়েই চলে আলাম, হুঁকা জিরুতে পারিনি। তামাক না খেলি কাজে মন বসে ?

মালসা থেকে আগুন নিয়ে তামাক খেতে খেতে চলল ইচু।

ইচুর গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে সনেকপুরের বিলে দেড়-শ দু-শ বিঘে জমিতে ভাদুই ধান পেকে গাছ শুয়ে পড়েছে। যেমন বর্ষা নেমেছে, দু-পাঁচ দিনে বিলের জল বেড়ে পাকা ধান ডুবিয়ে দেবে, তাই এবার মজুরির রেট এদিকে খুব বেশি। তার ওপর আছে মজুরদের একবেলা খোরাকি।

ইচুর বড় ভাল লাগে আল্লার কথা শুনতে। পায়রাগাছির ফকির এ অঞ্চলের মধ্যে নামজাদা সাধু। একবার ইচু তাঁকে দেখেছিল। বাল্যকাল থেকে ইচুর ঈশ্বরের দিকে কেমন এক টান। পায়রাগাছির ফকির সে টান আরও বাড়িয়ে দেন ওর। ইচু যেন কেমন হয়ে গিয়েছে তার পর থেকে। সংসারে মন দেয় না, মজুরি করে পয়সা রোজ-গারের দিকে বা খাওয়া দাওয়ার দিকেও মন নেই। কাস্তে হাতে জমির ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অনেকে ওকে তা নিয়ে খেপায়। বলে—ও ইচু, শেষকালে ফকির হবা নাকি গো ? ইচু মুখে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। সে নিতান্ত ভালমানুষ, কারও কোন কথার প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

মজুরির রেট নিয়ে দরাদরি করতে পারে না বলে অনেকে ওকে ঠকিয়ে কাজ আদায় করে। বিনি মজুরিতে অনেক সময় খাটিয়ে নেয়।

—ও ইচু, আমার বাড়ীর চালকুমড়োর মাচাটা তুমি থাকতে নষ্ট হয়ে যাবে ?

—কেন, কি হয়েছে চাচা ?

—খুঁটিগুলো সব পড়ে গিয়েছো।

—ওবেলা এসে করে দেবানি চাচা।

ইচু কথা ঠিক রাখত নিজের। যাকে যা বলবে, তা সে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে এটা সকলেই জানে। মহাজনে দু তিন বিশ ধান মুখের কথায় ওকে দিয়ে দিত, এ পর্যন্ত সে কারও টাকা বা ধান মেরে দেয়নি।

একবার পাশের গ্রামের মুখুজ্যেদের জমির ধান সে ভুল করে কেটে ফেলেছিল—বেশি নয়, কাঠাখানেক জমির পাকা ধান। মুখুজ্যেদের জমির পাশে তখন ওর নিজের ওটবান্দি জমি ছিল দু বিঘে। মুখুজ্যে মশায় যখন জানতে পারলেন তাঁর জমির ধান কে কেটে নিয়েছে, তখন খুব হৈ চৈ জুড়ে দিলেন। কে ধান কেটেছে সন্ধান করতে পারলেন না, কারণ সবারই তখন ধান কাটবার সময়, সকলেরই বাড়ীতে ধান—কার ধান তিনি গিয়ে ধরবেন ? দিন-দুই পরে ইচু গিয়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়ী হাজির হল।

মুখুজ্যে মশায় বললেন—কি রে ইচু, কি মনে করে ?

ইচু বললে—সালাম বাবু ! একটা বড্ড ভুল করে ফেলেছি।

—কি রে ?

—আপনার জমির ধানডা কাঠাখানেক কেটে ফেলে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেলাম। তা বাবু দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধানডা আপনারে ফেরত দিতে চাই।

—ওঃ, তোর কাজ ইচু ! আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। সেদিন বড্ড বর্ষা, জমির আল ঠিক করতি পারলাম না। তার পর পরস্পর শুনলাম আপনার জমির ধান কে চুরি করেছে বলে আপনি খোঁজ করছেন। তখন ভাবলাম বাবুরে বলে আসি। ক্ষেতি লোকসান যখন অজ্ঞান্তে করে ফেলেছি, তখন দেড়া বাড়ী সুদ দেব আপনারে।

মুখুজ্যে মশায় বিশ্বাস করলেন ওর কথা। ইচুকে অন্তত চোর বলে কেউ সন্দেহ করবে না। ইচু জন খেটে খায় বটে, কিন্তু আশেপাশে চার-পাঁচ গ্রামের লোক ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। মুখুজ্যে মশায় বললেন, তোকে সুদ দিতে হবে না ইচু, আমার ধান যা কেটেছিস ও আর ফিরিয়েও দিতে হবে না। ও তোকে দিলাম। ভুলে করে ফেলেছিস তা আর এখন কি হবে।

ইচু হাতজোড় করে বললে—তা হবে না মুখুজ্যে মশায়, ও ধান নিতি পারব না মাপ করবেন। ও ধান আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমায় হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরান বেঁচিয়ে রাখব—যা না দেবেন সে আমাব হারাম।

মুখুজ্যে মশায় জানতেন ইচুকে। খুশী হয়ে বললেন,—যাক, দুটো চিঁড়ে নিয়ে যা, বাড়ীর মধ্যে তোর কাকীমার কাছ থেকে চেয়ে নে।

সনেকপুরের বিলে পৌঁছে ইচু দেখলে, জন-মজুর এখনও কেউ এসে পৌঁছয়নি। এটা পছন্দ করে না সে। বেশি রেটে মজুরি নেব অথচ কাজে আসব দেরি করে, মালিকের কাজে ফাঁকি দেব, এ তার ভাল লাগে না। ধান কাটে ঘড়ির কাঁটার মত। এ কাজে তার ফাঁকি নেই।

পথ-চলতি লোকে জিজ্ঞেস করে—কি ধান এটা গো ?

—বেনাঝুপি।

—এবার ফসল কেমন ?

—আড়াই বিশ থেকে তিন বিশ পড়তা হতি পারে।

—বিঘেয় ?

—বিঘেয় না কি কাঠায় ?

ইচু হা হা করে হাসে পথিকের অজ্ঞতায়। পথিকের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে—কাঠায় আড়াই বিশ ধান ফলন হলি কি আমরা জন খেটে খাতাম গো কর্তা ? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

—বাড়ী কোথায় তোমার ?

—শাইলপাড়া।

—নাম ?

—ইচু মণ্ডল।

বেলা আড়াইটের গাড়ী দূরের রেল লাইন দিয়ে গড় গড় করে চলে গেল। জনমজুরদের জন্যে জমির মালিক খাবার পাঠিয়েছে, একজন লোকে বাঁকে ঝুলিয়ে আধক্রোশ দূরবর্তী সনেকপুর গ্রাম থেকে কাঁসার জামবাটিতে সাজিয়ে এনেছে গরম ভাত, কুমড়োর ঘণ্ট ও কুচো চিংড়ি ভাজা। এ সময় ভাল খেতে দিয়ে মন খুশি করা মানে বেশি কাজ আদায় করা ওদের কাছ থেকে। জমির মালিকেরা তা জানে। আথের মণ্ডল খেতে খেতে বলে—আজ এট্টু সকাল সকাল যাব। মোর ঘরে নুন নেই—বাজার থেকে নুন না নিয়ে গেলি বাচ-কাচ খেতি পাবে না।

—নুন কনে পাবা ? বাজারে কালও খোঁজ করিছি, নুন মেলে না।

—ওমা আলুনি খেয়ে খেয়ে মুখি তো পোকা পড়ে গেল।

—আর অন্ধকারে খেয়ে খেয়ে চকি চ্যালা বেরুল। কেরাচিন্নি তেলের মুখ দেখিনি কত্ত কাল।

—কুমড়োর ঝালডা করেছে বেশ। সনেকপুরের এরা খেতি দেয় ভাল, পেটটা ভরি খেতি দেয়। কেরাচিন্নি পাবা কোথায় ?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আথের মণ্ডল দা-কাটা তামাক সাজালে কলকেতে। বেশ করে আগুন ধরিয়ে প্রবীণ রমজান মণ্ডলের হাতে দিয়ে বললে—হ্যাদে ধর চাচা।

ইচু বললে—চাচা, তোমার বয়স হল ক কুড়ি ?

—তা যেবার জোড়া বন্যে হয়েল সেবার আমি গরু চরাতে পারি, তিরিশ কি চল্লিশ হল পেরায়—

কেউ বিশেষ বুঝতে পারলে না। জোড়া বন্যা কত বৎসর পূর্বে কোন্ সালে হয়েছিল কেউ জানে না। রমজানের বয়স কম হলেও সত্তর ছাড়িয়েছে। যখন সে গরু চরায় তখন এরা কেউ জন্মায় নি। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

বেলা যায় যায়। পাঁচটার গাড়ী গড় গড় করে মাদলার বিলের ওপর দিয়ে চলে গেল। ঝিঙের ক্ষেতে ফুল ফুটেছে সনেকপুরের মাঠে। নোয়ালি সর্দার জাতে বুনো, সনেকপুরের মধ্যে অবস্থাপন্ন, গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্যপথ ধরে। ইচু সন্ধ্যার নমাজ শেষ করে উঠতেই বেড়ার ধার থেকে নোয়ালি সর্দার বললে—ও ইচু কাল আমায় জন দিতি পারবা ?

—না গো।

—কেন ?

—সনেকপুরওয়ালাদের বিলির ধান কাটা হচ্ছে।

—চল আমার বাড়ী, তামুক খেয়ে যাবা।

রমজান মণ্ডলকে ইচু ডাক দিলে।—ও চাচা, সর্দারের বাড়ী তামুক খাবা চল।

নোয়ালি সর্দারের তামুক-খাওয়ানোর আসল উদ্দেশ্য মজুরির রেট সম্বন্ধে দরদস্তুর করা। ইচু রমজানের পুত্রের বয়সী—সুতরাং দরদস্তুর সম্বন্ধে রমজান নেতা হয়ে কথা-বার্তা চালালে।

—সাত সিকের কম পারব নি গো, এতে তুমি রাগ করো না সর্দার।

রমজান চাচা, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল না কেন ?

— অনেয্য তো কিছু বলছি নে।

—অনেয্য নয় চাচা ? যা ছেল চোদ্দ আনা তাই সাত সিকে ? এট্টা ভেবে চিন্তে কথা বল। পাঁচ সিকে কর, আর চাল ডাল মাছ পেটিয়ে দেবানি তোমরা রান্না করে খেয়ো। মোদের রান্না তো তোমরা খাবা না। আমার পুকুরি এবার এই এত বড় বড় চ্যাং মাছ—

নোয়ালি সর্দার হাত দিয়ে কাল্পনিক মৎস্যের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করলে, যদি লোভ দেখিয়ে এদের কাজে টানা যায়।

রমজান ঘাড় নেড়ে বললে—ও হবে না সর্দার। সাত সিকের কম করলি—

—আর এক কলকে ধরাও চাচা। হ্যাদে, গাছের জালি শসা গোটাকতক নিয়ে যাও। দুজনে খেয়ো।

—শসা পুঁতেছিলে ? মাচার শসা, না মেঠো ?

মেঠো কোথায় পাব চাচা, এই উঠোনটাতে মাচা করে দিয়েলাম—সিম বরবটি শসা —কিনে খাবার তো ক্ষ্যামতা নেই মোদের, তরিতরকারির আগুন দাম।

—সে কথা আর বলো না। হাটে বাগুন কেনতাম পয়সায় দু সের তিন সের—তাই এখন বলে আট আনা সের। খাদ্য-খাদক উঠে গেল। ঝিঙে আছে?

—তা তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে—দুটো কটা দেবানি তুলে, খেয়ো।

—যাক গে, পাঁচ সিকেই দিও সর্দার, কারও কাছে পেরকাশ করো না যেন এ কথা।

ইচু ও রমজান তামাক খেয়ে ঝিঙে ও শসা নিয়ে উঠে চলে এল। নোয়ালি সর্দারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সে জানে রমজান জন-মজুরের নেতা, ওর কথায় দরদস্তুর ঠিক ঠিক হয়। ওকে খুশি রাখলেই হোল।

ইচুর বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল। নিমিকে বললে—ভাত রেঁধেছিস?

—এ বেলা শরীরডে খারাপ। পানি দেওয়া ভাত আছে, খাও।

—তরকারি?

—কিছু নেই।

—এই ঝিঙে কটা রেঁধে দে।

—রাঁধব কি দিয়ে, তেল কনে? পাঁচ পলা ধার করে এনেলাম আছিরন বিবির কাছ থে। এখনও শোধ দিতি পারিনি— আবার কি ধার করতি ছোটব?

—পোড়া?

নিমি খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে—ও মা, মুই কনে যাবা গো! ঝিঙে পোড়া কেউ কখনও শুনিনি। খেতি পারবা না।

—পারব পারব। দে তুই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হোল পাকাটির আলো জ্বেলে। তেল নেই। অন্ধকার ঘরদোর। কে আসে, কে যায়, কিছু বোঝা যায় না। কচুঝাড়ে কেয়োঝাঁকার ঝোপে জোনাকি জ্বলছে, উঁচু-নীচু—উঁচু-নীচু। দেবতা ঝিলিক মারছে, রাত্রে বৃষ্টি হবে বোধ হয়। ভাদ্রের গুমট গরম। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ইচু যেমন মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছে তখনই রাজ্যের ঘুম এসেছে ওর চোখে। আর জ্ঞান নেই।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, লোকজনের গোলমালে ইচু শেখের ঘুম ভাঙল। অনেক লোকের গলা বাইরে। ওরই বাড়ীর উঠোনে।

—ব্যাপারখানা কি?

পাড়ার মোড়ল হাফেজ বুড়োর গলা—ও ইচু, ইচু বাড়ী আছ?

বছিরদ্দি শেখ ডাকছে— ও ইচু, বলি ওঠ—শোন ইদিকি।

ভোর সবে হয়েছে। কাক-পক্ষী ডাকতে শুরু করেছে। ইচু ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছলে। ফজরের নমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এত লোক ওর উঠোনে

কেন? তাকে ডাকাকাকিই বা কিসের এত সকালে। বাইরে এসে ঘুমচোখে উঠোনের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে গেল। পাড়াসুদ্ধ মানুষ সব ওর উঠোনে। সে বিস্মিত সুরে বললে—কি হয়েছে গা মোড়লের পো?

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল বললে—ইদিকি এস।

—আগে নমাজটা করে নিই—দেরি হয়ে গিয়েছে।

ইচু ঘরের পেছনে নমাজ সেরে নিয়ে আবার সামনে এল। সবাই ওর দিকে এক-সঙ্গে এগিয়ে এল। সবাই মিলে যেন একসঙ্গে ওকে কি বলতে চায়। ইচু ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে, ওর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। ভয়ও হয়েছে ওর, নিমি এ সময়ে কোথায় গেল? হয়েছে কি?

অন্য সবাইকে থামিয়ে দিয়ে হাফেজ বললে—এস মোর সঙ্গে।

ইচু শেখ ওদের পেছনে পেছনে কলের পুতুলের মত চলল। রেল লাইনের দিকে সকলেই যাচ্ছে। নাবাল ক্ষেতের একহাঁটু জল পার হয়ে সবাই রেল লাইনে উঠল। একটা খেজুর ঝোপের আড়ালে রেল লাইনের ওপর উঠে সবাই দাঁড়াল থমকে। হাফেজ ডেকে বললে—এখানে এস।

কি ব্যাপার? ইচু এগিয়ে যা দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, সে নিজেকে পড়তে পড়তে সামলে নিলে। রেল লাইনের ওপরে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ—গলা সামনের দিকে গভীরভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

মৃতদেহ নিমির।

তার পর তার ভাল কিছু মনে পড়ে না। গ্রামের লোকে মিলে তাকে কত কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। সে কোথায় ছিল, নিমি কতক্ষণ ঘরে ছিল, নানা প্রশ্ন। নিমি রেলে গলা দিয়ে মরেনি, তাকে নাকি খুন করে টেনে এনে রেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ইচু বুঝতে পারলে তার ওপর অনেক সন্দেহ এসে পড়েছে। পাশের গাঁয়ে দফাদারদের সংবাদ দিতে লোক যাবে এখুনি, তার আগে ইচুকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার, সে কোথায় ছিল তা জানা দরকার, সেইজন্যই গ্রামের লোক তার বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাকি করছিল।

ইচু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে—মুই কিছু বলতি পারি নে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।

—বউরি কিছু বলেলে? ঝগড়া হয়েল?

—কিছু না চাচা।

—বউ ঘরে শুয়েল?

ইচুর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ উঁকি মারলে। এ প্রশ্ন করে কেন লোকে? বছিরদ্দি শেখ এগিয়ে এসে ওকে উঠিয়ে বললে—মোর কথা সবাই শোন। ইচু সে রকম লোক নয়। চল এখুনি বনগাঁয়ে ওকে নিয়ে মোক্তার বাবুদের কাছে। বিহিত কথা তাঁরা বলবে, তাঁদের

পরামর্শটা লেওয়া দরকার। এখানে থাকলি এখুনি দফাদার এসে ওকে বাঁধবে। তার আগে চল মোরা ছ সাত জন ওকে নিয়ে বনগাঁয়ে যাই। পরামর্শ লিয়ে ফেলি। পুলিশ গেপ্তার করবার আগেই। কে কে যাবা?

দেখা গেল প্রায় সকলেই যেতে চায়।

ইচু ভগ্নস্বরে বলে—কিন্তু উকিল মোক্তার বাবুদের ট্যাকা মুই কন থে দেব? মোর হাতে একটা ট্যাকা আছে কালকার জনের দরুন। তাতে হবে?

হাফেজ বললে—টাকার জন্যি তোমার ভাবনা হচ্ছে কেন। তোমার জান যদি বাঁচে কত ট্যাকা হবে। সে ভাবনা মোদের। তুমি চল দিনি। কি বল বছিরদ্দি?

বছিরদ্দি বললে—তা নিচ্চয়। টাকার জন্যি তুমি ভেবো না। সে মোরা দ্যাখব।

হাফেজ বললে—রেল লাইন ধরে চল যাওয়া যাক। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলি পুলিশ ধরবে।

বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওরা বনগ্রামের বড় মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে মশায়ের বাসায় পৌঁছে গেল। রামলালবাবু বেশিক্ষণ ওঠেননি, সেরেস্তায় বসেই চা খাচ্ছেন এবং মুহুরী দুলাল চক্রবর্তীকে বিলম্ব করে আসার জন্যে তিরস্কার করছেন—কাল চলে গেলে কাছারি থেকে বাড়ী, জামিননামা দুটো সই করাতে হবে, তোমার সে খেয়াল থাকে না। এখন এলে আটটার সময়—এমন করলে কি করে আমি কাজ চালাই? ওদের দরখাস্তের নকল নেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে, নকলের জন্যে দরখাস্ত করা হয়েছে। কাল বিনয়বাবু সকাল সকাল চলে গিয়েছিল, দেখা পাইনি।

—সকালে কাছারিতে গিয়ে আজ নকল দুখানা বার করে ফেল আগে—নইলে জেরাই হবে না। কে? কেত্থেকে আসা হচ্ছে?

হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে নীচু হয়ে ডান হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—সালাম, বাবু।

—কি ব্যাপার? বাড়ী কোথায়

হাফেজ মণ্ডল বললে—বিপদে পড়ে অ্যালাম বাবুর কাছে। বড্ড বিপদে পড়ে গিয়েছি। খুনের ফ্যাসাদ।

রামলালবাবু প্রবীণ মোক্তার। মোক্তারী ব্যবসায় চুল পাকিয়েছেন—শক্ত কেসে লোক যখন পড়ে, তখন দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পয়সা খরচ করে, ধীরভাবে সে পয়সা আদায় করতে হয়। সুতরাং একটা সিগারেট ধরিয়ে (প্রবীণ হলেও রামলালবাবু তামাক খান না, সিগারেটখোর) আরাম করে টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—খুন? কি রকম খুন?

হাফেজ ইচুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই লোকের বৌ গলা কাটা অবস্থায় কাল রাতে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েছে।

—ওর নাম কি?

—ইচু।

—ও রাত্রে কোথায় ছিল ?

—বাড়ীতেই শুয়ে ছিল বাবু।

—বৌ-এর স্বভাবচরিত্র কেমন ?

হাফেজ চুপ করে রইল। সে প্রবীণ লোক, গ্রামের মোড়ল—তার মুখ দিয়ে আর ও কথা বার হয় কেন ? বছিরদ্দি শেখ পাশ থেকে ঈষৎ গলা খাঁকার নিয়ে বললে—বাবু, ভাল না।

ইচু অবাক হয়ে বছিরদ্দির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নিমির স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না ? কই, একদিনও তো সে কিছু জানে না ! সে নিমির স্বামী, সে-ই কেবল জানে না, আর সবাই জানে।

হাফেজ চুপ করেই রইল। বছিরদ্দি বলে যেতে লাগল—বাবু, এ লোক বড্ড ভাল-মানুষ—নিরীহ ভালমানুষ। ও কিচ্ছু জানে না এসব কথা। খুনও ও করেনি।

রামলাল মোক্তার বাধা দিয়ে ধমকের সুরে বললেন—তুমি কি করে জানলে ? তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকে খুন করবে নাকি ? যা তুমি জান তাই বল ; যা জান না তা নিয়ে জ্যাঠামি করো না। যাও বস ওখানে।

পরে হাফেজের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি কি জান বল মোড়ল।

বছিরদ্দির অবস্থা-বিপর্যয়ে হাফেজ একটু ভয় খেয়ে গেল। সমীহ করে সংযত হয়ে বললে—আজ্ঞে বাবু যা বলছেন, অতি লেহ্য কথা। তবে ইচু আমাদের লোক ভাল। সবাই এ কথা জানে। আপনি সব লোককে জিজ্ঞেস কর, সবাই একথা বলবে।

রামলালবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললেন—ঘটনা বল।

হাফেজ ঘটনা বর্ণনা করলে। ইচু মণ্ডলের মুখে যা সে শুনেছে। জন খেটে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সবাই গিয়ে ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়। ও বলেছিল, রাত্রে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল, কি হয়েছে না হয়েছে কিছু জানে না। শোবার আগে ওর স্ত্রী ওকে ভাত খেতে দিয়েছিল। ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

—আত্মহত্যা নয় ?

—না বাবু। গলায় অস্তরের দাগ দেখলিই বোঝা যায়। গলা কেটে রেল লাইনি ফেলে রেখেছিল।

রামলালবাবু বললেন—অন্তত তাই প্রিজামশন হবে। পুলিশেও তাই বলবে। লাশ দেখে কে আগে ?

—বাবু, মোর ভাই আর নবি শেখ সকালে রেল লাইনির ধারে নালায় মাছ ধরতি যাচ্ছিল, তারাই দেখতি পায়। পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমারে খবর দেয়। মুই তখনি দৌড়লাম লাইনির ধারে।

—আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, থাক। সুরতহাল আগে হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে। গ্রামের দফাদারকে খবর দিয়ে এসেছ তো ? বেশ করেছ ? বড্ড শক্ত কেস। সন্দেহ গিয়ে

ইচু মণ্ডলের উপরই পড়বে। বৌ-এর স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিল। ভালমানুষ লোক হঠাৎ রেগে উঠলে এসব ক্ষেত্রে ভয়ানক হয়ে ওঠে কিনা। তোমরা লুকিয়ে চলে এসেছ ?

—হ্যাঁ বাবু।

—একটা কথা শিখিয়ে দিই। ইচু ?

ইচু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। তার পা-দুটো ঈষৎ কাঁপছে।

—বলি শোন। তুমি খুন করেছ কি না করেছ তা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করব না। আমাদের তা কাজ নয়। আমরা ধরে নেব তুমি খুন করনি। কিন্তু পুলিশে তা শুনবে না। তোমাকে আজ সম্ভব রাস্তায় যেতে যেতেই গ্রেপ্তার করবে। তোমায় স্বীকার করাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা হবে। কিন্তু কিছুতেই তুমি বলো না যে তুমি খুন করেছ। স্বীকার কিছুতেই করবে না। করেই থাক বা না-ই করে থাক। বুঝলে ? যাও, সাবধানে যাও।

হাফেজ বললে বাবু, পুলিশি ধরলি রাখবে কনে ওরে ?

—রাখবে হাজতে। যতদিন না বিচার শেষ হয়। তবে এখানে শেষ বিচার হবে না—দোষী প্রমাণ হলে দায়রায় চালান হবে যশোরে। সেখানে জজসাহেব বিচার করবে। বাড়ী গিয়ে পয়সা-কড়ি যোগাড় কর গিয়ে—বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছ—অনেক টাকার খেলা।

হাফেজ ও বছিরদ্দি সব শুনে যেন মাটির মধ্যে বসে গেল। বনগাঁয়ে মোক্তারবাবুর টাকাই যোগাড় হয় না, আবার যশোর জেলায় কোর্টের উকিলবাবুদের টাকা গরিব গ্রামের লোকের চাঁদায় কি যোগাড় হয়ে উঠবে ? ইচুকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে উঠল।

এতক্ষণ পরে ইচু কথা বললে। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। এইবার সে হাত জোড় করে বললে - বাবু, মোর একটি কথা বলবার আছে।

ওর মুখের দিকে সবাই চাইলে। মোক্তারবাবুও চাইলেন। এইবার বোধহয় সব প্রকাশ করতে চাইছে লোকটা। এই রকম ভাবেই বলে তিনি জানেন। হাফেজ ও বছিরদ্দি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। কি জানি ওর পেটে কি আছে। মানুষকে সব সময়ে বাইরে থেকে চেনা যায় না।

রামলাল মোক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। ভাবটা এই রকম—বলে ফেল বাপু যা আছে পেটে। অমন অনেক ঘুঘুই আমরা দেখলাম, তুমি এখন বাকি আছ।

ইচু রামলালবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—বাবু, মোর একটা দরবার আছে। যাতে হয় আপনি তা দেখবেন—মুই গরিব লোক, জন খেটে খাই, আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতি পারব না, গরিব বলে দয়া করে আবদার রাখবেন মোর—আল্লা, দিন-দুনিয়ার মালিক, আপনার ভাল করবে।

—আহা-হা, পা ছুঁয়ো না—কি—কি বল—

—বাবু, যেখানে মোরে রাখে, ঝা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু, আপনি এইটে

তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে ঝেন পাঁচ-ওক্ত নমাজ আমি সেখানে পড়তি পারি-- আর কিছু আমার বলবার নেই বাবু।

রামলালবাবুর সেরেস্তায় বজ্রপাত হলেও লোকে অতটা চকিত হোত না (সেকালের নভেলের বর্ণনা অনুযায়ী)। হাফেজ ও বছিরদ্দি আবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এ রকম কথা এ সময় তিনি সামান্য একজন গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে আশা করেননি, যে খুনের দায়ে আজ পথেই হয়তো পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হবে, আজ বাদে কাল যাকে দায়রায় চালান দেওয়া হবে---শত অসুবিধা, অর্থনাশ, নির্যাতন যার সামনে, আর আইনের খাঁড়া যার মাথার ওপর ঝুলছে---নিষ্ঠুর নিয়তির হৃদয়হীন রক্তাক্ত ইঙ্গিতের মত।

রামলালবাবুই সেদিন বার লাইব্রেরিতে গিয়ে গল্প করেছিলেন---সত্য অবাক হয়ে গেলাম ভায়া, যখন লোকটা ও কথা বললে। আজ যাকে পথেই অ্যারেস্ট করবে পুলিশে, কাল পুরবে হাজতে, যার সব যেতে বসেছে---সে যে ওই ধরনের রিকোয়েস্ট করতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। আমি আগে ভেবেছিলাম বুঝি কনফেস করবে। সামান্য একজন লোক---আমার চোখে জল এসে পড়ল ভায়া।

ওরা সব চলে গেল। ইচু শেখকে ওরা বাজার থেকে পেটভরে তেলেভাজা সিঙাড়া কচুরি আর মুড়ি খাওয়ালে। হাফেজ বললে---ওরে চাড্ডি হোটেলের ভাত খাইয়ে নিলি হোত। পুলিশি ধরলি কোথায় নিয়ে যাবে, আজ খাওয়া হবে কি না ঠিক তো নেই।

কিন্তু অত সকালে হোটেলে ভাত পাওয়া গেল না।

রাস্তা চলতে লাগল সবাই। দুপুরের কিছু দেরি আছে, ইচু পথের পাশে এক বটতলার ছায়ায় নমাজ পড়তে বসল। আর কোন কথা ওর মনে থাকে না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় আজ পথের ধারের গাছতলায় অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি নেমে আসে প্রাণে নমাজের সময়। সে সব ভুলে যায়। চোখে যেন জল আসে। নিমি কত ভাত রেঁধে দিয়েছে ---কত আদর-যত্ন করেছে। তার চরিত্র খারাপ ছিল? সে কিছু জানে না। নিমির জন্যে বুকের মধ্যে একটা বেদনা। নিমিকে সে খুন করবে? কাউকে কখনও খুন করার কথা তার মনে আসেনি। আল্লা সাক্ষী আছেন সব কাজের। ভয় কি? মালিক যা করবেন তাই হবে।

রাস্তায় ওকে পুলিশে ধরলে না। বেলা দুটোর সময় বাড়ী ফিরে ওরা দেখলে পুলিশ দফাদার অপেক্ষা করছে ওদের পাড়ার বড় মোড়লের বাড়ী। লোক গিজগিজ করছে। ডাকহাঁক, সাক্ষীর জবানবন্দি হতে বিকেল হয়ে গেল। শাইলপাড়া গ্রামের সবাই একবাক্যে দারোগার সামনে বললে ইচুর দ্বারা এ খুন হয়েছে তারা কেউ বিশ্বাস করে না। জবানবন্দিতে আরও প্রকাশ পেল। ইচুর স্ত্রী নিমি প্রায়ই রাত্রে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরুত। গ্রামের মধ্যে তার প্রেমিকের অভাব ছিল না। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। দারোগা ইচুকে সামনে ডাকিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন--- তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ?

—না, দারোগাবাবু। কিছু জানি নে মুই।

—জান এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে ?

—আল্লার ঝদি তাই মর্জি হয়, মোর মনে একটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু—তেনার ঝা মর্জি তাই তিনি করুক। মুই খুশি ছাড়া অখুশি হব না।

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—কাকে কি বলছেন বাবু ? আল্লার কথা উঠলি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন লোক এ দিগরে নেই।

দারোগাবাবু বললেন—তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে ?

–ঘরেই শুয়ে ছেলাম। মড়ার মত ঘুম এসেছে চকি, সনেকপুরের বিলি জন খাটেলাম সারাদিন। ওনারা ডাকলে সকালবেলা, তখন মুই ঘুম ভেঙে উঠি।

দারোগাবাবু অভিজ্ঞ লোক, পুলিশের চাকরি অনেকদিন করছেন। কে সাধু কে বদমাইস চেনেন, ইচুর দ্বারা এ কাজ হয়নি ওর মুখের দিকে চেয়ে তখনই বিদ্যুতের লেখা বাণীর মত তাঁর মনের মধ্যে এ সত্য উদয় হোল।

সেই সন্ধ্যায় ইচু নমাজ সেরে ভাঙা খালি ঘরে ঢুকতেই ওর প্রাণটা হা হা করে উঠল।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দে !

সে আপন মনেই ডাকল। নিমিকে সে কত ভালবাসত, যে যা বলে ওসব সে বিশ্বাস করে না। বিচার করবার সে কেউ নয়। নিমিকে সে ক্ষমা করেছে।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দিলি নে ?

পরদিন গ্রামের লোক সকালে উঠে ইচুকে আর তার ঘরে দেখতে পেলে না, সে এক-বস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কখন। গৃহস্থালির কলসী, হাঁড়িকুড়ি, নারকোলের মালা, দু-একখানা পিতলের ঘটিবাটি সব ফেলে রেখে গিয়েছে।

এলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণকুটিরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুর-চটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নমাজ পড়ে, তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির।

বনের পাপিয়া

কাজী নজরুল ইসলাম

গোঁসাই পাখোলা স্টীমার-স্টেশন।

পূর্ণচাঁদের প্রেম-জ্যোৎস্নার ছোঁওয়ায় পদ্মা নদী যেন আবিষ্টা হয়ে দুলছে। তার হৃদয়ের আনন্দ দেহের কূলে কূলে আছড়ে পড়ছে।

কূলে বসে ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ দুঃশাসন মিত্রের স্ত্রী রমলা।

মিঃ মিত্র অস্থির চিত্তে পায়চারী করছেন আর মাঝে মাঝে এসে তাগাদা দিচ্ছেন—'রমলা, রাত্রে প্রায় নয়টা হ'ল—এইবার ওঠ।' রমলা, আবিষ্টার মত পদ্মার ঢেউ দেখছিল—কোনো উত্তর দিল না। দূরে আবছায়ার মত একটা ডিঙি নৌকায় সরল ভাটিয়ালি সুরে কার বাঁশী বেজে উঠল। রমলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল 'ওগো দেখছ? ঐ চাঁদ যেন কৃষ্ণ, পদ্মা যেন রাধা—ওর ঢেউ যেন নীল সাড়ি, কৃষ্ণকে দেখে ওর সারা দেহে প্রাণে যেন নাচন লেগেছে। ঐ দেখ, বাঁশী শুনে ওর উন্মাদ দশা আরো বেড়ে উঠেছে!'

মিঃ মিত্র রমলাকে অত্যন্ত ভয় করতেন। ও বড় জেদী মেয়ে। অপরূপা সুন্দরী, তার ওপর বাপের বাড়ী থেকে বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি নিয়ে এসেছে। অত্যন্ত আনন্দ চঞ্চলা, তবু কোথায় যেন তার কী অভাব। হঠাৎ সে হয়ে যায় অন্যমনস্কা। তার মুখে কোন না-জানা বিরহের ছলছল ছায়া পড়ে। রমলাকে এই অবস্থায় দেখলে মিঃ মিত্র অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওর এই ভাবের কোন অর্থ না পেয়ে সাংসারিক অর্থের কথা পেড়ে আরো অনর্থের সৃষ্টি করেন। রমলা কেঁদে-কেটে মোটরে ক'রে পদ্মার তীরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। মিঃ মিত্র—দুঃশাসন নাম হলেও তাকে শাসন করতে পারেন না। কারণ ঐ মোটর তারই বাবার টাকায় কেনা—ওঁর চাকরী রমলারই বাবার সুপারিশে।

রমলা যখন পদ্মা নদীর ঢেউ আর চাঁদকে রাধাকৃষ্ণের লীলা মনে করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে যা মনে আসছিল বলে যাচ্ছিল—তখন মিঃ মিত্র একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলে উঠলেন—কীর্ত্তন শিখতে গিয়ে তোমায় এই পাগলামীতে ধরেছে রমলা'। রমলার বাবা কৃষ্ণ-ভক্ত, বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হয়। রমলাও কিছু কিছু কীর্ত্তন গাইতে পারে। ও যখন গায় তখন ওর মন যেন বৃন্দাবনে চলে যায়—যত না গায়, তার চেয়ে কাঁদে বেশী।

রমলা কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই কোথা হ'তে একটা পাখী উড়ে এসে একেবারে রমলার বুকের উপর এসে পড়ল। রমলা চমকে 'উঃ' বলে চীৎকার ক'রে উঠতেই মিঃ মিত্র পাখীটাকে ধ'রে বলে উঠলেন— রমলা দেখেছ কী সুন্দর একটা পাখী! এ কি এর যে ডানা ভাঙা'! রমলা মিঃ মিত্রের হাত থেকে পাখীটাকে কেড়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরে দেখতে লাগল। কি পাখী, কিছুতেই চিনতে পারল না। মিঃ মিত্র বললেন, 'হরবোলা'। রমলা অনেকক্ষণ ধরে পাখীটাকে নেড়েচেড়ে দেখলে। আশ্চর্য্য পাখীটা যেন ওর কতকালের পোষ-মানা, উড়ে যাবার কোন চেষ্টা করল না। মিঃ মিত্র কেবলই বলতে লাগলেন, 'দেখছ না, ওর নিশ্চয়ই ডানা ভাঙা, নৈলে উড়বার চেষ্টা করছে না কেন?'

রমলা ধরা গলায় বলে উঠল—'বাড়ী চল!' পাখীটা দিব্যি মাথা গুঁজে পড়ে রইল, ও যেন ওর হারানো নীড় পেয়েছে—চোখ দুটী যেন ঘুমে আবিষ্ট, একটুও নড়ল না।

বাড়ী এসে মিঃ মিত্র হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন পাখীটাকে রাখা যায় কোথায় এই নিয়ে। রমলা তার ড্রইং রুমে পাখীটাকে নিয়ে ঢুকে চমকে উঠল। তার বুকের আঁচলে রক্তের দাগ কোথা থেকে এল? পাখীটাকে নাড়াচাড়া করে দেখল, ওর কণ্ঠ দিয়ে রক্ত ঝরছে—কোনো বন্য পশু বা সাপ হয়ত ওকে আক্রমণ করেছিল। রমলার বুকে যেন ঐ আহত পাখীর বেদনা বেজে উঠল। সে তাড়াতাড়ি হলুদ, আইডীন, চুণ প্রভৃতি লাগিয়ে পাখীটাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল—ও যদি না বাঁচে! বাপের বাড়ীতে রমলাকে ওর দাদারা "ছিঁচকাদুনী" বলে ডাকত, পশু পক্ষীর এতটুকু দুঃখ দেখলে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। সে কেবলই বাড়ীর ঝি চাকরদের বলতে লাগল "দেখেছিস, পাখীটা যেন আমার কতকালের পোষা, এই দেখ ছেড়ে দিচ্ছি, তবু পালিয়ে যায় না।" বলেই পাখীটাকে বুকে চেপে অজস্র চুম্বন করতে লাগল। একটু পরেই মিঃ মিত্র হাঁপাতে হাঁপাতে শহর থেকে একটা মস্ত খাঁচা নিয়ে এসে বললেন, "রমলা, এই দেখ, খাঁচা নিয়ে এসেছি—দেখেছ খাঁচাটা কি সুন্দর!" বলেই রমলার হাত থেকে পাখীটাকে নিয়ে খাঁচায় পুরে বলতে লাগলেন—"এ জাতের পাখী ত কখনো দেখিনি! খানিকটা বৌ কথা কও পাখীর মত দেখাচ্ছে—পাপিয়াও হতে পারে।" দু' একজন চাকর সায় দিলে বললে "আজ্ঞা হাঁ এটা পাপিয়া।"

আহত কণ্ঠ পাখীর কণ্ঠে এখন প্রায় "পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা" স্বর শোনা যায়।

রমলার চার পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, সন্তানাদি হয়নি। তার বিশেষ সখ আছে বলেও

মনে হয় না। সবাই বলে ও যেন কেমন এক ধরনের মেয়ে। বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ কেউ নেই। অন্য সব অফিসারদের স্ত্রীরা আলাপ করতে আসেন, সে আলাপ ভদ্রতা সৌজন্যের আবাধ্যেই শেষ হয়। বন্ধুত্ব কারুর সাথেই হ'ল না। এতে মিঃ মিত্র মনে মনে খুশী—আলাপ জমলে যদি খরচা বাড়ে। মিঃ মিত্র বেশ খানিকটা কৃপণ। চাকরেরা বলে, পিঁপড়া নিঙড়ে উনি গুড় বের করেন।

মাসখানেক পর দেখা গেল, পাপিয়াটা খাঁচায় থাকতে চায় না—কেবলই পাখা ঝাপটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। রমলার প্রথম প্রথম ভয় হ'ত ও যদি উড়ে যায়। ভয়ে ঘরের দোর বন্ধ করে খাঁচার বাইরে এনে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে দেখত, ও পালিয়ে যেতে চায় কিনা। খাঁচার আশ্রয়ের চেয়ে রমলার বুকের আশ্রয় যেন পাখীটার অনেক বেশী মধুর লাগত। সে রমলার বুকে এসে কেবলই ডাকত—"পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা"। রমলা হেসে বলত—"আমি কি জানি!" বলেই চুমো খেত, চোখ দিয়ে তার অকারণে জল আসত। কয়েক মাস পরে দেখা গেল পাখীটা অদ্ভুত পোষ মেনে গেছে। ওর উড়ে যাবার কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা নেই। বাসার সকলেই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে পাখীটা প্রায় অনেক কথাই শুনে শুনে আধো-আধো ভাবে বলতে পারে। ঝি-চাকরদের নাম ধরে ডাকে। কীর্ত্তন শুনলে—"রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ" বলে অনবরত উচ্চ হতে উচ্চস্বরে কণ্ঠ চড়িয়ে যেন কাঁদতে থাকে। রমলা গান থামিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে অশ্রু-ছলছল কণ্ঠে বলে—"বৃন্দাবনের পাখী"। মিঃ মিত্রের বন্ধুবান্ধব চাকর ঝি সবাই বলে—"ও হরি-বোলা"। কারণ, হর-বোলা পাখী দেখতে এ রকম হয় না। কত বাড়ী থেকে কত লোক পাখীটাকে দেখতে আসে। এক বছর হয়ে গেছে—এখন পাখীটা অনেক কথা বলতে পারে…।

হঠাৎ পাখীটার কি রোগে ধরল, রমলাকে দেখলেই "পিয়া, পিয়া" বলে ডেকে ওঠে। রমলার হৃদয় আনন্দে দুলে ওঠে—সেই আনন্দের মাঝে সে কী যেন গভীর বেদনার আভাস পায়। কোথা হ'তে এল এই বনের পাখী, কে শিখালে তাকে এ ডাকনামে ডাকতে? ও কি বৃন্দাবনের দূত? ও কি কৃষ্ণের বেণুকা? পাখীকে বুকে জড়িয়ে সে কাঁদতে থাকে—ওকে না দেখে সে থাকতে পারে না। যেখানে যায়, সাথে করে পাখীটাকে নিয়ে যায়…।

প্রথম প্রথম মিঃ মিত্রও পাখীটাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি রমলার কাছে গেলেই পাখীটা ডেকে উঠত—"চোখ গেল, চোখ গেল!" রমলা হেসে বলত—"ছেড়ে দেও, ওর হিংসে হচ্ছে, ও সব বুঝতে পারে!" মিঃ মিত্র পাখীটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে রমলাকে আরো বেশী আদর করতেন—পাখীটা তত ডাকত "চোখ গেল, চোখ গেল"। দুইজনে হেসে গড়িয়ে পড়ত।

আগে পাখীর হিংসা হ'ত এখন মিঃ মিত্রের হিংসা হয়। রমলা যেন মিঃ মিত্রের চেয়ে পাখীটাকে বেশী ভালবাসে। সর্বদা পাখীর চিন্তা, ওকে নিয়ে খেলা। ও কিসে ভাল থাকবে, কি খাবে—ইত্যাদি নিয়ে অহেতুক ভয়-ভাবনা। পাখী পিঁজরায় থাকবে, দুবার ডাকবে—ভাল লাগবে, বুকে নিয়ে না হয় খানিক আদরও করল, কিন্তু রাতদিন

পাখী আর পাখী—আঁখি ছাড়া হতে দেবে না, এ যেন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল।

একদিন বলেই ফেললেন—"রুমু, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ পাখীটাকে নিয়ে।" রমলার বুকে কে যেন চাবুক মারল—সে আহত ফণিনীর মত ফণা তুলে বলে উঠল—"তার মানে ?" মিঃ মিত্র উষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন "তার মানে আমার চেয়ে তুমিই বেশী বোঝ।"

রমলা আরক্ত মুখে নত নেত্রে কী খানিকক্ষণ ভাবলে তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, "আমাকে কখনো কারুর সাথে মিশতে দেখেছ, ছেলে কি মেয়ে ?" মিঃ মিত্র বললেন, "না" ! রমলা আবার বলল, "আমার আচরণে চলা ফেরায় কখনো এমন ভাব দেখেছো, যাতে তোমাকে পীড়া দেয় ?" মিঃ মিত্র হঠাৎ যেন অপরাধীর মত রমলার হাত ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ও কথা কেন বলছ রুমু ? সত্যি, অন্য বন্ধুদের স্ত্রীদের আচরণ চলাফেরা অন্যের সাথে মেলামেশা দেখে আমার গা রি-রি করতে থাকে। আধুনিক ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় যে কুৎসিত অসংযমের পরিচয় পাই, তার আভাস পর্য্যন্ত পাইনি কোনদিন তোমার জীবনে। আমি এইখানে নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করি। রমলার চোখ দুটী শুকতারার মত ঝলমল করতে লাগল—মাঝে মাঝে সে এমনি ক'রে মিঃ মিত্রের দিকে চায়। মিঃ মিত্র এই দৃষ্টিকে অত্যন্ত ভয় করেন—এ যেন কোনো দেবীর দৃষ্টি—শ্রদ্ধায় ভয়ে মিঃ মিত্রের রমলাকে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে।

রমলা বলল—"ঐ পাখীর কণ্ঠে বৃন্দাবন কিশোরের আহ্বান শুনি। ও ত পাখী নয়। ও যে তাঁর হাতের বেণুকা—ওকে বুকে ধরে আমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকরের স্পর্শ পাই। ওকে যদি হিংসা কর তাহলে ভাবব, তুমি অসুর, তোমার সাথে আমার কোন সংস্পর্শ থাকবে না।"

মিঃ মিত্র সহসা যেন অসুর হয়ে উঠলেন। অজগর সাপের মত তার চোখ জ্বলতে লাগল। চীৎকার করে বলতে লাগলেন—"জানি, তোমার বাবার অনেক টাকা, আমার সম্পত্তি, চাকরী সব তাঁরই দেওয়া, তুমি অনায়াসে আমায় ছেড়ে যেতে পার, চাই কি আর একটা বিয়েও করতে পার"—রমলা মিঃ মিত্রের কথা শেষ হ'তে দিল না, প্রদীপ্ত মহিমায় সে যেন অসি-লতার মত ঝলমল ক'রে উঠলো, সারা অঙ্গে যেন অপরূপ জ্যোতি ফুটে উঠলো। মিঃ মিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল—"তুমি অসুন্দর, তুমি কুৎসিৎ, তোমাকে দেখলে, তোমার কথা শুনলে আমার পরম সুন্দরকে ভুলে যাই—এই সুন্দর পৃথিবী আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে ওঠে। তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও।" শেষের কথা কয়টী যেন আদেশের মত শুনাল।

রমলা শোফারকে ডেকে মোটরে ক'রে মিঃ দত্তের বাড়ী চলে গেল। মিঃ দত্ত একজন বৃদ্ধ মুন্সেফ, তাঁর স্ত্রী রমলাকে মেয়ের মত আদর করেন। রমলার বন্ধুবান্ধব বলতে এই এক মিসেস দত্ত। রমলা একে মা বলে সম্বোধন করে—তার মা নেই।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরেই তার মনে হ'ল—এই কলহের আবর্ত্তে পড়ে সে পাখীটার কথা একেবারেই ভুলে গেছিল। সারাদিন তাকে ডাকে নি, তার কথা স্মরণ করে নি, তাকে

দেখেনি। তার বুক অসহ্য ব্যথায় টনটন করতে লাগল। সে প্রায় উন্মাদিনীর মত তার ড্রইং রুমে ঢুকতেই দেখল—পিঞ্জর শূন্য, পাখী নেই। রমলার সমস্ত শরীর যেন টলতে লাগল। সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল।

বহুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে সে চাকরদের ডেকে বলল—"আমার পাপিয়া, পাপিয়া কোথায় গেল ?" ঝি-চাকর কেউ কোনো উত্তর দিল না। রমলার বুঝতে বাকী রইল না, যে, মিঃ মিত্রই পাখীটাকে হয় ছেড়ে দিয়েছেন, কিম্বা—

এমন সময় মিঃ মিত্র ঘরে ঢুকলেন।

রমলার সারা দেহ যেন দিব্যশক্তির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে মিঃ মিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"আমার পাপিয়া কোথায় ?" মিঃ মিত্র কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন—"বনের পাখীকে বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

রমলা তার বেণী খুলতে খুলতে বলল—"তা হ'লে আমিও বনে চললুম।"

মিঃ মিত্র দৈত্যের মত তাঁর প্রকাণ্ড শরীর দুলিয়ে বললেন 'বনে গিয়েও তাকে আর পাবে না—তার পাখা ভেঙ্গে সে যেখান থেকে এসেছিল, সেই পদ্মার তীরে বনে ফেলে দিয়ে এসেছি—সে এতক্ষণ বন-বেরাল বা সাপের গর্ভে গিয়ে মুক্তিলাভ করেছে—না হয় পদ্মার ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।' মিঃ মিত্র যতক্ষণ উগ্র মূর্তি ধারণ ক'রে এইকথা বলছিলেন, রমলা, ততক্ষণে তার সমস্ত অলঙ্কার, কাঁকন, চুড়ি খুলে কেশ এলিয়ে অপরূপ নিরাভরণা মূর্ত্তিতে আবিষ্টার মত দুলতে দুলতে বলল—'তুমি তাকে আহত করতে পার, কিন্তু হত করতে পারনা। সে যে বৃন্দাবনের পাখী। তুমি আমার পতি-স্বামী, কিন্তু ও পাখী যাঁর দূত হয়ে এসেছিল তিনি আমার পরম পতি, পরম স্বামী। জনমে জনমে আমি তাঁর দাসী, তাঁর প্রিয়া। তুমি জান, তুমি যতদিন আমার স্বামী ছিলে, ততদিন আমি আমার কোনো কর্ত্তব্যের অবহেলা করিনি। আমার সমস্ত দেহমন প্রাণ দিয়ে তোমার সেবা করেছি। আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমাকে দিয়েছি। ঐ ঐশ্বর্য্য দিয়ে তুমি আবার বিয়ে কোরো। জানি না কার অভিশাপে অসুরের পত্নী হয়ে এসেছিলুম। আমি কি পূর্ব জন্মে তুলসী ছিলাম ? কৃষ্ণবক্ষ বিলাসিনী তুলসীকে শঙ্খ-চূড় দৈত্যের পত্নী হ'তে হল। কিন্তু অভিশাপের দীর্ঘদিন যখন কাটল তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তুলসীকে কেড়ে নিয়ে গেলেন। আমারও অভিশাপের জীবন আজ শেষ হ'ল আর এই পৃথিবীতে আমি আসব না, আর কোনো অসুন্দর আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। পাপিয়া !—পাপিয়া ! ঐ যে সে আমায় 'পিয়া পিয়া' বলে ডাকে ? আমি তোমার ডাক শুনেছি—আমি যাব—তোমার কাছে যাব' বলেই উন্মাদিনীর মত পদ্মা-তীরের দিকে ছুটল।

মিঃ মিত্র ক্রোধোন্মত্ত ছিলেন ব'লে তাকে ধরতে গেলেন না। গুম হয়ে বসে রাগে কাঁপতে লাগলেন।

রমলা পথে যায় আর ডাকে, 'পাপিয়া, আমার পাপিয়া !'

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঊর্দ্ধ্বে গগনে শুক্লা একাদশীর চাঁদ তার সামনে জ্যোৎস্নায় যেন

বিরহিনী শ্রীরাধার দিব্য অশ্রু ঝরে পড়ছে। জনহীন পথ, নদীর পাশে বন, সেই বনে উন্মাদিনী রমলা শতবার আছাড় খায়। কাঁটা লতায় তার নীলাম্বরী হয়ে যায় ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হয়ে যায় ক্ষত বিক্ষত—তবু সে ডাকে—'পাপিয়া—আমার বৃন্দাবনের পাপিয়া ফিরে আয় ফিরে আয়।'

সহসা যেন পদ্মানদীর বালুচরে সেই চেনা কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—'পিয়া-পিয়া!' রমলা পদ্মার চরে আছাড় খেয়ে পড়তেই আহত বক্ষে শ্রান্ত কণ্ঠে মুমূর্ষু পাপিয়া তার বক্ষে এসে ডাকতে লাগল—'পিয়া-পিয়া!' রমলা মৃত্যু আহত পাখীকে বক্ষে নিয়ে পদ্মার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার এলোকেশ পদ্মার ঢেউয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। তার অঙ্গের জ্যোতিতে পদ্মা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পদ্মার জলে তার মুখখানি যেন নিবেদিত পদ্মের মত ভাসতে লাগল। চন্দ্রালোকিত উদ্ধর্ব আকাশের পানে তার মুখ উন্মুখ হয়ে যেন কাকে দেখতে চাইল! বুকের পাপিয়াকে দুই হাতে করে উর্দ্ধে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মার ঢেউয়ে পদ্মা তার কৃষ্ণ ভ্রমরকে বুকে নিয়ে কোথায় ভেসে গেল, কে জানে!

তাজমহল

বনফুল

প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম। প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে। ট্রেন তখনও আগ্রা স্টেশনে পৌঁছয় নি। একজন সহযাত্রী ব'লে উঠলেন—ওই যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম।

ওই যে—

দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দ'মে গেলাম। চুনকাম-করা সাধারণ একটা মসজিদের মতো! ওই তাজমহল। তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। হাজার হোক তাজমহল। শা-জাহানের তাজমহল।···অবসন্ন অপরাহ্নে বন্দী শা-জাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে ব'সে এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের তাজমহল। আলমগীর নির্মম ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি··· মহাসমারোহে মিছিল চলেছে···সম্রাট শা-জাহান চলেছেন প্রিয়া-সন্নিধানে?···আর বিচ্ছেদ সইল না···সবাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে···ওই তাজমহলেই মমতাজের ঠিক পাশে শেষ-শয্যা প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল···হয়তো এখনও আছে···ওই তাজমহলেরই পাশে। দারা সেকোর···

চুনকাম-করা সাধারণ মসজিদের মতো তাজমহল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠেনি। জ্যোৎস্নার পূর্বাভাব দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি কানে এল। ঝাউ-বীথি থেকে নয়—মনে হল যেন সুদূর অতীত থেকে, মর্মর-ধ্বনি নয়, যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মতো। স্তূপীকৃত ঐতেই

কি তাজমহল ? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ। শুভ্র আভাষও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল—সমস্তটা মূর্ত হয়ে উঠল যেন সহসা বিস্মৃত চেতনাপটে। চাঁদ উঠল, জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজ-রাজেশ্বরী সাজাহান-মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর অনেকদিন কেটেছে।

কোন্ কনট্রাকটার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জন করে, কোন্ হোটেলওলা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিওলাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মতো সিগারেট পাইপ বিক্রী করে কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুকদের ঠকিয়ে টাঙাগুলো কি ভীষণ ভীষণ ভাড়া নেয়—এসব খবরও পুরোন হয়ে গেছে। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, ঊষায়, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে। এতবার যে আর চোখে লাগে না। চোখে পড়েই না। পাশ দিয়ে গেলেও না। তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল। আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি।

সেদিন 'আউট ডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি, এক বৃদ্ধ মুসলমান গেট দিয়ে ঢুকলো। পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা, ঝুড়ির ভারে মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে বেচারীর। ভাবলাম কোনও মেওয়া-ওলা বুঝি। ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম, ঝুড়ির ভেতর মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে আছে একটি। বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মতো, আলখাল্লা পরা, ধপধপে সাদা দাড়ি। এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম করে চোস্ত উর্দু ভাষায় বললে—নিজের বেগমকে পিঠে করে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে বলে। নিতান্ত গরীব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে—

কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাসপাতালের ভিতর গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপত্তি করেছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল। ক্যাংক্রাম্ অরিস! মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎস ভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না, দূর থেকে পিঠে করে বয়ে এনে এ-রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার ইনডোরেও জায়গা নেই তখন, অগত্যা হাসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম, বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধ। অন্যান্য রোগীরা আপত্তি করতে লাগল। কম্পাউণ্ডার, ড্রেসর, এমন কি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজী হল না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্র সেবা করে চলেছে। সকলের আপত্তি দেখে সরাতে হল বারান্দা থেকে। হাসপাতালের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। তারই তলায় থাকতে বললাম, তাই থাকতে লাগল। হাসপাতাল থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে যেত, আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ইনজেক্শান দিয়ে আসতাম। এভাবেই চলছিল।

একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি 'কল' থেকে ফিরেছি হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চাদরের তলায় রয়েছে বেগমসাহেব। নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! মোটর ঘোরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারা আটকায় না। বেগমসাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বললাম—হাসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চল আপাতত।

বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে—এর বাঁচবার কি কোনও আশা আছে হুজুর ?

সত্যি কথাই বলতে হল—না।

বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

পরদিন দেখি গাছতলা খালি। কেউ নেই।

আরও কয়েকদিন পরে—সেদিনও কল থেকে ফিরছি—একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কি যেন করছে বসে বসে। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কি করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে না কি? এগিয়ে গেলাম। কতকগুলা ভাঙা ইঁট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে।

"কি হচ্ছে এখানে মিয়াসাহেব—"

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

"বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।"

"কবর?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

চুপ করে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি থাক কোথায়?"

"আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরীব-পরবর।"

"দেখিনি তো কখনও তোমাকে। কি নাম তোমার?"

"ফকির শা-জাহান।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সারেঙ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
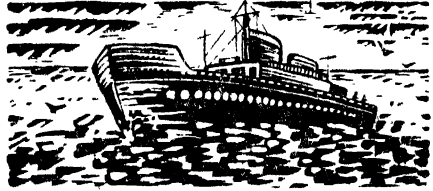
মা নাসিমকে মেরেছে। মা মেরেছিল মারুক, কিন্তু ও মারবে কেন? ও কে?

'গরু-বাছুর রাখি না-রাখি, চাষ-রোপণ করি না-করি, তাতে ওর কী? জমি খিল যায় তো যাবে, তাতে ওর কী মাথা-ব্যথা! ঘরের খড় বদলানো দরকার কি না-দরকার তা আমরা দেখব। ভিজতে হলে ভিজব আমরা মায়ে-পোয়ে। ওকে ছাতি মেলতে ডাকবে না কেউ।'

'না', গোলবানু বলে, 'এবার থেকে তত্ত্বপালন করবে গহুরালি।'

'কে গহুরালি?' নাসিম ঘাড় ঝাড়া দিয়ে তেড়ে ওঠে।

'মস্ত লোক। জমি আছে পাঁচ কানি। কাচারি আছে দরজায়। দায়েরী মোকদ্দমা আছে ক'নম্বর।'

'তাতে আমাদের কী?'

'ওকে ধরলে জমি-জায়গা ঠিক থাকবে, খাওন-পিরনের কষ্ট থাকবে না, খড়-কুটার বদলে ঢেউ-টিনের ঘর উঠবে একদিন।'

'চাই না। আমাদের এই ভাঙা ঘরই ভালো। আমরা শাক-লতা খেয়ে থাকব। তুই ওকে তাড়িয়ে দে।'

শক্ত মার দিলে গহুরালি। সঙ্গে সঙ্গে গোলবানুও হাত মেলাল।

বাপজান বেঁচে থাকলে এমন কেউ মারতে পারত না তাকে। মাঠে যাবার জন্য তাকে ঠেলাঠেলি করত না। সে জাল নিয়ে বিলে-বাওড়ে বেরিয়ে পড়ত মাছ ধরতে। বাপজান বলত, 'হাটে তোকে কাটা-কাপড়ের দোকান করে দেব একখানা।' 'তার চেয়ে আমাকে একটা নৌকা কিনে দাও', বলত নাসিম, 'মাটির চেয়ে দরিয়ার পানি আমার বেশি ভালো লাগে।'

বাজানের নৌকো কিনে দেবার সাধ্য ছিল না। নাসিম এখনো এত বড়ো হয়নি যে, কেরায়া নৌকো বেয়ে খেটে খাবে। তার জাল কবে ছিঁড়ে গেছে। তবু জালের টান সে ভুলতে পারে না। নদীর ধারে চুপটি করে বসে থাকে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

সে শুনেছে, মা নিকা বসবে গহরালির কাছে। এক ঘরের মানুষ হয়ে থাকবে তারা। নাসিমের আর জায়গা কোথায়? হাতনেয়, পাছ-দুয়ারে। লোকে যখন মাকে জিজ্ঞেস করবে 'এ কে?' তখন মা বলবে, 'আমার আগের পুরুষের সন্তান।' 'কার ভাতে আছিস?' যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে নাসিমকে, সে বলবে, 'গহরালির ভাতে।' বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে নাসিমের।

মাইল-খানেক দূরে ব্র্যাণ্ড লাইনের ইস্টিমার থামে। পাটক্ষেতের পাশে। জেটি বা ফ্ল্যাট নেই, বাদাম গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কাছি জড়িয়ে ইস্টিমার পাড় ঘেঁষে দাঁড়ায়, আশ্চর্যরকম গা বাঁচিয়ে। সটান পাড়ের উপরেই সিঁড়ি পড়ে দু'খানা। সিঁড়ির এ-ধার থেকে ও-ধারে বাঁশের লগি ধরে দাঁড়ায় দু'জন খালাসী। নামা-ওঠা করে যাত্রীরা। বাদাম গাছের তলায় বসে ছোট একটি টিনের বাক্সতে করে টিকিট বেচে ঘাট-সরকার। যারা নামে তাদের থেকে টিকিট কুড়োয়, ফাঁকি দিয়ে যে আসতে পেরেছে তার সঙ্গে এক ফাঁকে কথাটা সেরে রাখে। তারপর উঠে আসে ইস্টিমারে, হিসাব-কিতাব করতে জাহাজের বাবুর সঙ্গে। ঘাট-সরকার নেমে না-যাওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি তোলে না। একখানা তুললেও আরেকখানা রেখে দেয়। লগি লাগে না ঘাট-সরকারের।

ডোবা দেশ, প্রায় সময়েই জল থাকে দাঁড়িয়ে। গাছের গোড়াটাই যা একটু ট্যাকা-মতন। যাত্রীরা জল ভেঙে গিয়ে গাঁয়ের রাস্তা ধরে। হাতে-ঠেলা ডোঙা আছে একখানা। মালামাল থাকলে তার শরণ নেয়। বাচ্ছা-কাচ্ছারা কাঁধে-কাঁধে করে পার হয়। ছুটুলে বউ হলে পাঁজা-কোলে করে।

'সিঁড়ি তোল।' দোতলার থেকে সারেঙ হুকুম দেয়।

ঘাট-সরকার এখনো নামেনি বুঝি? না, এই নেমে গেল আঁকা-বাঁকা পায়ে। তুলে নিল শেষ সিঁড়িটা। হড়-হড়-হড়-হড় করে মোটা শিকলে বাঁধা নোঙর উঠে আসতে লাগল।

একটা লোক তাড়াতাড়িতে নামতে পারেনি বুঝি। লোক কোথায়, দশ-বারো বছরের ছেলে একটা। প্যাসেঞ্জার নাকি? কে জানে? জাহাজ দেখতে উঠে এসেছিল হয়তো দুষ্টুমি করে। তবে নেমে যেতে বল পরের ঘাটে, পাতাকাটায়। শেষ-বেলার ভাটিতে তরতরিয়ে বেয়ে যেতে পারবে এক মাল্লার নৌকায়। আন্ধার হয়ে যাবে, তীরে যাবে কি করে! আহা! বাপ-মা কত ভাববে না জানি।

ছোট ইস্টিমার, উপরের ঢালা ডেকে শুধু থার্ড ক্লাস। সামনের দিকে ফার্স্ট্ ক্লাসের দুটো পায়রার খোপ, আর তারই সামনের খোলা কোণাচে জায়গাটুকুতে সারেঙের হুইল। নাসিম একেবারে সেখানে এসে হাজির হল।

প্রথমটা কেউ দেখেও দেখেনি। ভেবেছে কলের কায়দা দেখবার জন্যে এমনি উঠে এসেছে বুঝি। কিন্তু না, নড়ে না ছেলেটা।

'কি চাই ?' চটি পায়ে, কিস্তি টুপি মাথায়, সারেঙ হুঁকো ফুঁকছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

'হুজুরের যদি চাকরের দরকার থাকে আমাকে রাখতে পারেন।'

'তোর দেশ কই ?' সারেঙ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নাসিমের মুখের দিকে।

'এইখানেই হুজুর, কনকদিয়া।'

'মা-বাপ আছে ?'

'কেউ নাই।'

আবার কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল সারেঙ। বললে, 'কাজ করতে পারবি তুই ?'

'কি-কি কাজ হুজুর ?'

'রাঁধা-বাড়া, ধোয়া-মোছা, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা—এইসব আর কি। পারবি? বেশ, লেগে যা তা হলে। মুফৎ একটা ছোকরা যদি পাওয়া যায় তো মন্দ কি'। হুইলের লোক ইয়াদালির সঙ্গে একবার চোখ-তাকাতাকি করে: 'অন্তত হুঁকোটা তো সাজতে পারবে, গা-হাত-পা টিপে দিতে পারবে তো দরকার হলে।'

ইয়াদালি বলল, 'মাইনে পাবে না কিছু ?'

'মাইনে না হাতি!' সারেঙ ঝামটা দিয়ে উঠল: সোতের শ্যাওলা দিয়ে তরকারি রান্না করে খেতে হবে? বয়ে গেছে আমার! অমনি থাকতে চায় তো থাকবে, নইলে নামিয়ে দেব জোর করে। কি, টিকিট আছে ?'

'না হুজুর, মাইনে চাই না আমি।'

জাহাজে যে জায়গা পেয়েছে এই নাসিমের বেশি। বাপ নয়, চাচা নয়, মুনিব নয়, মালেক নয়, উটকো বাজে লোকের যে মার খেতে হবে না মুখ বুজে, এই তার অনেক। অজানার টানে যে ভাসতে পেরেছে অকূলে এই তার মহা সুখ।

'ভালো করে কাজ-কর্ম করতে পারলে জাহাজেই বহাল করব এক সময়। প্রথমেই সিঁড়ি, পরে পাটাতন, ক্রমে ক্রমে শুখানি, শেষে একেবারে সারেঙ। কে বলতে পারে? আগে বিনি-মাইনের চাকর শেষকালে এই জাহাজের জমিদার।' সারেঙ তার সাদা শীর্ণ দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল।

কিন্তু প্রথম দিনই রাত্রে নাসিম মার খেল সারেঙের হাতে। বেখেয়ালে ভেঙে ফেলেছিল একখানা কাচের বাসন। আর যায় কোথা! বলা-কওয়া নেই, মুখে-মাথায় ঘাড়ে-পিঠে পড়তে লাগল চাঁটির পর চাঁটি। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল নাসিম। বেশি গোলমাল করবে তো হাত-পা বেঁধে ফেলে দেবে কালো জলে।

ব্যথার চেয়ে আশ্চর্য লাগল বেশি নাসিমের। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে। এই এখানকার রেওয়াজ। সবাইকেই মার খেতে হয় সারেঙের হাতে। যারা সিঁড়ি দেয়, যারা পাটাতন ধোয়, যারা আছে লঙ্গরের কাজে, দড়িকাছির কাজে, যারা বা লাইট·

ঘোরায়, তাদের কাজের এতটুকু গলতি বা গাফিলতি হলেই শুরু হয় মারধোর। নিচে মেস্তুরির এলাকা। তাকে ঘিরে কাজ করে কয়লাওয়ালা, আগুনওয়ালা, ইঞ্জিনওয়ালা। কিন্তু চরম শাসনের ভার সারেঙের হেফাজতে। ভুল করেছে কেউ, এক কল ঘোরাতে আরেক কল ঘুরিয়ে দিয়েছে, এক ডাণ্ডা টানতে আরেক ডাণ্ডা টেনেছে, তা হলে আর রক্ষে নেই। লাথি-চড়, জাত-বেজাতের গালাগালি, জুতা-পিটি পর্যন্ত! তাতেও না শানায়, চাকরি থেকে বরখাস্ত।

কেনই বা হবে না শুনি? কোম্পানি শুধু সারেঙকে চেনে, সারেঙকে বোঝে। জাহাজের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সে। সমস্ত দায়িত্ব তার। চলতি পথে ইস্টিমার যদি নৌকা ডুবিয়ে ফেলে, খেসারত দিতে হবে সারেঙ সাহেবকে। দুর্যোগে পড়ে খোদ ইস্টিমার যদি ডুবে যায়, দায়ী কে? কোম্পানির সাহেবরা নয়। যত কিছু মালি-মোকদ্দমা চলতি পথের ইস্টিমার নিয়ে,—সমস্ত ফলাফল সারেঙ সাহেবের। আর যদি ঝড়-তুফান থেকে ইস্টিমার পাড়ে ভিড়ানো যায় তার পুরস্কারও এই সারেঙ সাহেবরই প্রাপ্য। মেস্তুরি-খালাসীরা যতই হাঁক-ডাক দৌড়-ঝাঁপ করুক, যতই কায়দা-কেরামতি দেখাক, টাকার তোড়ার এক-আধটু ছিটে ফোঁটাও কারু বরাতে জুটবে না। যত মেডেল সব সারেঙ সাহেবের গলায় ঝোলানো।

'কী হল হঠাৎ?'

ইস্টিমার চরে ঠেকেছে। চোরা চর, কুয়াশায় ঠাহর হয়নি! চাকা বসে গেছে মাটির মধ্যে, শিগগির যে ছাড়ান পাবে এমন মনে হয় না। খবর পাঠাতে হবে বন্দরের ডকে, জালি বোটে করে লোক পাঠাতে হবে কাছের যে ইস্টিশানে টরে-টক্কা আছে। সেও এমন কিছু ধারাধারি নয়। বেশির ভাগ ইস্টিশনই তো গাছতলা বা ক্ষেত-খোলা। কম-সে-কম সাত-আট ঘণ্টা লেট্ আজ নিঘ্ঘাত। মধ্যিখানে যত ঘাটে যাত্রীরা ইস্টিমারের আশায় বসে আছে, তারা সমস্ত রাত আজ দূরে ধোঁয়া দেখবে আর হুইস্‌ল শুনবে।

দোষ কার?

দোষ শুখানির, দোষ সেকেণ্ড মেটের। লম্বা-চওড়া জোয়ান মরদ সব, এখন আর মারতে আরাম লাগে না, নিজের হাতে-পায়ে চোট লাগে। কিন্তু যাবে কোথায়? এই মাসের পুরো মাইনে বরবাদ হয়ে যাবে এদের। খোরাক কিনতে হবে নিজের পয়সায়।

সারেঙ যেন এই জাহাজের ইজরাদার। মোকররী ইজারা। যত খরচ সরঞ্জাম বাবদ, মেরামত বাবদ, খালাসী-মেস্তুরির মাইনে বাবদ—হিসেব করে একটা মোটা টাকা সারেঙের হাতে ধরে দেয় কোম্পানি। সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা করার মালিক এই সারেঙ। যাকে খুশি পুরো মাইনে দেয়, যাকে খুশি জরিমানা করে। যাকে খুশি খোরাক কাটে, যাকে খুশি জবাব দেয়। এর বিরুদ্ধে নালিস নেই, সালিস-ফয়সালা নেই। ভিতরের শাসন নিয়ে কোম্পানি মাথা ঘামায় না; সে দেখে, ঘাট থেকে ঘাটে মালে-মানুষে বোঝাই হয়ে ইস্টিমার মোটা মুনাফার মাশুল আনতে পারে কি না।

সমস্ত ইস্টিমার তাই সারেঙের কথায় ওঠে-বসে। সব কর্মচারী তার তাঁবেদার।

ইস্টিমার তো নয়, যেন সে লাটদারি পেয়েছে।

'কেঁদে কিছু লাভ হবে না।' পাশ থেকে বললে মকবুল, 'এমনি অনেক মার খেতে হবে। মার খেতে-খেতে তবে প্রমোশন।'

মকবুলও প্রথম ঢোকে চাকর হয়ে। পাকের কাজের নয়, সারেঙের ধোপা-মুচির কাজে। তিন বছর পর সে সিঁড়ি পেয়েছে। সিঁড়ির পরে পাবে পাটাতন, তার পরেই দাঁড় কাছি। মার না খেলে উন্নতি নেই জাহাজে।

'সাহেবের সুদৃষ্টি না হলে কিছুই হবার নেই। দশ-বারো বছর পর সাহেবের যদি দয়া হয়, সার্টিফিকট দেবে। পরে সেই সার্টিফিকটের জোরে দেয়া যাবে সারেঙগিরি পরীক্ষা।' মুরুব্বির মতো বলে থার্ড মেট, আফসারউদ্দিন, 'সেই সার্টিফিকট না হলে সবই ফক্কা। তাই ভারী হাতে সারেঙের পায়ে তেল মাখা চাই। তারপর পাস করে একবার সারেঙ হয়ে নিতে পারলে পায় কে? তখন জমিদার তবিলদার সব একজন।'

'না হে না, এর মধ্যে একটু কথা আছে। যারা চাটগাঁর লোক তাদের দিকেই সাহেবের একটু টান বেশি।' গলা খাটো করে বলে বিলায়েত আলি, বয়লারের খালাসী ঃ 'নিজের বাড়ি চাটগাঁ কিনা। বলে, চাটগাঁ ছাড়া সারেঙ কোথায়? কথায় আছে, সারেঙ শুঁটকি দরগা, এই তিন নিয়ে চাটগাঁ! ধান ডাকাত খাল, এ তিন নিয়ে বরিশাল। সারেঙি করা তো ডাকাতি করা নয়।'

'তোর বাড়ি কোথায় রে ছ্যামরা?' সবাই জিগগেস করে একসঙ্গে।

'এ দেশে।' হতাশ মুখে বলে নাসিম। আর সবাইরও মুখ যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

পরদিন বেদম মার খেল আবদুল। জল মাপতে গিয়ে একটা লোহার কাঠি হারিয়ে ফেলেছে।

মারের সময় কেউ ধরতে আসে না, ছাড়াতে আসে না। এ একেবারে গা-সওয়া নিত্যিকার ব্যাপার। তবু চোখ ছাপিয়ে কান্নার কমতি নেই। নদীর জলে চোখ মুছতে মুছতে আবদুল বলে, 'মাইনের থেকে দাম আর তার সুদ তো কেটে নেবেই, তবু মেরে খামাখা জখম করবে।'

তবু প্রতিবাদ নেই, বিদ্রোহ নেই। নিজের সমর্থনে দুটো কথাও বলা যাবে না। মার ঠেকাবার জন্যে শক্ত করা যাবে না শরীরের হাড়-মাংস।

নাসিম ভাবে এরা সবাই বুঝি তার মতো নিরাশ্রয়, মা-বাপ-মরা।

তা কেন? সবাই সিঁড়ি থেকে শুরু করে উঠতে চায় জাহাজের 'ফানিলে'। সবাই সারেঙের সার্টিফিকট চায়। মার দিতে না দিলে ঐ হাতে সে কলম ধরবে কেন?

তাই সেদিন যখন মকবুলের সঙ্গে জল-তোলা নিয়ে ইয়ার্কি মারতে গিয়ে একটা বালতি নাসিম নদীতে ফেলে দিল তখন মার খেতে তার আর লজ্জা বোধ হল না। অপমানের জ্বালা পর্যন্ত লাগল না তার মনে। মকবুলের সঙ্গে, সমস্ত খালাসীর সঙ্গে সে দোস্তালি অনুভব করলে।

'তোর কি! মাইনে নেই, শুধু মারের উপর দিয়েই গেল।' মকবুল কান্নার মধ্যে

থেকে বললে, 'আর আমার পুরো মাইনেটাই বালতির অন্দরে কেটে নেবে। পরে মাসকাবারে বলবে, আমার থেকে আগাম নে। টাকায় দু-আনা করে সুদ দিবি। জাহাজে বসেই মহাজনি করে। কেউ আমাদের দেখবার-শোনবার নেই।' বলে উপরের দিকে তাকায়। যেন উপরআলা শুনছেন এই আর্তের ফরিয়াদ।

'অন্য জাহাজে চলে যেতে পারিস না?'

'তুই আছিস কোন তালে? এক জাহাজ থেকে ছাড়ান নিলে আর কোনো জাহাজেই ঠাঁই নেই। সারেঙদের মধ্যে সাঁট আছে। তাই তো মার খেয়েও মুখ বুজে থাকি যেন বরখাস্ত না করে। একবার বরখাস্ত করলেই বরবাদ হয়ে গেলাম। পানি ছেড়ে তখন গিয়ে হাল ধরতে হবে।'

'আর কোন জাহাজেই বা তুই যাবি?' পাশ থেকে ইয়াদালি ফোড়ন দেয়ঃ সব জাহাজেই এই রেওয়াজ।'

'এমনি পালিয়ে যাওয়া যায় না?'

সবাই হেসে ওঠে। সিঁড়ি থেকে 'ফানিলে' ওঠবার সাধনায় যারা জাহাজে ঢুকেছে, তাদের কাছে এটা নেহাত আজগুবি শোনায়।

'আর পালিয়ে যাওয়া সোজা নয়।' গম্ভীর মুখে বলে সেকেণ্ড মেটঃ 'তোর নাম-ঠিকানা সাহেবের নোটবুকে টোকা আছে। পালাবি আর পুলিসে এজাহার যাবে। বলবে, আমার জেবের মনিব্যাগ নিয়েছে, ঘড়ি নিয়েছে। কোম্পানি লড়বে সারেঙের হয়ে। ছিলি জাহাজে, যাবি জেলে।'

তবে এমনি করেই দিন যাবে নাসিমের? এই একঘেয়ে জলের শব্দ শুনে-শুনে? মাইনে নেই, থিত-ভিত নেই, এমনি করেই ভাসবে সে দিন-রাত?

'সাহেবকে খুশি করতে চেষ্টা কর, তা ছাড়া আর পথ নেই। দ্যাখ একবার সিঁড়ি ধরতে পারিস কিনা।'

আর কি করে সে খুশি করবে! যা কাজ তার উপরে সে সাহেবের গা-হাত-পা টেপে, গোসলের আগে তেল মেখে দেয়, চুলে বিলি কাটে। পাকের সময় শুখানি সাহায্য করতে আসে বলেই তার হাড়-মাস এখনো আলাদা হয়নি। তবু মন নেই, মাইনে নেই। বরং জরিমানা বাবদ কিছু তার কাটতে পারে না বলে সাহেবের বড়ো আফসোস; তাই মাঝে মাঝে তাকে উপোস করিয়ে রাখে। সে-সে বেলার লঙ্কা-পেঁয়াজের খরচ বাঁচায়।

চাল নুন লঙ্কা আর পেঁয়াজ সারেঙ যোগান দেয়। আর সব যার-যার মর্জি-মাফিক। তেল আর মশলা, মাছ আর তরকারি। মাসান্তে মাইনের টাকার থেকে যার-যার চাল-নুন, পেঁয়াজ-মরিচের খরচ কেটে রাখে সারেঙ। তাও তার মর্জি-মাফিক।

'যদি মন চাস সারেঙের, চুরি কর।' কে যেন বলে ফিসফিসিয়ে।

এই ইস্টিমারের সঙ্গে মাঝে-মাঝে বার্জ বাঁধা থাকে। তাতে বস্তা-বোঝাই চাল যায়, নুন যায়, লঙ্কা যায়। বার্জের সঙ্গে লোক থাকে। তার সঙ্গে কী বন্দোবস্ত সারেঙ-

মেস্তরির, স্টোর-রুমে চলে আসে চাল আর লবণ, মরিচ আর পেঁয়াজের ছালা। সেই চোরাই মালের উপর আবার মুনাফা মারে।

না, আর ভালো লাগে না। কোনো আশা নেই নাসিমের। একদিন অন্তর একদিন, একই রাস্তা দিয়ে ইস্টিমার ঘোরাফেরা করে। যেখানে আসার সময় সন্ধেবেলা—সেখানে আসতে কখনো মাঝ-রাত, কখনো বা পরদিন ভোর—শুধু এইটুকুই যা বৈচিত্র। নইলে একঘেয়ে জলের শব্দ, যাত্রীর ভিড়, নোঙর ওঠানামার হড়-হড়, সিঁড়ি ও কাছি ফেলবার সময় সেই ডাক-চিৎকার। ভালো লাগে না আর। ক'দিন পর-পর ঘুরে ঘুরে ইস্টিমার কনকদিয়ায় ফিরে আসে। নদী এত ছোট, তার স্রোত এত দুর্বল, ভাবতে পারত না নাসিম। আগে-আগে মনে হত নদী না-জানি চলে গেছে কোন সমুদ্দুরে। এই দেশ থেকে কোন দূর-বিদূরের বিদেশে।

নিরালায় অন্ধকারে নদীর দিকে চেয়ে কখনো একলাটি এসে বসে নাসিম। ঘন কালো জলে জুনিরাত ঝিলমিল করছে। আজ কনকদিয়া এসেছে মাঝরাতে। বাড়ি-ঘরের কথা মনে পড়ে নাসিমের। ভাবে, কোথায় তার বাড়ি-ঘর! তার বাড়ি-ঘর! তার বাড়ি-ঘর নেই, সেখানে ভূতের আস্তানা। মনে পড়ে মার কথা। মার মুখ। মনে করে, তার মা নেই। তার মা কবে মরে গেছে। মার মরা মুখের মতোই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না।

বড়ো চুরি না করতে পারে, ছোট ছিঁচকে চুরি কেন করতে পারবে না? দা হাতে করে ডাব বেচতে এসেছে গাঁ-গেরামের লোক, সারেঙ সাহেবের জন্য কিনলে দুটো দশ পয়সায়। জাহাজে উঠে এসে, সিঁড়ি যখন তুলে নিয়েছে, নাসিম সারেঙের কাছ থেকে একটা একানি নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ডাঙার উপর। আর ছ-পয়সা? নাসিম জিভ উলটিয়ে মুখ ভেঙচাল। বেচনদার ছোঁড়াটা নদী থেকে কাদা তুলে ছুঁড়ে মারল নাসিমের দিকে। জাহাজ তখন সরে এসেছে, লাগল না ছিটে-ফোঁটাও। সারেঙ আর নাসিম একসঙ্গে হাসতে লাগল।

এমনি, মাছ এসেছে বেচতে। বাঁশপাতা আর গাং-খয়রা। নাও কিছু ছল-ছাতুরী করে। দুধ এসেছে হাঁড়িতে, বাঁশের চোঙায় মেপে দেবে। দাম দেব জাহাজে উঠে। ক্ষেতের টাটকা শশা-খিরাই এনেছে ঝুড়িতে করে। ঘুসো চিংড়ি দিয়ে তরকারি হবে, না হয় অমনি কাঁচা খাব। তোমার দাম মারা যাবে না। আমি সারেঙ সাহেবের চাকর।

এতদিনে একটা নিমা পেয়েছে নাসিম। একখানা পানি-গামছা। লুঙ্গি একখানা পাবে কবে?

চারটে পয়সা চাইল নাসিম।

এমন স্পর্ধার কথা সারেঙ তার জীবনে শোনেনি। চোখ কপালে তুলে সারেঙ বললে, 'কী বললি? পয়সা?'

কী ভীষণ হারামি কথা না-জানি বলে ফেলেছে, এমনি ভয়-তরাসে চোখে তাকাল নাসিম।

'কী করবি পয়সা দিয়ে ?'

'চা খাব এক খুরি।'

অমনি বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় পড়ল তার গালের উপর। ঘুরে ছিটকে পড়ল নাসিম। সারেঙ গর্জে উঠল : 'এমন বেতরিবৎ! আমার কাছে কিনা বিড়ি চায়! বিড়ি কিনবে! চা কিনবে! কোন দিন শুনব বোতল কিনবে! তেরিবেরি করবি তো নদীর গহিনে নিখোঁজ করে দেব।'

চোখের জলে আবার মার কথা মনে পড়ে নাসিমের। মরে গেলে মার মুখ কেমন দেখাবে তাই সে অন্ধকারে জলের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। মার মরামুখের কথা ভেবে মনে সে জোর পায়। জোর পায় এই মার সহ্য করতে। 'মাগো' বলেও যদি সে কাঁদতে না পারে, তবে নিঃশব্দে হজম না করে উপায় কি ?

তবু এই অত্যাচারিতের দল একত্র হয় না। খোদ উপরআলা ছাড়া আর কারু কাছে তাদের নালিশ নেই। মুক্তিও নেই এই জাহাজের খোল থেকে। কবে কে সিঁড়ি পাবে, কবে কে পাটাতন, দড়িকাছি, নোঙর-লাইট বা মেস্তুরির ইলাকা—তারি আশায় সবাই দিন গোনে। কে কী ভাবে সারেঙের খাতির কাড়তে পারবে। সুদ নিয়ে, ঘুষ দিয়ে, চুরি করে, মার খেয়ে। চমৎকার গভর্ণমেণ্ট চালাচ্ছে সারেঙ সাহেব।

সেই রাত্রেই এক প্যাসেঞ্জারের এক জোড়া জুতো সরালো নাসিম। সারেঙ তা সটান নদীর মধ্যে ফেলে দিলে। বললে, 'বুদ্ধিকে তোর বলিহারি। আমি জুতো মসমসিয়ে বেড়াই আর আমাকে পুলিসে ধরুক।' পরদিন রাতে নাসিম যোগাড় করলে একটি টিনের সুটকেস। সেটাও গেল নদীর গহ্বরে। সেটার মধ্যে মোকদ্দমার নথি, পরচা-দাখিলা, ক'কেতা বেজাবেদা নকল।

কিছুতেই মনের মতো হতে পারছে না নাসিম। পারবি, পারবি, আস্তে-আস্তে পারবি। সারেঙের চাউনিটা তাই যেন তাকে বলে কানে-কানে। তার অক্ষমতার জন্যে সারেঙ রাগ করলেও তাকে সে সরাসরি মারে না তাতেই নাসিম উৎসাহ খোঁজে।

কোম্পানির আলোতে তেজ নেই, বৃষ্টি নামলে তেরপল নেই, মেয়ে-পুরুষের আলাদা কামরা নেই, তবু সবাইর চোখে ঘুম আছে। এমন ভদ্র যাত্রী নেই যে তাস খেলে বা গান বা খোস-গল্প করে। চাষাভুষোর লাইন। বন্যার তোড়ের মতো যারা খাটে, আর তাল-তাল মাংসপিণ্ড হয়ে যারা ঘুমোয়।

ঘুমের অগোছালে ট্যাঁক থেকে কার বেরিয়ে এসেছে টাকার পুঁটলি। নাসিম তা হাত-সাফাই করে তুলে নেয় আলগোছে। একবার ভাবে গুণে দেখি কত আছে। ভাবে পালিয়ে যাই পরের ইস্টিশানে। কিন্তু কে জানে, কী অদম্য আকর্ষণে সারেঙের কাছেই নিয়ে আসে। প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বাঘের মুখে গরুর মতো। যে শুধু মারে, যে হাসি-মুখে কথা কয় না, ন্যায্য অধিকারের কাণাকড়িও দেয় না হাতে ধরে, তাকেই খুশি করতে আগ্রহ হয়। যে অনবরত চুকলি শোনে, একের থেকে অন্যকে আলাদা করে রাখে তারই মন পাবার জন্যে কাড়াকাড়ির ধুম পড়ে যায়। কে কাকে হটিয়ে দেবে, চলে তার টেক্কা-টেক্কি।

'মোটে সাত টাকা সাড়ে ন' আনা।' বলে মকবুল ঃ 'এতে কী হবে। দু'কুড়ি সাত না হওয়া পর্যন্ত খেলা থাকে না, বলে আমাদের সারেঙ সাহেব।'

তবু কাপড়-চোপড়ের চেয়ে নগদ টাকা ভালো। সবচেয়ে ভালো, যদি হয় কিছু জেওর, সোনা-রূপা। দাম কত আজকাল! কাগজের টাকা তার কাছে রদ্দি, ওঁচা।

একখানা নতুন লুঙ্গি হয়েছে এতদিনে। এবার একটা হাফশার্ট।

কিন্তু গয়না কোথায় চাষার বউ-ঝিয়ারীদের? বড়ো জোর নাকে আংটি-চুংটি, হাতে কাচের ঝুরো চুড়ি। সোনাদানা নেই কোথাও।

না, আছে। নতুন বউ যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। গলায় সোনার হাসনা, হাতে বটফুল। পায়ে রূপোর খাড়ু, আঙুলে ওজরি। ফলসা রঙের শাড়ি পরে ঘোমটা টেনে ঘুমিয়ে আছে এক পাশে। বরযাত্রীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিক-ওদিক। কে কোথায় চেনবার উপায় নেই। নির্ফাক ভিড় আজ জাহাজে। তবু এরি মধ্যে ফাঁক খুঁজছে নাসিম।

নতুন বউর গলার কাছে নাসিম হাত রাখল। নরম তার গলার কাছটা। আঙুল কাঁপল না নাসিমের। একটানে ছিঁড়ে ফেলল হাসনা।

'চোর! চোর!' ভিড় ঠেলে ক'পা এগুতে না এগুতেই নাসিমকে ধরে ফেলল যাত্রীরা। তারপর সবাই তাকে মার লাগাল। প্রচণ্ড মার! যে এসে জিগগেস করছে কী হয়েছে, সেও পরক্ষণে মার লাগাচ্ছে। বামাল সরাতে পারেনি চোর, বউর বিছানার গোড়াতেই ফেলে এসেছে। তাতে কি? মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছে তো। হার তো ছিনিয়ে নিয়েছিল গলা থেকে। মার, মার, চাঁদা তুলে মার।

'বাবা গো—' নাসিম চীৎকার করে উঠল।

আচকান গায়ে, কিস্তি টুপি মাথায়, চটি পায়ে সারেঙ এসে হাসির। বলে, 'কী হয়েছে? কে মারছে আমার ছেলেকে?'

ছেলে! সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সারেঙ সাহেবের ছেলে!

কে বললে, 'ও আপনার চাকর ছিল তো জানতাম।'

'চাকর! মিথ্যে কথা। ও আমার বিয়ার ঘরের ছেলে। আমার মা-হারা সন্তান। ওকে মারে কে?

'ও গয়না চুরি করেছে নতুন দুলাহিনের। গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে হাসনা।'

'মিথ্যে কথা। হতেই পারে না। চলো, আমি নিজে পুছ করিগে বিবিকে।'

সারেঙ এগিয়ে এল নতুন বউর নজদিগে। বললে, 'আপনার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছে কেউ?'

পরদার বিবি ঢাকা-মুখে গলা খাটো করে বললে, 'না। ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়।'

লতাবাড়ি ইস্টিশান দেখা যায় কাছাকাছি। বয়ের পার্টি নামবে এইখানে। জাহাজ ঢিমে হয়ে এল। নোঙর নামতে লাগল হড়-হড় করে।

কাছির বাঁধ পড়ল গাছের সঙ্গে।

'সিঁড়ি দে, সিঁড়ি দে—' উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল সারেঙ : 'নাসিম কই ? নাসিমকে ডাক। সে আজ থেকে সিঁড়ি ধরবে।'

খালাসীদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে গেল। নাসিমের দীক্ষা হল এতদিনে, এত অল্প দিনে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েই কপাল ফিরল তার। আর যারা ধরা পড়েনি, তারা এখনো নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। সিঁড়ি থেকে পাটাতনে প্রমোশন পাচ্ছে না। আর এ আজ সিঁড়ি, কাল পাটাতন, পরশু শুখানি, পরে একেবারে সারেঙ, কাপ্তেন, জাহাজ-নাখোদা।

'ধর, ধর ও ছেলেমানুষ, ও একা কেন পারবে ? তোরা সবাই মিলে ওকে সাহায্য কর।' উপর থেকে জোরালো গলায় হুকুম হাঁকে সারেঙ।

সার্চ-লাইটের আলোয় নাসিমের জলে-ভরা চোখ দুটো চকচক করে ওঠে।

নতুন বউ নেমে যাবে লতাবাড়ি। পায়ে গুঞ্জরি বাজিয়ে আসছে।

আলো পড়েছে অনেক দূর। গাছ-গাছালির মাথায়। সিঁড়ি দিয়ে লগি ধরেছে নাসিম। দুলহিনকে বলছে, 'টলে পড়ে যাবেন। লগি ধরুন।'

না, লগি না ধরেই চলতে লাগল নতুন বউ।

পিছন থেকে কে ধাক্কা মারল নাসিমকে। চমকে চেয়ে দেখে, সেই লোকটা, ভিড়ের মধ্যে সবচেয়ে যে তাকে বেশি মেরেছে। আলোতে চিনল তাকে এতক্ষণে। গহরালি।

আলো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে গোলবানু। ঘন করে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। গায়ের চাদরটা বোরখার মতো করে চাপিয়ে দিয়েছে গায়ের উপর। ঘাটে অনেক বিরানা পুরুষের আনাগোনা।

ধরাধরি করে সিঁড়ি তুলতে লাগল নাসিম, একের পর আরেক চিলতে। পাড়ের কাছেকার ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা মুখ। আর উপরে দাঁড়িয়ে সারেঙ তাকে দরাজ গলায় বাহবা দিচ্ছে। উড়ছে তার সাদা আচকান, সাদা দাড়ি। দিন-রাত করে যে সূর্যি, যেন তার মতো চেহারা।

পাদটীকা

সৈয়দ মুজতবা আলী

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলেভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা যাঁরা কোনো গতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই স্কুল গুলোতে স্থান পেলেন। আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো স্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশীর চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃ-পিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল, অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়ত বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজী হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোলা লাগা', পাখী-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম

বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সে দিন কাজে লেগে গিয়েছিল। এবং তার পর মুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু কে উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।'

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশী এবং টেবিলের উপর পা দু'খানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশী। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিতমশাইকে খুশী করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশী স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই; 'দোলা-লাগা, 'পাখী জাগা'ই আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে এক মাত্র গোমাংস ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানাপ্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে। 'অনার্য, 'শাখামৃগ', 'দ্রাবিড়সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণতঃ সম্বোধন করতেন না; তা ছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধ-রূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মনস্থির করতে পারিনি যে, সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোনটা বেশী হয়েছে। পণ্ডিতমশায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম। তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকতো—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্রবারের মত স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে-দিন কোনো অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে-কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, 'কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করবার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল নয় কি?' তারপর কখনো আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলে টানাপাখার দিকে একদৃষ্টে

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি, ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—এ কথা অস্বীকার করার জো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজো যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা-তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে পড়া টিকিতে দোলা লাগা কাষ্ঠাসন শর-শয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন?

সে-সময়ে আসামের চীপ-কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসন্ বেল্। সাহেবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তাঁর নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'। 'এন. ডি'তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বীটসন্ বেল অর্থ 'বাজায় ঘণ্টা'—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সেই একদিন খবর দিল লাট সাহেব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে—পদার ভগ্নিপতি লাটের টুর ক্লার্ক না কি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকা খবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। একদিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ কসুর বিনা-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টার-দের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টারমশায়ের মেজাজ যখন সক্কলের প্রাণ ভাজা ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্ক-নাচন নাচছেন। যে-দিকে তাকাই সে-দিকেই হেড-মাস্টার। নিশ্চয়ই তার অনেকগুলো যমজ ভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বললে, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'দেখেই আয় না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানলা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! আমাদের পণ্ডিত মশাই একটা লম্বা-হাতা আন্‌কোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদ বাকি মাস্টাররা কলরব করে সে-গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন। নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন; কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কি বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছে (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তি ছিল না), কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে (হাতী, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মত দেখাচ্ছিল), কেউ বলছেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট অফিট কি?)। শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভশ্চাচ, এ রকম উম্‌দা গেঞ্জি স্রেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল, তার-ই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানী দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারো কপালে এ রকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাশী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেণ্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই—ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবী শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সায়েব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুল আসা চলবে না, তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিতমশাই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্যই আমরা তখন তৈরী কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কাঁদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায়, শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ

করেন, 'রাধামাধব, এ-কী গব্ব-যন্তণা', কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়মিড় খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন—লাট সায়েবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সায়েব এলে আমি জানলা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় ফের পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্তণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই; শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহ-ভরা চোখে বললেন, 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম।

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশী ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্তদেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে বেগ্‌নি রঙের আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনো বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময় মত ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্ব-যন্তণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন; সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইন্সপেকটর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সায়েবের এডিসি ফিডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পানডিট্' বলে সায়েব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিত-মশায়ের সর্ব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেলেও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃৎ-তদ্ধিতের বাই জানতেন; তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সাহেব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম, প্লীজ'। লাট সায়েব আমাদের বলল, 'প্লীজ', এ কী কাণ্ড! তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন 'বিহঙ্গ', আমরা চুপ,—তখনো প্লীজের

ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতেটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয়, দেশে নাম করে ফেলল—আমরা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সায়েব ততক্ষণে হেডমাস্টারের সঙ্গে 'পণ্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরেজিতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কি বলেছিলেন জানিনে, তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জয়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পণ্ড হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত!

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পণ্ডের ইতিহাস হয়ত রবীন্দ্রনাথ জানতেন না, না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়ত একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সায়েব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড্ করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম। আনন্দের আতিশয্যে নূতন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু' তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড্ হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, না শুধু চোখ বন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগরূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি। উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে।'

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সায়েবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশী নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, 'হল না। আর কে ছিল?' বললুম 'ঐ যে বললুম, এক গাদা এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারী না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেন নি'।

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মত অলম্বুষ?'

আমি কাতর হয়ে বললুম, আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই, জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে?'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ—রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে—

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ওতো এক সেকেণ্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না। সে কথা

যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো ?'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।'

অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন' শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরীতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকার মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে অনেক সেলাম টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা, লাট সায়েবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট দিতেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মত কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে-খবরটাও বেশ গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আটজনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদনমোহন কি রকম আঁক শেখায় রে ?'

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার—পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। তবে শোন। মিম্বর উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচা হয়। এইবার দেখি, কি রকম আঁক শিখেছিস। বলতো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয় ?'

আমি ভয় করছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা !' পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু !'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন। আমাদের সকলের জীবনধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের কটা ঠ্যাঙের সমান ?'

আমি হতবাক্‌।

'বল না।'

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মত একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পণ্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরন্ময়' 'Silence is golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।

রস

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ।

তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের এর আগের বউ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজুখাতুনের আছেই বা কি। বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত-ক্ষামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে মাজুখাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়ো পড়ো শণের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানকাটা হুরীর মত চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজুখাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদার-বাড়ির, কাজী-বাড়ির বউঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করছে মাগী, ধূলা-পড়া দিছে চৌখে।'

মুন্সীদের ছোটবউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দেখে না? এমন মানুষের চৌখে ধূলাপড়া দেওয়ানেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চৌখে। দেখছো তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধূলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা মোতালেফের। বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ ক'রে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খুবসুরৎ

চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মার ধোর করে এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশি আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা ক'রে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। এক নজরেই বুঝেছিল সে, সেও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গী পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হয় তার, তাছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম সেখের বাড়িতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গত বার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবারে আর না দেখে শুনে যার তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে আসলে তা পুরিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুণাগার দু'এক কুড়ি নয়, পাঁচকুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজী হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে।

মুখ ভার করে চলে আসছিল মোতালেফ। আশশেওড়া আর চোখ-উদানের আগাছার জঙ্গলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুলবানুর সঙ্গে। কলসী কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক ক'রে একটু হাসল ফুলবানু, কি মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি ?

'চলব না ? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের !'

ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি ? পছন্দসই জিনিস নেবা বা-জানের গুনা, তার দাম দেবা না ?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের নয়, বা-জানের মাইয়ার। হাটে বাজরে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান, পালায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা ভইরা সোনা জহরৎ ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন ক'রে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের

ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি ? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব ?'

এদিক ওদিক তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝ্‌ছ ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মত জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল, 'অইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবোন দেখবার ?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে দেখল মোতালেফ। গেল মল্লিকবাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ি—কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ ক'রে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনৎ কম নয়, এক একটি ক'রে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুৎসই ক'রে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই ক'রে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপ টুপ ক'রে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এ তো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হল। এর নাম খেজুরগাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না

হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুঁড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে, ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এ-সব তত্ত্বকথা আর বিধি-নিষেধও তার মুখের। রাজেকের মত অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠতো। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোন ক্ষতি হত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু'চারজন আরো ছিল রাজেকের—সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মত হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মত।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মত মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে,—কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় ক'রে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পসরায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমৎ মেহনৎ। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়িতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু'বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজুখাতুনের ঝাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি ?'

ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা ?'

'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি ? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাপটা একবার খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজুখাতুন উঠে ঝাপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনরে। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেফ মিষ্টি ক'রে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজ্‌খাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজ্‌খাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন ক'রে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ তামাসা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজ্‌বিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায়?'

ইসারা ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট ক'রে খুলে বলল মনের কথা। কোনরকম অন্যায় সুবিধা সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা ক'রে নিয়ে যেতে চায় মাজ্‌খাতুনকে। ঘর গেরস্থালির ষোল আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজ্‌খাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাসার আর মানুষ পাইলা না তুমি। ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে।'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজ্‌বিবি। কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজ্‌খাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি! আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকার মত মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলি মাজ্‌খাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়িতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হাল্কা ঠাট্টা তামাসা চলত, কিন্তু তার বেশি এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজ্‌খাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাটখোট্টা ধরনেরই ছিল রাজেকের। ভারি কড়া-কড়া চাঁছা-ছোলা তার কথাবার্তা। শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজ্‌খাতুনের উঠানে আর মাজ্‌খাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালিগুড়। হাতের গুণ ছিল মাজ্‌খাতুনের। তার তৈরি গুড়ের সের দু'পয়সা বেশি

দরে বিক্রী হতো বাজারে। রাজেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশির ভাগ খেজুর গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু'এক হাঁড়ি রস কোনবার ভদ্রতা ক'রে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মত হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাস-খানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু'আনা করে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজুখাতুন গুড় চুরি করে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রী করাচ্ছে সেই গুড়, ষোল আনা জিনিস পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজুখাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধ-বুড়োদের দলের আরো করেছে দু'একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ান যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খুবসুরৎ মুখও কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরো আসতে হল দু'এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোলাকী শাড়ি পরে, রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজুখাতুন।

ঘরদোরের কোন শ্রী ছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার আর অগোছাল হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপেপুঁছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরণীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছে-গাছে। পাড়ায় আরো অনেকের—বোসেদের, বাঁড়ুয্যেদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ করে দিচ্ছে রস। পাঁকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজুখাতুনকে মোতালেফ উঠানের পশ্চিমদিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জ্বালা বসিয়ে সেই চালাঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জ্বাল দেয় মাজুখাতুন। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়। মাজুখাতুন এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেকদিন পরে মনের মত কাজ পেয়েছে মাজুখাতুন, মনের মত মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া

দামে ! বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের একেকটি করে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারাদিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমা থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ' আনা সের। দু'বেলা দু'বার করে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নিচে দুর্বার মধ্যে চিক চিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়াপড়শীরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ কিন্তু বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিন-রাত এমন কলের মত পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায় নি কোনদিন। ব্যাপারটা কি ? গাছ কাটা অবশ্য মনের মত কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে ?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু' হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের ?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা করকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায় নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগে নি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মেঞা ? তুমি তো শোনলাম নেকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত।'

মোতালেফ মুচকি হাসল। বলল, 'তার জৈন্যে ভাবেন ক্যান্ মেঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ করে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিস আছে মিঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল

থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকী ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা ? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি !'

মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি করে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি করে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি করে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা, কিন্তু গায়ে যে আর এক-জনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়াবা কেমনে।'

মনে এলেও মুখফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে মানুষ চ'লে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তা'হলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতর গুনা ঘইসা ঘইসা বদ্ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি ?'

মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না ত কি মিছা ? শুইঙ্গা দেইখো তখন নতুন মাইনযের নতুন গন্ধে ভুর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে, ফুলের গন্ধে ভুর ভুর করবে, কেবল সবুর কইরা থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুয ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু'মাসের বেশি সবুর করতে হল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভারি আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ; ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে ? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর দূর!'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের ; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপর

সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফ্লবানুর, 'থ্ইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন ঘরগেরস্থলি। কাছে বস আইসা।'

ফ্লবানু হাসে, 'সবুর সবুর! এ কয়মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফ্লবানুর, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু গাছির কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফ্রায় ফ্লজান কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ ক'রে ছেড়েছে। পাড়াপড়শীরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফ্লবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'নাঃ বউ বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ী-টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন আত্তি করবে না। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, এক-পঞ্চাশ।'

মাজুখাতুন খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজ্খাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজ্র গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান্! ওসব কাম কোন কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান্ বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজুখাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহ'লে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেরি করতে চায় না।'

মাজুখাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজুখাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মত ফাঁৎ ফাঁৎ নিঃশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত, তার হাতগুনা তো বাঁচলাম, কি কও ফুলজান?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।

'ক্যান্, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ডর নাই? পাখা মেইলা কখন্ উরাল দেয় তার ঠিক কি!'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উরাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই সব পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইন্ষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, চোখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার ক'রে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান্, তুমি তো বেশি ভক্ত না পানের। দিন রাইত খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্যে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে, পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর একজনের পানখাওয়া-ঠোঁটের রস লাগে।

নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মত নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিঘেচারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে। কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাঁকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ-দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে তাহ'লে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে, অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউস ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পার না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলাবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়িতে।'

যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল সে সব জায়গায় সযত্নে চুন লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় করে পৈঁকায় করে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় করে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে, 'ভারি কষ্ট হয় বউ, না?'

ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না। কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি?'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। এ কাজে নাম ডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে

সে-ই সেরা। এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ ঝেড়ে গেল।

গাছ কাটাবার ধূম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মত দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙে আসে চোখ। দু'হাতে ঠেলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোন অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবানুকে বলে, 'রস জ্বাল দেও,---যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর, বুক কাঁপে। দু'এক হাঁড়ি রস জাল দিয়েছে সে বাপের বাড়িতে, কিন্তু এত রস একসঙ্গে সে কোনদিন দেখেনি, কোনকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি, আমি তো আছিই কাছে কাছে— আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন করে টগবগ করে না জালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখ-মুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমত। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইরা কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই গুড় হইছে, এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে, 'কেনবে না ক্যান। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খুবসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু'চারদিনের মধ্যেই কোনরকমে চলনসই গুড় তৈরি করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মত, খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।

পুরনো খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মিঞা? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেল বছরের মত সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, খেয়ে খুশি হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বার কয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোঁটা দেইখো নামাবার সময় হইল কিনা, ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে, 'হ হ, চিনছি। আর বক বক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইনষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজুখাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজুখাতুন এমন করে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় করে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাঁকাটির চালার দোরের কাছে, 'কি রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এল না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড়? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণকোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি করে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতর থেকে। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া করে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চীৎকার বেরুল,—'কই, কোথায় গেলি হারামজাদী?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দু'দিন ধরে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড় চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি

একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চীৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। একমুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুটি করে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজ-গোজ লইয়া, পটের ভিতর গুণা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এই জৈন্যই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে!'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসসুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বা'জান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইনষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদল-বদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি! দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপোষ করল মোতালেফ। সেধেভেজে মান ভাঙাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোন রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল, 'কষ্ট আবার কি।'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। বলেও জানে, শোনেও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ি এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ করে বসে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে

চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।

'সেলাম মেঞাসাব।'

'আলেকম আসলাম।'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো সব, ছাওয়ালপান ভালো তো—?'

মাজুখাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারল না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোন রকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত করে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস করে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারী! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্যে কি? দুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে।'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যাখন আইজ খাইয়া দ্যাখেন, দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুণপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারত-পক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজী হয় নাদির, আর বাকি দু'সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর করে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজুখাতুন নিষেধ করে দিয়েছে নাদিরকে, 'খবরদার, ওই মাইনষের সাথে যদি ফের খাতির নাতির কর, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজুখাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজে-কর্মে সরেস, কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দু'টি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু'হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপ্টানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে ; 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা ?'

হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে ; 'কেডা ? ও, আপনে ? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান্ মেঞাসাব ?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে ? কোন মুখে উঠল আইসা এখানে ?'

নাদির ফিস ফিস করে বলে, 'আস্তে আস্তে—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শোনতে পাবে। মাইনষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইনষে।'

মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ কর, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে, একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি নাজসরম নাই ?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজুখাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দামন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে ; মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দু'টি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু ?'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন। ধরেন, তামাক খান।'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই ক'ন না, দোষ কি তাতে।

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। ক'ন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্যে আনে নাই রস, সেইটুকু বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজুখাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্যে আনছে ?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মিঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর একছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।' গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর-দুটি চোখ ছল্ ছল্ করে উঠেছে। চুপ করে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হল না।

হঠাৎ যেন হুঁস হল নাদির শেখের, বলল, 'ও কি মিঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না ? আগুনিন নিবা গেল কইলকার ?'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'

আবর্ত

সমরেশ বসু

নাই নাই আর নাই।

ক্লান্ত বাদশা' হুঁকোটি হাতে নিয়ে তিনটি কথা জিজ্ঞেস করেছে, আর তিনটি জবাব দিয়েছে জোবেদা—নাই।

চার ক্রোশ পথ হেঁটে এসে, হাত-পা না ধুয়ে শুষ্ক কণ্ঠনালীটিকে একটু ভিজিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়েছে—তাই একেবারে সোজা পায়ের ধুলোমাটি নিয়ে দাওয়ায় উঠে এসে হুঁকো নিয়ে বসেছে সে। তামাকের ডিবা হাত্‌ড়ে তামাক না পেয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'তামুক নাই ?'

অপরাধীর মত জবাব দিয়েছে জোবেদা—নাই।

—পাতা আছে ?

—নাই।

—রাব ?

—নাই।

নাই! ক্লান্ত মস্তিষ্কটায় এই নাই বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে যেন চৌচির হয়ে গেল। দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠল যেন সারাটা গায়ে। ঠাস্‌ করে হুঁকোটাকে দাওয়ায় আছড়ে ভেঙে ফেলল সে। খোলের পীতাভ জল গড়িয়ে পড়ল দাওয়া থেকে উঠানে।

—নাই! ভীষণ ক্রোধে নিজেকে সে নিজেই যেন শাসিয়ে গর্জে উঠল। ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে শিকা'র উপর থেকে হাঁড়ি কলসী যা পেল—ক্ষ্যাপা পাগলের মতো ভেঙে দিল তছনছ করে। ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে নিজের গালে মুখে ঘুষিয়ে চড়িয়ে হঠাৎ

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঘুরে ক্যাঁৎ করে একটা লাথি কষিয়ে দিল জোবেদার পাঁজরে। কি দ্যাখস্ তুই হারামজাদি? চাইয়া চাইয়া দ্যাখস্ কি? বাইর হ, বাইর হইয়া যা আমার সামনের থেইক্যা!

এমনিতেই বাদশা'র উগ্র মতিগতি দেখে জোবেদা আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছিল। তারপর হঠাৎ লাথিটা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল চৌকাঠের উপর।

এমন সময় বাদশা'র ছেলে মঙ্গল খেলে ফিরে বাড়ীতে ঢুকে ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মনে হলো বাদশা' বুঝি তার উপরও ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তা না করে সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। দেখতে পেয়ে জোবেদা নতুন আতঙ্কে আবার ডুকরে উঠল—ও মঙ্গল, দ্যাখ মানু'ডা যায় কুনঠাঁই। নিজের পরানডারে না শেষ করে।

না প্রাণ দেওয়ার কথা মনে আসেনি বাদশা'র। সে জনশূন্য পীরের দরগার পিছনে প্রকাণ্ড হিজল গাছটার প্রশস্ত শিকড়টার উপর গিয়ে ভেঙে পড়ল। হায় খোদা!

তামাক বা তামাকের পাতা নেই, শুধু এই কারণেই বাদশা' আজ এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেনি। তার আজ কিছু নেই, রিক্ত করে দিয়েছে একেবারে—সমস্ত বুকটাকে খালি করে দিয়েছে।

গাঙের ধারে বিঘা চারেক যে ঢালু জমিটুকু তার সারা বুক জুড়ে যুগিয়ে রেখেছিল এত আশা উৎসাহ, সেটুকু আকণ্ঠ দেনার দায়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি ওই জমিতে বাদশা' চাষ করতে পারবে। ঢালু জমির উপর লাঙ্গল নিয়ে ওঠানামা করা সে বড় চারটিখানি কথা নয়, আর বলদ সে বলদই, মেশিন নয় যে লেজ মোচড়ালেই সে ঢালু জমির বুক চিরে লাঙ্গল নিয়ে ওঠানামা করবে।

তবে হ', বাদশা হলো খাটিয়ে জোয়ান মরদ। চার সাল আগে বিষম জ্বর থেকে আরোগ্যলাভের পর--সাক্ষাৎ হজরৎ-পীর খালিকুজ্জমানের স্বপ্নে-পাওয়া মাদুলি আজও আছে তার চওড়া গর্দানটায় বাঁধা—সেই যে এসেছিল স্বাস্থ্যের জোয়ার, আজও সেই জোয়ারে ভাটা পড়েনি। মাদুলিধোয়া জল খেয়ে একটা প্রচণ্ড গোঁ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই পাহাড়ের মতো ঢালু জমির বুকে। এই উপেক্ষিত ঢালু ঘাসবনের বুকে সে ফুটিয়ে তুলবে বেহেস্তের সৌন্দর্য, সমতল ভূমির সমস্ত গরিমাকে আত্মসাৎ করবে সবুজ সমুদ্রের ঢেউ তুলে।

তুলেছিল, সবুজ সমুদ্রের ঢেউ উঠেছিল সেই ঢালু জমির বুকে। সমতলভূমির আয়েসী অহঙ্কারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল সে।

কিন্তু তখন তার বড় ভাই সোলেমান হতাশায় ভয়ে চলে গিয়েছিল—শহরে। কারখানায় কাজ করতে। সে ভয় পেয়েছিল, অনাহার দুর্দশার, ঢালু আগাছাভরা জমি আশার বদলে দুরাশাই এনে দিয়েছিল বেশী। নিজের বিবিকেসুদ্ধ সে নিয়ে গিয়েছিল, বাদশা'র ভাবীসাহেবাকে।

বাদশা' যায়নি। সে হলো চাষী, যাকে বলে খাঁটি চাষী। স্বাধীন গ্রামীণ আভিজাত্য

ছিল তার মনে। গোলামিকে সে ঘৃণা করে। কারখানায় কাজ করতে যাওয়াকে সে মনে করে অপমান। ভীরু সোলেমান তাই যে জমি দেখে ভয় পেয়েছিল, হতাশায়, চলে গিয়েছিল কারখানায় কাজ করতে, বাদশা' সেই জমিতেই রক্তের বিনিময়ে ফলিয়েছিল সোনা।

বাদশা'র পীড়াপীড়িতে সোলেমান একবার এসেছিল ছোট ভাইয়ের কেরামতি হিম্মৎ দেখতে। হাঁ, তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল তাকে বাদশা'। বাদশা'র প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধায়, সম্মানে—নিজেকে তার বড় দুর্বল, লজ্জিত মনে হয়েছিল, সে-ই যেন বাদশা'র ছোট ভাই।

কিন্তু সোলেমানও খুব দুঃখে ছিল না। টাকার মুখ তো দেখেছে সে, খাওয়া পরারও অভাব ছিল না খুব। বাদশা' অবশ্য একটু বিস্মিত হয়েছিল ভাইসাহেবের ভদ্রলোকি পোশাক আর মেজাজ দেখে। তবে তার মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল না, ছিল একটা চাষাড়ে বিস্ময়। সেই বিস্ময়টুকুও শেষ পর্যন্ত বক্র হাসির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল। গোলামির আভিজাত্য!

কিন্তু ইতিমধ্যে দেনার ছোট গর্তটা সুদে আসলে ভিতরে ভিতরে কত দিকে যে ছড়িয়ে পড়েছিল এটা সে টের পায়নি। টের পেল আজ সকালে যখন জোতদার মামুদ মিয়া তাকে ডেকে বলল, ওই ঢালু জমিটাও তার খাসে চলে গেল। নতুন উৎসাহে নতুন বলদ কিনেছিল তখন বাদশা' দেনা করে। বীজ ধান নিয়েছে কয়েকটা সাল। সব মিলে সুদে আসলে যা' দাঁড়িয়েছে, বাদশা'কে বুঝি ভিটেটুকু পর্যন্ত বাঁধা দিতে হবে শেষে।

সকালবেলা একথা শুনে সে গিয়েছিল জোতদার মহিন্ ঠাকুরের কাছে। ভাগে চাষ করবে সে মহিন্‌ঠাকুরের জমিতে। মামুদের জমিতেও সে ভাগে কাজ করতে পারত, কিন্তু মামুদের প্রতি একটা নিরুদ্ধ ক্রোধে সে তার কাছে যায়নি। মামুদ তাকে একটু খাতির অবধি করেনি। স্পষ্টভাবে সোজা জানিয়ে দিয়েছে, 'ওই জমিটাতে আর নাঙ্গল ঢুকাইও না বাদশা। তোমার কর্জর বহর বড় বেশী। বলদ দুইটা লইয়া আইস, কিস্তি শোধের টাকাটা লেইখ্যা লইমু। টিপসই দিয়া যাইও। আর এই বছরডা গেলে তোমার বাপের ভিডাও আমার খাসে আইব!'

একটু চুপ করে থেকে পরমুহূর্তেই পরম গাম্ভীর্যে সে বলেছে, 'আমার ক্ষেত-মজুররা থাকবো হেই ভিডায়। ইচ্ছা করলে তুমিও থাকতে পার, বিবি ছাওয়াল লইয়া একলাই থাকতে পার। বাপের ভিডা আর ছাড়তে হয় না।'

অর্থাৎ মামুদের ক্ষেত-মজুর হবে বাদশা'।

'ভাইবা দেহি'—এই বলে সোজা সে চলে গিয়েছিল হাটে মহিন্‌ঠাকুরের কাছে। কিন্তু সেখানকার একটা বিরাট রহস্য—ভাগে দিলে না জমি মহিন্ ঠাকুর। কারণ কিছু বললে না, শুধু উপদেশ দিয়ে দিলে বাদশা'কে মামুদের কাছে যাও, সে জমি ভাগে দিবে। তোমাদের জাতের লোক, বড় মানুষ, তার কাছে যাও।

সেই থেকে তার শূন্য বুকটা হাহাকার করছে—নাই, নাই, কিছু নাই। আর সেই নাই-এর প্রতিধ্বনিটা যখন এল জোবেদার কাছ থেকে, তখন তার বোবা লক্ষ্যহীন আক্রোশটা ফেটে পড়ল এমন ভয়ঙ্করভাবে।

বাদশা' মুখ তুলল, দৃষ্টিটা তুলে ধরল দিগন্তবিসারী তেপান্তরে।

নিস্তব্ধ গোধূলি। পথে প্রান্তরে মানুষের সাড়া প্রায় নেই বললেই চলে। আমনের কাজ শুরু করবার সময় হয়েছে বটে, কিন্তু কাজ আরম্ভ হয়নি এখনো, তাই তেপান্তর জুড়ে মানুষ চোখে পড়ে না একটাও। সারা মাঠই প্রায় মামুদের খাস। সে হুকুম না দিলে, বীজধান না দিলে কাজ শুরু হবে না। সেই অপেক্ষাতেই আছে সবাই।

তেপান্তর জুড়ে চোখে পড়ে শুধু রিক্ত মাঠ। খোঁচা খোঁচা আউশ ফসলের অবশিষ্টাংশ ছুঁচের মতো আকাশমুখী হয়ে আছে। থাপছাড়াভাবে এখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে আগাছা। জলো ঘাস আর কাশবনের ঘন আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ছে তেপান্তরের বুক জুড়ে।

গুচ্ছ গুচ্ছ দীর্ঘ সাদা কাশফুল ফুটেছে, মাথা হেলিয়ে দুলছে হাওয়ায়। বাদশা'র মনে হয়, সন্ধ্যার ধূসর আলোয় জোবেদার মতো শত শত মেয়ে, এই গাঁয়ের মেয়েরা সাদা বোরখা পরে—রিক্ত মাঠ জুড়ে মাথা নেড়ে চলেছে—নাই নাই নাই! মনে হয় নমশূদ্রদের ঝিউড়ি-বউড়িরা মাথায় ঘোমটা টেনে তেপান্তর জুড়ে সারি সারি মাথা দুলিয়ে চলেছে—নাই নাই নাই। কাশ আর জলো ঘাসবনের এই বিস্তৃত সমারোহ কি মামুদের চোখে পড়ে না!

হঠাৎ চমকে উঠল বাদশা, সামনের উই পোকার বিরাট ঢিবিটার পিছনে মানুষের একটা মাথা দেখে। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। কেমন ছম্ ছম্ করে উঠল বাদশা'র গা'টা।—কেডা ওইখানে? উঠে দাঁড়াল সে।

ঢিবিটার পিছন থেকে উঁকি মারে মঙ্গলের ভীত অপরাধী মুখটা।

—কেডা, মঙ্গল নি?

—হ।

ছাওয়ালটার ভীত সন্ত্রস্ত কচি মুখখানি দেখে অবোধ-বেদনায় টনটনিয়ে ওঠে বাদশা'র বুকটা। আফসোসে মনটা পুড়তে থাকে। কিছুক্ষণ আগের চণ্ডালিপনার কথা মনে হতেই তার অন্তরাত্মা যেন ফুঁপিয়ে উঠতে চাইল। তার ছাওয়ালের মা-মাগীটার পাঁজরটাকে ভেঙে দিয়েছে। বুকটা ভেঙে গেছে ছাওয়ালটার। বাপজান নয়, যেন বাঘা কুত্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভীরু শেয়ালের বাচ্চা। হায় বাদশা'র কিসমৎ, হায় বিবি-ছাওয়ালের তক্‌দির্!

—কাছে আয় মঙ্গল!—গলা শুনে মনে হয় সত্যিই বুঝি ফুঁপিয়ে উঠবে সে।

মঙ্গল শঙ্কিত মুরগীর বাচ্চার মতো পা ফেলে কাছে আসে। একটু হেসে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে বাদশা' বুকের কাছে তাকে টেনে নিয়ে বলে: এমুন বাহাইরা গামাড়া তরে কে দিছে রে মঙ্গল?

বাপজানের এ স্মৃতিহীনতা আর হাসি দেখে একটু সাহস পায় মঙ্গল।—বলে তোমার মনে নাই, বড় চাচী গেল ঈদে পাঠাইয়া দিছিল আমারে ?

মনে পড়ে বাদশা'র, সোলেমানের বিবি—তার ভাবীসাহেবার কথা। শহরে গিয়ে সরমের মাথা খেয়েছে সে। বোরখার বালাই প্রায় ত্যাগ করেছে সোলেমানের বিবি। চাষী বউয়ের মতো আর ঘোমটা টেনে কথা বলে না। দ্বিধাবোধ করে না একটা পর-পুরুষের কথায় জবাব দিতে। বড় বেহায়া তার ভাবীসাহেবা, খানদানের মাথা সে নীচু করে দিয়েছে। কথা বলে হেসে-দুলে—হড়বড় করে। কেমন একটা অপরিচয়ের গণ্ডী যেন খাড়া হয়ে ওঠে বাদশা'র চোখে। অচেনা মনে হয় ভাবীসাহেবাকে—তার চলন-বলনকে। মনে পড়ে কাজীর পাঁচালি ঃ 'দাঁত দ্যাখাইয়া হাসে নারী দুপদুপাইয়া চলে'—।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জোবেদার কথা। সরমে ভরপুর। বাদশা'র উঠানের রোদ-টুকু ছাড়া যার গায়ে আর রোদ লাগে না, ছ্যাঁচা বেড়ার সঙ্কীর্ণ ফুটো দিয়ে যে পর্য-বেক্ষণ করে বাইরের বিরাট পৃথিবীকে।

তবে বেহায়া হলেও ভাবীসাহেবা বড়ই স্নেহশীলা। ভালবাসে সে সবাইকে। দিলটা বেশ খোলসা। বাদশা আর জোবেদাকে সে দেখে ভাই-বহিনের মতো। হিংসা নেই মানুষটার। মঙ্গলের তো কথাই নেই। আবাগীর ছাওয়াল নেই, মঙ্গলকেই সে নিজের ছাওয়ালের মতো দেখে। যখনকার যা, খাবার থেকে শুরু করে—জামা টুপি, মায় জুতোটি পর্যন্ত, মঙ্গলের জন্য বারোমাস পাঠাবে। মঙ্গলের ব্যামো হলে উপোস দিয়ে পড়ে থাকে সে সেখানে। সোলেমান তখন ঘন ঘন চিঠি লেখে—তোমার ভাবীসাহেবা ভাত পানি ত্যাজিয়াছে।—

এই মুহূর্তে খুব খারাপ মনে হয় না ভাইসাহেবের জীবনটা বাদশা'র কাছে। তার মতো এমন এক মুহূর্তে রিক্ত হয়ে যাবার ভয় নেই সোলেমানের। মনে পড়ে সেই মোটা আর আসমান ছোঁয়া চিমনিটা—মুখ থেকে যার অনর্গল ধোঁয়া বেরোয়—কালো জমাট ধোঁয়া। তার নীচে সেই বিরাট ঘরটায় কাজ করে তার ভাইসাহেব। হপ্তায় হপ্তায় টাকা নিয়ে আসে—নিয়ে এসে দেয় ভাবীসাহেবার হাতে। অভাব নেই ছোট্ট সংসারটায়। আসে খায়, খায় আসে।

তার চিন্তায় বাধা দিয়ে ডাকল মঙ্গল—আম্মা বড় কান্‌তে লইছে, বাড়ীতে চলো বাপজান্।

—হ, চল্! একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে বাদশা'র। চলতে চলতে হঠাৎ বলে সে—তর্ বড় চাচীর কাছে যাবি রে মঙ্গল ?

মঙ্গল বিস্মিত হয়। নানান ঘটনা ও কথার মধ্য দিয়ে সেও জানত, বড় চাচা-চাচীর উপর বাপজানের বড় গোসা। তাই উল্লসিত জবাব একটা থাকলেও হঠাৎ কিছু বলতে পারল না সে, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাপজানের চিন্তান্বিত মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল।

নিস্তব্ধ বাড়ীটার বেড়া ঠেলে ঢুকে দাওয়ায় উঠে বসল বাদশা। মঙ্গল ভিতরে গেল তার আম্মার কাছে। ফেলাছড়া জিনিসগুলো চোখে পড়ে না একটাও। যেমন লেপা-

পোঁছা তেমনি। অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে অন্ধকার দাওয়ায় একলা চুপ করে বসেই থাকে সে।

একটু পরে মঙ্গল এসে একটা আস্ত হুঁকো বাড়িয়ে ধরে বাপজানের সামনে। হুঁকোর ডগায় টাটকা তামাক ভরা ধূমায়িত কলকে। ঘরের দরজার আড়ালে কাঁচের চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ আসে তার কানে।

ব্যথিত লজ্জিত বাদশা' হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিল। অন্যমনস্কের মতো দু'-একটা টান দিয়ে, একটু কেশে ডাকল—মঙ্গলের মা আছ নি?

শান্ত জবাব আসে দরজার আড়াল থেকে—জী।

—এটু এদিকে আইও।

জোবেদা এসে দাঁড়াল অন্ধকার দাওয়ার একপাশে একটু দূরে। মুখ দেখা যায় না। শুধু তার হাতের কাচের রঙবেরঙের চুড়িগুলো সামান্য জ্বলজ্বল করে। সেদিকে না চেয়ে বাদশা বলে—গাঙ কিনারের জমিডা, তা মামুদ ছাইড়ল না।

জীবনে এই প্রথম বাদশা' বিবির কাছে সাংসারিক আলোচনা করতে বসল। দুনিয়ার সমস্ত ভাবনা মরদের; মাগীরা রাঁধবে, মরদের পরিচর্যা করবে, এটাই সে চিরকাল ভেবে এসেছে। বললে—উপায় না দেইখা গেছিলাম মহিনঠাকুরের কাছে। কিন্তুক ভাগে দিব না হেই জমি।

জোবেদা স্তব্ধ নিরুত্তর। দু'একটা জোনাকি জ্বলে উঠছে বাইরে অন্ধকারের বুকে।

—এই ভিডাও আর বেশীদিন নাই, বোঝলানি মঙ্গনের মা? মুখ তুলে তাকাল সে জোবেদার ঝাপসা মুখের দিকে।

তারপর খানিকক্ষণ ঘন ঘন হুঁকোয় টান দেওয়ার পর হঠাৎ সে বলে—সরম কম বটে, তবু ভাবীসাহেবা আমাগোরে খুবই পেয়ার করে। কোনো পরব বাদ যায় না; তোমার লেইগা শাড়ী, মঙ্গনের জামা—কত কি দেয়। মঙ্গন তো তার নিজের ছাওয়ালের লাহান—না?

জোবেদার কাছ থেকে অস্ফুট শব্দ আসে—হাঁ।

—ভাইসাহেবও তাই। মানু'ডা খুব ভাল। পোড়া পেটের লেইগা মানু'তে কিনা করে, ভাইসাহেব তো কারখানার কাম করে। খাইটা খায়। তা ছাড়া, সুখেই আছে তারা অষ্ট পহর অভাব নাই।...

একটু চুপ করে থেকে হুঁকোটা রেখে হঠাৎ বেশ জোর দিয়েই বলে সে—আমিও ভাইসাহেবের কাছে যামু, কাম করুম কারখানায়, হ! গুমোট ধোঁয়ায় যেন আটকে এল তার গলা।

—না না। এতক্ষণে প্রায় চাপা আর্তনাদ করে উঠল জোবেদা। —আপনে পারবেন না কারখানার কাম করতে।

—পারুম। বাধা দিয়ে বলে ওঠে বাদশা'।

মানুষটা আজ একি কথা বলছে! জোবেদা তবু বলে—হেই ড্যাকরাডার (মামুদের) কাছেই যান। তার কাছে—

—না। আবার রুক্ষ হয়ে ওঠে বাদশা'র স্বর। দুঃখু নাই, চিন্তা নাই, আনে খায়, আমিও ভাইসাহেবের মতো রোজগার করুম। ঝঞ্ঝাটের কাম কি? বাপ-মায়ের মতো ভাই-ভাবীসাহেবা, তাগো কাছেই যামু। ইজ্জৎ বাঁচব, বোঝলা, তোমারও ইজ্জৎ বাঁচব। মঈনডা দুইডা ভাল-মন্দ খাইতে পাইব।'

নির্বাপিত হু'কোটা তুলে নিল সে আবার। পাতালপুরী থেকে যেন অন্ধকার পৃথিবীর বুকে ছাড়িয়ে পড়ে বাদশা'র গলা—'তুমি বোঝ না মঈনের মা, ক্ষেত-মজুর আর কাঙ্গালীতে তফাৎটা কি? হেযে মামুদের ক্ষেত-মজুর, বিলাই কুত্তার লাহান, জোত-দারের পায়ের তলায় পইড়া বারমাস রোজা পালুম। ভিডা নাই, জমি নাই, বিলাই কুত্তা না তো কি? না না না, তার থেইকা ভাইসাহেবের মতো রোজগার ভাল!'

হু'কো রেখে জোবেদার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। 'আজই রাইত বিহানে বাইর হমু। জাহাজ ছাড়তে হেই বেলা একডা, শেষ রাইতে বাইব হইলে বেলা বারোটা লাগাৎ ঘাটে পোঁছামু বোঝলা?'

জোবেদার গলা দিয়ে কথা ফোটে না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল সে।

বাদশা' নেমে গোয়ালের দরজাটা খোলে। 'কই রে সোরাব-রুস্তম!' বলদ দুটোর নাম রেখেছিল সে সোরাব আর রুস্তম। তেজী বলদ, ঢালু জমির বুক চষেছিল ওরা! জমিদারবাড়ীর জোয়ান ঘোড়ার মতো প্রকাণ্ড বলদ, ওপারের হাট থেকে কিনে নিয়ে এসেছিল পছন্দ করে। লড়ায়ে চেহারা দেখে সে ওই নাম রেখেছিল। মঈনের ইতিহাস বইয়ে সেই দুই বীরের নাম শুনেছিল সে, বাপ-ব্যাটার বীরত্বের কাহিনী। সেই মরদ দুটোর নামের পিছনে যে রোমান্স ছিল, সেই রোমান্স তার জেগে উঠেছিল এই তেজী বলদ দুটোকে দেখে!

সোরাব-রুস্তম বেরিয়ে এল।

—চল্‌রে। দিয়া আহি ত'গো কসাইডার কাছে, ত'গো নসিব বান্ধা তার হাতে!

জোবেদা লম্ফটা নিয়ে এসে দাঁড়াল। নির্বোধ বলদ দুটো চারটে ডাগর চোখ তুলে ধরল মানবের দিকে। ভাবল বোধ হয়, রাত্রে অন্ধকারে গোয়ালের বাইরে—জীবনে তাদের এ ব্যাতিক্রম কেন?

—দিয়া আহি মঈনের মা। চল্‌রে। অন্ধকারে বলদ দুটোকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বাদশা'।

সারা রাত ধরে এটা সেটা নানান টুকিটাকি জিনিসে বোঁচকা ভর্তি করেছে জোবেদা। সমস্ত বেঁধেছেঁদে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে সে। হঠাৎ লাথির আঘাত খাওয়া পাঁজরটায় মৃদু স্পর্শে চমকে জেগে উঠল সে।—'কেডা?'

—আমি, বাদশা'র নরম গলা কেঁপে উঠল একটু—সময় হইল মঈনের মা। উঠ, বাইর হইতে হইব।

মঈনের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিল সে।—ওঠ্‌রে মঈন, ওঠ ওঠ।

গোটা তিনেক বোঁচকা, একটা মাদুর আর একটা হ্যারিকেন। বাদশা'র সংসার!

বাদশা' বলে—বোরখাটা অখন থাউক। রাইত পোহাইলে রাস্তায় পইরা লইও। বলে সে একটা বোঁচকা মাথায় আর একটা হাতে নেয়। বগলে নেয় মাদুরটা। আর একটা বোঁচকা ওঠে জোবেদার কাঁখে। হ্যারিকেনটা নেয় মঈন।

দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই জোবেদার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল চোখ ছাপানো জলে।

বাদশা'র ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল উঠানে দাঁড়িয়ে। মনে মনে বলল সে, 'আবার আইমু। কারখানার খাটুনির পয়সা দিয়া আবার ভিডা ছাড়ামু, জমি ছাড়ামু, আমার গাঙ কিনারের জমিডা।'

বাইরে তখনো অন্ধকার। আসন্ন শরৎকালের মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আকাশে শুকতারাটা জ্বলছে দপ্‌ দপ্‌ করে। তিনটি মানুষের ছোট একটি দল ছায়ার মতো এগিয়ে চলল—বর্ষার জলে ডোবা সাঁপিল পথের উপর দিয়ে। গাঙের কিনার দিয়ে নরম ঢালু জমির বুকে পায়ের গভীর ছাপ রেখে ছায়া তিনটি এগিয়ে চলল জাহাজঘাটের দিকে। আগে বাদশা', তারপর মঈন, পিছনে জোবেদা।

—একটুকু পা চালাইয়া আইও গো মঈনের মা। জাহাজ না ফেল হয়। অর্থাৎ, আঁধার শেষ হওয়ার আগেই পরিচিত তল্লাট ছাড়িয়ে যেতে চায় বাদশা'।

বেলা বারোটার আগেই তারা পৌঁছয় জাহাজঘাটে। ইতিমধ্যে পথে জোবেদার গায়ে বোরখা উঠেছে। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছে সে। টিকিট ঘরের একটু দূরে নিরালা জায়গায় বোঁচকা নামিয়ে বসে তারা। বাদশা' টিকিট আর জাহাজের খবর নিতে যায়।

একটা পুরনো মালসা আর চিঁড়ে বের করল জোবেদা বোঁচকা খুলে। মঈনের ক্ষিদে পেয়েছে, ওই মানুষটারই কি আর কম ক্ষিদেটা পেয়েছে! মালসায় চিঁড়ে ঢালতে ঢালতে মুখের ঢাকনাটা খুলে সে বাদশা'র দিকে দেখে। পা টেনে টেনে চলেছে বাদশা'।

—মঈন, ঘটিতে কইরা খানিক পানি লইয়া আয় তো বাপ্‌। মঈনের দিকে একটা ঘটি বাড়িয়ে দিল জোবেদা।

খানিকক্ষণ বাদে বাদশা' ফিরে এল। হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল—'আর বেশী দেরি নাই মঈনের মা, ঘন্টাখানিকের মধ্যেই নাকি জাহাজ ভিড়ব।'

মঈন জল নিয়ে আসতে সবাই শুকনো চিঁড়ে আর গুড় নিয়ে বসে খেতে। জোবেদা বাদশা'কে আড়াল করে নদীর দিকে মুখ করে বসে।

নদীতে অসংখ্য জেলেদের নৌকা ঘুরছে। কোনোটার পাল গুটনো, কোনোটার

তোলা। ইলিশ মাছের মরশুম এটা। তাই নৌকাগুলি জাহাজঘাট আর ওপারের কালো একটা রেখার মতো ধূ ধূ করা বহুবিস্তৃত চালার দিকে যাতায়াত করছে।

জলো হাওয়া এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় বালুমাটির উপর দিয়ে। সেই হাওয়ার গায়ে পাখা ঝাপটা দেয় ওই নৌকাগুলোর মতো অসংখ্য গাঙচিল।

জোবেদার বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে উথালি-পাথালি করে ওঠে ওই গাঙের বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলোর মতো। মনটা এলোমেলো হয়ে যায়, এলোমেলো হাওয়ায়। চোয়াল দুটো আনমনে নাড়তে নাড়তে এক সময় হঠাৎ চমকে উঠল সে একটা শব্দ শুনে।

—আইতেছে। বাদশা' উঠে দাঁড়াল। জাহাজ আইতেছে গো মঙ্গনের মা। হু—ই যে, শোনা যায়। লও, লও, সব বাইন্দা-ছাইন্দা লও।

খোলা বোঁচকাটা আবার বাঁধতে আরম্ভ করে জোবেদা। মঙ্গনও কপালে হাত দিয়ে দূরের দিকে তাকায়। 'হ, কি যেন একটা আইছে বড় গাঙের ঢেউ কেটে কেটে।'

এতক্ষণে যাত্রীতে ভরে উঠেছে জাহাজঘাটের বালুময় প্রাঙ্গণ। বাক্স আর বোঁচকায় ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। দু'একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় বাদশা'র। জিজ্ঞেস করে—'কুনঠাঁই গো বাদশা মিয়া!'

—ভাইসাহেবের কাছে। আর বেশী কিছু বলে না সে। দুঃখ ঘুচুক, পয়সাকড়ি হোক, ভিটা জমি খালাস হোক, তারপর সে অনেক কথা বলবে সবাইকে। সুখের সময়ে অতীত দুঃখের কথা বলতে ভাল লাগে।

জাহাজ এসে ভিড়ল। ব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল সবাই।

বাদশা' বোঁচকা তুলে নিল মাথায় আর হাতে। জোবেদাও নিল।

—ও মঙ্গন, তুই একটা হাত ধর আমার, আর তর মায়ের আঁচলটা ধর এক হাতে। ছাড়িস্ না য্যান! আমার লাগাৎ আইও গো মঙ্গনের মা।……

আহঃ! দু'এক পা এগোতে না এগোতেই পেছন থেকে ডাক পড়ে—'অ' বাদশা' মিয়া!'

—কেডা?—না ফিরেই বাদশা' বিলম্বিত কণ্ঠে হাঁকে।

জবাব দেয় মঙ্গন—আমাগো পিয়ন চাচা!

—আইতে ক' তারে।

—আইতেছে।

পিয়ন কাছে এল। জিজ্ঞেস করল—কই চললা?

—শহরে, ভাইজানের কাছে।

—অ! কাইলের ডাক আইতে বড় দেরি হইছে, তাই যাই নাই। আইজ যাইতে ছিলাম তোমাগো ওদিকেই, খানকয়েক চিডি আছে ওদিককার। তোমারও একখান্ চিডি আছে, লইয়া যাও! একটা পোস্টকার্ড বাড়িয়ে ধরে সে বাদশা'র দিকে।

হ! মনটা অস্বস্তিতে ভরে ওঠে বাদশা'র। বলে—অখন আর সময় নাই! একটুক তাড়াতাড়ি পইড়া দেও তো ভাই—কি লেখছে, কেডা লেখছে?

জোবেদা বোরখার আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

পিয়ন বলে, লেখতেছে তোমার ভাইসাহেব সোলেমান, বোঝলানি? লেখছে : —দোয়াবরেষু, বহুৎ বহুৎ দোয়া পর আশা করি খোদার কৃপায় ভালই আছ। খুবই দুঃখের কথাটা জানাইতেছি যে, আমার চাকরীটা নাই। কারখানার চারশত লোক বরখাস্ত কইরাছে। আমিও তাহার মধ্যে আছি। আগামী পরশু তোমার ভাবীসাহেবারে লইয়া বাড়ী রওনা হইতেছি। তোমার বিবি ও মঈন…

স্বপ্নোত্থিতের মতো তিনটি মানুষ যাত্রীর ভিড় চীৎকারের মধ্যে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা বিরাট কালো জাল যেন নেমে এল চোখের উপর। কারখানার সেই ধোঁয়া উদ্‌গিরণকারী কালো চিমনিটা আর গাঙ কিনারের ঢালু জমিটা একাকার হয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দে আর অভিনব দৃশ্যে মাথার মধ্যে ভোঁ। ভোঁ করতে লাগল। চাপা সমুদ্রের গর্জনের মতো যাত্রীর চীৎকার আর সে শব্দে দিশেহারা নির্বাক নিস্পন্দ তিনটি মানুষ।

রানীরঘাটের বৃত্তান্ত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

রানীরঘাট যাচ্ছি শুনে মফস্বলের বাসে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন—রানীরঘাট যাবেন ? দেখবেন মশাই, মহা ত্যাঁদোড় জায়গা। সাবধানে থাকবেন।

—কেন বলুন তো ?

—প্রবাদ শোনেননি 'রানীরঘাটে কে কার বাবা ?'

শুনিনি। তবে আমাদের গাঁয়ের পাশে এক বড় গাঁ, গোকর্ণ। সারা রাঢ় অঞ্চলে তার নামে প্রবাদ ছিল শুনেছি—'গোকর্ণে কে কার মেসো !' সব চালু প্রবাদের পেছনেই একটা গপ্পো থাকে। এক্ষেত্রেও ছিল। তখন নাকি ঠ্যাঙাড়েদের যুগ। আক্রান্ত পথিক অন্ধকারে ঠ্যাঙাড়েকে চিনতে পেরে মেসোমশাই বলে চেঁচিয়ে ওঠে। ঠ্যাঙাড়ে তার গলায় বাঁশ চেপে মুণ্ডু উল্টে দিয়ে বলেছিল—'গোকর্ণে কে কার মেসো !'

নিছক গপ্পো হতে পারে, নাও পারে। হয়তো সে-আমলের মাৎস্যন্যায়কে বোঝাতেও এমন গপ্পোর উদ্ভব। কিন্তু রানীরঘাটের বেলায়ও তো একটা গপ্পো থাকার কথা। কী সেটা ? খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখি, গপ্পোর নায়ক আমার রীতিমতো চেনা।

সেই গপ্পোটাই অবিকল শুনিয়ে দিচ্ছি। এতটুকু রঙ চড়াচ্ছি না। বরং যতটা রঙ ছিল, ঘষে একটু ফিকে করেই দিলুম। ঈষৎ ধূসর দেখাক না ! কিন্তু দার্শনিকতা না, মরাল না, হাতের তালুর মতো স্পষ্ট ব্যাপার। আজকাল জ্ঞান দেবার চেষ্টা করলে লোকে অপমানিত বোধ করে। বিপুলা পৃথ্বী, নিরবধি কালের কতটুকুই বা জানি যে জ্ঞান দেব ?

আরও একটা কথা। নিজেকে গপ্পোর মধ্যে ঢুকিয়ে এক নিরাসক্ত কিংবা ক্রান্তদর্শী চরিত্র করে তোলার লোভও অতিকষ্টে সংবরণ করেছি। যদিও তাই রেওয়াজ।

সে অনেক বছর আগের কথা।...

নদীর ওপারে এক শহর, এপারে এক ঘাট। তার নাম রানীরঘাট। নদীর নাম ভাগীরথী। লোকেরা বলে মা গঙ্গা। মা গঙ্গার কোলে ছোট্ট মেয়ের মতো রানীরঘাট হেসে-খেলে দিন কাটায়। গাঁয়ের মেয়ের চোখে শহরের ঘোরলাগা ভাবটুকুও চোখে না পড়ে পারে না। কিন্তু শুধু ওই আলতো ঘোরটুকুই ছিল তখন, আর কিছু না।

একটা বাসস্ট্যাণ্ড ছিল। কয়েকটা ছোটখাটো দোকান ছিল। রিকশো খান পাঁচেক। এক সময় ঘোড়ার গাড়িও ছিল। সারাদিন বাইরের মানুষের ভিড়ে হইচই বড় বেশি। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতে ভিড় কমে যায়। শেষ বাস ছেড়ে যায় সাড়ে সাতটাতেই। বাঁশবনে শেয়াল ডাকে। তক্ষক ডাকে। পেঁচা ডাকে শিমুল গাছে। নিঃঝুম রাতে ঘাটের ধারে আট- চালায় একটা লণ্ঠন। কাদের চাপা গলায় গপ্পসপ্প। আর মাঝে মাঝে ঘাটের ইজারাদার চৌবেজীর চেরা গলায় হাঁক—শম্ভূয়া—আ—আ! শেষ খেয়া ফিরতে হয়তো দেরি করছে।

সেবার শীতে জেলাবোর্ডের সেন্সাসের বাবুরা এসে আধ ঘণ্টাতেই রানীরঘাটের গণনা শেষ করে ফেলেছিলেন। রোদে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে একজন হঠাৎ তামাশা করে বললেন—আরে, ওই পাগলীটা যে রয়ে গেল! লিখে নাও।

আটচালার ধারে বসে পাগলীটা তখন যাকে দেখছে, চেঁচাচ্ছে—ও বাবারা! ওগো বাবারা! সবাইকে ওর বাবা বলা অভ্যেস। কিন্তু বাবা বলে ডাকছে কেন, কী বলতে চায়, বোঝা যায় না। ভিক্ষে দিলেও তো ছুঁড়ে গায়ে ফেলে দেয়।

পাশের তেলেভাজার দোকান থেকে ময়রাবুড়ী ফিক করে হেসে বলল—তা লিখে নেবেন তো নিন বাবুরা। লিখুন, সুরেশ্বরী। লোকে বলে সুরিক্ষেপী। সেও তো একটা মানুষ বটে। রানীরঘাটে সাত বছর আছে। সবার নাম লিখলেন, ওর কেন লিখবেন না?

প্রথমবাবু বললেন—আর কে আছে ওর?

—আবার কে থাকবে? যে-যা দয়া করে দেয়, খায়। আটচালাতে ঘুমোয়।

দ্বিতীয়বাবু দেখছিলেন সুরিক্ষেপীকে। ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় বললেন—মেয়েটা মনে হচ্ছে প্রেগন্যাণ্ট। স্ট্রেঞ্জ!

প্রথমবাবু হেসে ফেললেন—ভাগ্। তুমি তো ব্যাচেলার। কিসে বুঝলে?

—এসব বুঝতে বিয়ে করা লাগে না। দেখ না, জাস্ট লুক অ্যাট দ্য থিং।

সুরিক্ষেপী ছেঁড়া নোংরা শাড়িটা সামলাতে পারে না। অথচ মাথায় ঘোমটাটি থাকা চাই-ই। প্রথমবাবু দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন—সত্যি তো। মানুষ মাইরি এখনও জানোয়ার।

ময়রাবুড়ী ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভারি গম্ভীর হল। গোমড়ামুখে বলল—মাগঙ্গার চোখের সামনে এই পাপ। সইবে ভেবেছেন? দেখুন না কী হয় পেলয়কাণ্ড! রানীরঘাট ভেসে যাবে। ধুয়েমুছে যাবে। বেঁচে থাকলে দেখে যাব।

দ্বিতীয়বাবু হো হো করে হেসে বললেন—ও বুড়ীমা, কী করে দেখবে? তুমিও তো ভেসে যাবে।

বুড়ী বিকৃত মুখে গরম তেলে বেগ্‌নি ছাড়ল। চড়চড় করে আওয়াজ হতে থাকল। কনুই গড়িয়ে জলের ফোঁটা পড়েছে বুঝি। বাবুর কথার জবাব দিল না। পাপের শাস্তি নিজের হাতে দিচ্ছে যে।

প্রথমবাবু চায়ের ভাঁড় ছুঁড়ে ফেলল আকন্দের ঝোপে। পা বাড়িয়ে আবার রসিকতা করল।—তাহলে লিখতে হলে দুটো নামই লেখ। সুরেশ্বরী না কী বলল যেন, আর তার পেটে যেটা আছে।

—ছেলে হবে, না মেয়ে হবে তার ঠিক নেই। দ্বিতীয়বাবু সিগারেট ধরিয়ে পা বাড়ালেন।

—একটা কমন নাম দেওয়া যাক্।

—মাথায় আসছে না।

—অজস্র আছে, অজস্র। শোন বলছি। উষা, পার্বতী, রেণু, উমা···আঙুল গুনতে গুনতে প্রথমবাবু বললেন। কটা হল? দাঁড়াও আরও বলছি। রমা।···

সুরি পাগলী চেঁচিয়ে উঠল—বাবারা! ও বাবারা! ওগো বাবারা!

ঘাটের ধারে উঁচু পাড়ে ঘাটের ইজারদার চৌবেজীর গদি। পূর্ণিয়ার লোক। এ-ঘাটে আছেন 'চোদা বরষ'। যখন এসেছিলেন, তখন চুল ছিল কুচকুচে কালো। এখন অর্ধেক পেকে গেছে। ফি-সাল জষ্ঠি মাসের সংক্রান্তিতে গঙ্গাপুজোর মেলার দিন ন্যাড়া হন। ময়না পোষার শখ খুব। খাঁচাটা সামনে ঝুলছে। রামনাম শেখান সকাল-সন্ধ্যা। নিজে পড়েন তুলসীদাসের রামচরিতমানস। কালেকটারিতে এ বছর 'একইশ হাজার রূপেয়া' গ্‌নে দিয়ে ঘাট জিতেছেন। আনা-আনা পারানি। তবে বিলাওলের যুবতী মেছুনীদের বেলা আনাকড়ি নয়, রাতের জলের ফসল ঝকঝকে রাইখয়রা মাছ। চৌবেজী মাছও খান, মাংসও খান। খৈনি ডলেন, গড়গড়াও টানেন। গদিতে কোলে তাকিয়া নিয়ে বসে ভাঙা উচ্চারণে গানও গেয়ে ওঠেন—'কেম্‌নে এ গঙ্গাহোবো পার/হামি জানে না সাঁতার।' মাছের গন্ধ লাগা বেলুন-বেলুন বুক খিলখিল হাসিতে ফুলে ওঠে, দুলে ওঠে।—ওত্তা হাসো মাৎ রী। ফাট্ যায়গা।

—ঘাটোয়ারিবাবু না ঘাটের মড়া। কোথায় শিখলে এমন গান? আ ছি ছি।

আর ফচকেমির সময় নেই। শম্ভু মাঝি ডাক দিয়েছে—এ অষ্টসখী রাধিকে সুন্দরীরা।···

ওদিকে ডাক দিয়েছে ইসমাইল ড্রাইভারের বাসও। হর্নের ভ্যাঁক ভ্যাঁক আওয়াজ চলে যাচ্ছে নদী পেরিয়ে ওপারের ঘাটে।—পুরন্দরপুর মনসুরগঞ্জো বিনোটি মহিমাপুর। ছেড়ে গেল, ছেড়ে গেল। সবুজ বাসের ভেতরে লোক, বাইরে লোক, ওপরে লোক। অলীক ফলন্ত বৃক্ষ হেলতে দুলতে যাবে। রাস্তা মহা ফক্কড়বাজ।

—বাবারা। ওগো বাবারা! ও বাবারা! সুরিক্ষেপী মাটিতে থাপ্পড় মেরে সেই হাত কপালে আনে। আবার মাটিতে থাপ্পড়। ধুলোয় কপাল ধূসর।

ময়রাবুড়ী চেঁচায়—চুপ। চুপ। গলায় দোব গরম তেল ঢেলে। লজ্জা করে না

বড় গলা করে চ্যাচাতে ? তখন কোথায় ছিল এ গলা ? চিহরিপোকার (শ্রীহরি) কামড় খেয়ে বোবা হয়েছিলি ?

মাঘের শেষে রানীরঘাটে শিমুলের ডালপালায় যেন হাজার অলীক বনমোরগ উড়ে এসে বসেছে। লাল লাল ঝুঁটি। ফাল্গুনে তাদের সাদা পালক উড়ে পড়ে মা গঙ্গার বুকে। স্বচ্ছ কালো জল বালির চরে মাথা কুটে কুটে পথ প্রার্থনা করে। যেতে পায় কী পায় না। শ্যাওলায় ঠোঁট ঘষে বেড়ায় মৌরালার ঝাঁক। প্রতিমার খড়বাঁশের টাট উল্টে গেছে যে স্রোতে, তা এখন স্মৃতি এবং পরবর্তী প্রতীক্ষা। মড়াখেকো দাঁড়কাক এসে সেই টাটে বসে সবাইকে খেতে ডাকে — খা খা। ময়রাবুড়ী তাই শুনে বলে—ওই ঘাটের মড়াটাকে খা। এ ঘাটে অনেক মড়া, কোন মড়ার কথা বলে দাঁড়কাক জানে না। সুরিক্ষেপীকে বুড়ী এনেছে চান করাতে। বুড়ীর হাতে কঞ্চি। কঞ্চিটা নাচাতে নাচাতে বলে—ভালমানুষের বেটি হবি তো বস। বসে পড় জলে; তাই বলে ওকে ছোঁবে না বুড়ী। নিজে-নিজেই চান করতে হবে সুরিক্ষেপীকে। তাই আবার স্নান। পা ছড়িয়ে আঘাটার জলে বসে কপাল থেকে জলের দিকে এবং জলের দিক থেকে কপালে হাত। —বাবারা! ওগো বাবারা! জল বলে ধুলোমাখা কপাল ধুয়ে যায়, এটাই এখন সুবিধে। বুড়ী বলে—হাতখানা বুকে দে লো, বুকে দে। বাবারা বলে বুকে দে দিকিনি।

শীতটা চলে গেল। গ্রীষ্ম এল। ঘাটের ধারে আকন্দঝাড়ে ফুল ফুটল। ঘাটোয়ারিজী গঙ্গাপুজোর দিন ন্যাড়া হলেন। আটচালায় সুরিক্ষেপীকে আড়চোখে দেখে দয়া করে ভাত পাঠিয়ে দিলেন। এ বছর অচানক দশ হাজার টাকা বেড়ে গেছে ইজারার দর। তাই বলে চৌবেজী রানীরঘাট ছাড়বেন না। বুড়ো হয়ে মরবেন, তখন কেউ গদি দখল করুক। বড় মায়া বসে গেছে রানীরঘাটে।

বর্ষায় এক রাতে তুলকালাম বৃষ্টি। তার মধ্যে সুরিক্ষেপীর বাচ্চা হল আটচালায়। কজন দূর গাঁয়ের গাড়োয়ান গরুমোষের গাড়ি নিয়ে এসে আটকে পড়েছিল। তারাই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ছুটোছুটি করে অবশেষে ময়রাবুড়ীকেই পেল। মানুষের জন্মটা ওইসব গেঁয়ো গাড়লদের কাছে নিশ্চয়ই খুব দামী। তারা একটা হ্যারিকেন দিল পর্যন্ত। আটচালার কোণটাও কাপড় টাঙিয়ে ঘিরে দিল। মেয়েমানুষের আর্তনাদ শুনে তাদের হৃদয় গলে যাচ্ছিল। বৃষ্টি না থাকলে তারা এ সময় দূরে সরে থাকত। মানুষের জন্ম তাদের কাছে বড় পবিত্র ঘটনা। তারা একে সম্মান দিতে চাইছিল। কিন্তু বৃষ্টি। আর বুঝি সময় ছিল না বর্ষাবার। তারা বর্ষার বাপান্ত করছিল।

ময়রাবুড়ী বলল—আগুন চাই যে এখন। দেখ্ দিকি, এ অসময়ে গুখেকোর বেটি এ কী করে বসল।

গাড়োয়ানরা ঘাটোয়ারিবাবুর গদি থেকে শুকনো লকড়ি এনে দিল। একটু পরে শোনে, ওঁয়া-ওঁয়া কান্নাকাটির মধ্যে বুড়ী হেসে-হেসে আদর করছে—এ রাঙা টুকটুক কোত্থেকে এল রে! এ ভাঙাঘরে চাঁদের হাট কোন মুখপোড়া বসালে রে। একে আমি কোথায় রাখব রে! আহা, যেমন নাক তেমনি চোখ। যেমন মুখের গড়ন, তেমনি রঙ।

ওরে ছোঁড়া, এ মুখ তুই কোথায় পেলিরে ?···

সে এক দীর্ঘ পদ্য, ছড়ার সুরে গেয়। রানীরঘাটে সকাল হতে না হতে সুখবর পড়ল ছড়িয়ে। তখনও ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর নামগন্ধ নেই কোথাও। রানীরঘাটের স্থায়ী জনসংখ্যা বাড়ল, এই যথেষ্ট। প্রসূতিকে কড়া চা খাইয়ে খাইয়ে চোল করার অবস্থা। ময়রাবুড়ী চোখ পাকিয়ে কপট ধমকায়। বাসের লোক রিকশোর লোক, আর যতসব উটকো লোকের ঝামেলা সে ছাড়া আর কে সামলাবে? সে আঁতুড় আগলে দাঁড়িয়ে বলে—কী দেখার আছে ? অ্যাঁ ? কারও মা-বোন বিয়োয়নি ?

সেন্সাস বাবুদ্বয় অনেকগুলো নাম আওড়ে গিয়েছিল। রানীরঘাট নিল না। আদর করে নাম দিল ফালতু। আসলে এতকাল যেন কাজের মতো কাজ, কিংবা খেলার মতো একটা চমৎকার খেলা পাচ্ছিল না কেউ। এতদিনে পেল। পেল তো এমনভাবে পেল যে হুজুগের মাত্রাটা গেল বেড়ে। ছোকরা কণ্ডাক্টররাই লিড নিল। চাঁদার লিস্টিতে প্রথম নাম চৌবেজীর। পাঁচ টাকা। দ্বিতীয় নাম ইসমাইল ড্রাইভার। দু'টাকা। ঘাটে ফিস্টি হবে। সুরিক্ষেপীর ব্যাটার জামাপেণ্টুল কিনতে হবে। একখানা নতুন শাড়িই বা কেন কেনা হবে না ? এ প্রস্তাব শম্ভু মাঝির। আর সেইদিনই দৈবাৎ এসে পড়েছে একটা নাটুকে দল। লোকে বলে আলকাপ দল। ছেলেটা মেয়ে সেজে নাচে গায়। বেঁটে লোকটা সঙ দিয়ে লোক হাসায়। ঘাটের পিছনের চত্বরে তেরপল টাঙিয়ে আসর হল। ঘাটবাবুর হ্যাজাগ জ্বলল। রানীরঘাটে এ ছিল উৎসবের রাত। আর তখনও রানীরঘাটে ব্রিজ হয়নি। বিদ্যুৎ আসেনি। মাই কবাজত না। দূর উত্তরের ফরাক্কায় ফিডার ক্যানেলটাও খোঁড়া হয়নি। দেশ দু' টুকরো হয়নি। কত কি হয়নি। সে অনেক বছর আগের কথা।···

সুরিক্ষেপীর চেহারা আহামরি ছিল না। মুখটা ছিল গোলগাল, সরু বেঁটে নাক নীচের ঠোঁটটা একটু পুরু। গতরটা ছিল থলথলে প্রচুর মাংসে ভরা। ময়রাবুড়ী বলত—সাতশো শ্যালশকুনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। শুধু দেখবার মতো জিনিস ছিল তার চুল। কী চুল কী চুল! ছেলে হওয়ার পাঁচদিনের দিন, আঁতুড় থেকে যেদিন বেরোয়, সেই 'পাঁচোটে'র দিন কণ্ঠি তাড়না করে মমতাময়ী বুড়ী তাকে নাইয়ে আনে এবং গড়গড় করে এক বাটি নারকোল তেল ঢেলে দেয় চুলে। সেই একবার তেল। ফলটা হল কী আটচালার ধুলো-ধাসড় মেখে পুরোটা গিয়েছিল জট পাকিয়ে। জটার প্রতি লোকের ভক্তি আছে। পরে যখন রানীরঘাটওলারা সুরিক্ষেপীর জন্যে বাসস্ট্যাণ্ডের পিছনে একটা ছফুট-চারফুট-সাতফুট মাপের খুপড়ি বানিয়ে দিয়েছিল, সুরি বাচ্চা কোলে নিয়ে সেখানে বসে বাবাদের ডাকাডাকি করত আর ধর্মভীরু দেহাতী মেয়েরা পয়সা ছুঁড়ে দিত। পয়সাগুলো সুরি পাল্টা ছুঁড়ে ফেলবেই। সেই পয়সা ঘাটেরই কেউ না কেউ কুড়িয়ে জোর করে ওর আঁচলে গেরো বেঁধে রাখবেই। তাতে আপত্তি ছিল না সুরির। কিছুতেই আপত্তি ছিল না। পরের গঙ্গাপুজোর আগের দিন ময়রাবুড়ী চুপি চুপি একদলা সিঁদুর ঢেলে দিয়ে এল সিঁথেতে। চেহারাটা খুব খুলে গেল মেয়েটার। টুকটুক করে তাকিয়ে দেখে বুড়ী বলল, আহা! শাঁখানোয়াখান হলে কী মানান মানত পোড়ারমুখীকে। ব্যস,

খবর গেল শম্ভু মাঝির কাছে। ওপারে ঘাটের ওপর শাঁখাপট্টি। তাও জুটে গেল। ময়রাবুড়ী খুপরির সামনে কোমরে দুহাত রেখে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। দেখে দেখে সাধ আর মেটে না। ছেলেপুলের মায়ের যা যা দরকার, তা নইলে চলে! দেখ তো মুখপুড়ীকে এখন কেমন মানিয়েছে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বুড়ী দৌড়ে যায় দোকানের দিকে। রানীরঘাটে পাখপাখালি যত, তত কুকুরবেড়াল। তার উপর কড়াইতে তেল ধোঁয়াচ্ছে।...

সেবার গঙ্গাপুজোর দিন সন্ধ্যেবেলা খুব কালবোশেখি হল। বিষ্টি হল। বাইরের লোকেদের খোয়ারের হল একশেষ। কিন্তু রানীরঘাটে গজিয়ে গেল এক দেবী। আবার কে? ওই সুরিক্ষেপী। সে 'ক্ষেপী মা' হয়ে গেল। লোকে তার কাছে জ্ঞাতব্য তথ্য আদায় করতে চায়। ক্ষেপী মা'র শুধু ওই এক কথা—ওগো বাবারা! ও বাবারা! আর ডান হাত কপাল থেকে মাটিতে, মাটি থেকে কপালে। রাতদুপুরে নিঝুম রানীরঘাটে হঠাৎ শোনা যায়—ওগো বাবারা! ও বাবারা!

কিন্তু এত যে যত্নআত্তি লক্ষ্য, তার তলায়-তলায় আরেক তরঙ্গ বইছিল রানীরঘাটে। কাজটা কার হতে পারে? পাপ হোক, পুণ্য হোক, ভাল বা মন্দ হোক, এ-একটা ঘটনাই বটে। কে সে? জানোয়ার হোক, মানুষ হোক—দৈবাৎ মতি টলেছিল, কিন্তু কার? নানা ফিকিরে বাচ্চাটার মুখ দেখা হয়, ফিরে এসে রানীরঘাটে মুখ খুঁজে মেলাবার চেষ্টা চলে। মেলে না। চৌবেজী ঘাটোয়ারির নামটাও উঠেছিল। টেঁকেনি। অত সাফ-সুতরো মানুষ। গদির সাদা চাদরে এককণা ময়লা পড়তে দেন না। দুবেলা স্নান-আহ্নিক করেন। খালি গায়ে ধবধবে সাদা পৈতে থেকে জ্যোতি ঠিকরে পড়ে। নোংরা দুর্গন্ধ এক নারী শরীরে কোন দুঃখে সুখ খুঁজতে যাবেন? তার ওপর লাখপতি লোক। ইচ্ছে করলেই ওপারের অলিগলি খুঁজে সুন্দরী সংগ্রহ করাটা 'ডালরোটি' খাওয়ার সামিল। কেউ বলেছিল, ইসমাইল ড্রাইভারই বা। যা মদ-তাড়ি খায় লোকটা। রাতের দিকেই ঘটেছে। হিসেবমতো আশ্বিন মাসেই বটে। সে-আশ্বিনে প্রায়ই রাতে ঝড়বৃষ্টি হত। কিন্তু মনে পড়ল, তখন ইসমাইল অ্যাকসিডেণ্ট করে অনেকদিন হাসপাতালে ছিল।

এইভাবে জনাদশেক প্রজননক্ষম পুরুষমানুষ যারা কিনা ঘাটেরই বাসিন্দা এবং বয়স পনের থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে সবাইকে যাচাই করে-করে বাদ দেওয়া হল। অতএব দায়িত্বটা বাইরের লোকের ঘাড়েই ফেলতে হয়। আশ্বিনে তো ঝড়জল গেছে। বারোমাসই ওই আটচালায় রাতের আশ্রয় নেয় কত জায়গার পথিকজন, গাড়োয়ান, ভিখিরি, ফকির, সন্ন্যাসী—কত রকম মানুষ। কার মাথায় কটকট করে 'চিহরিপোকা' কামড়েছিল! শেষঅব্দি হাল ছেড়ে দেওয়া হল। ও পোকা বিষম পোকা। কামড়ালে উত্তর-পূব জ্ঞান-গম্যি থাকে না।

আর দিন যায়, রাত আসে। রাত যায়, দিন। মাস যায়, বছর! ঢ্যাঙা শিমুলে অলীক লালঝুঁটি মোরগের ঝাঁক আসতে ভোলে না। ঘাটোয়ারিজীর ময়না কবীরের দোহার একটি শব্দ পেরিয়ে যেতে-যেতে হিমসিম খায়। ঘাটোয়ারিজীর বাকি চুল সাদা হয়ে

ওঠে! ক্ষেপীমায়ের 'থানে' পয়সা পড়ে এবং চুরিও যায়। এক শীতে ময়রাবুড়ীও গঙ্গা পায়। ক্ষেপী চেঁচায়—বাবারা! ওগো বাবারা! ও বাবারা!

ফালতু তখন গুটগুট করে হাঁটতে শিখেছে। আর রানীরঘাটের সবাই তার বাবা। আধো-আধো বুলিতে ছোঁড়াটা কাপড় ধরে টানে—বাবা বাবা! ব্যাপারী, দালাল, ফড়ে, মামলাবাজ, গাড়োয়ান আর বাবু—সবাইকে বাবা ডাক। চৌবেজীর উঁচু গদির ধারে দাঁড়িয়ে ছোট্ট নোংরা হাত বাড়িয়ে ডেকে ওঠে—বাবা। চৌবেজী হাসতে হাসতে ধমকান—ভাগ! ভাগ! তাই বলে কেউ ওর গায়ে হাত তুললেই হয়েছে। সারা রানীর-ঘাট এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দেখতে দেখতে ফালতু বড় হল। আবার এক গঙ্গাপুজোর মেলার দিন খুব জলঝড় এল। সেই রাতে সুরিক্ষেপী কাপড়-চোপড়ে আচমকা বমি করে ভোররাতে ঠাণ্ডা আর নীলবর্ণ হয়ে মারা পড়ল। মায়ের গুয়েমুতে ছোঁড়াটা বেহদ্দ ঘুমোচ্ছিল। বাঁশবনে বাঁশ কেটে খাটুলি বানানো হল। ওপাশের শ্মশানে ক্ষেপীমা পুড়ল। রানীরঘাটে সেও একটা দিনের মতো দিন ছিল। আবার চাঁদা তুলে ফিস্টি। আবার এক-আসর গান। শেয়ালমারার ষষ্ঠীপদ কের্ত্তনে নিখরচায় গেয়ে গেল। ফালতুকে কেউ যদি শুধোয়—তোর মা কোথায় রে? ফালতু শ্মশানের দিকটায় আঙুল তুলে ছড়া গায়—'হো হো! কেপী গেচে, পুলতে/ছসেল পতোল তুলতে।' অর্থাৎ কী হাসির কথা! ক্ষেপী গেছে পুড়তে, ছসের পটোল তুলতে। কে শেখাল? শম্ভু মাঝিই বা। সে বড় রসিক মানুষ। নয়তো দিনদুপুরে মাঝগঙ্গায় লগি ঠেলতে ঠেলতে কেউ গায়—'এ ভরা গাঙমে চেকন জোসনা ডুব দিয়ে পার হবি লো সই/সই লো—ও—ও—ও?'

হাফপেণ্টুল পরা উদোম-গা ফালতু ভালরকম বুলি ফুটলে বাসের মাথায় উঠে চ্যাঁচায়—চলে এস! চলে এস! আভি ছোড় দেগা। জলদি ছোড় দেগা!

আর এর ফলটা হল এই যে, সে গতি চিনল। গতিকে ভালবাসল। ইসমাইলের বাসেই তার জীবনটা জড়িয়ে গেল দেখতে দেখতে। পুরন্দরপুর, মনসুরগঞ্জো, বিনোটি, মহিমাপুর। কখনও ইসমাইলের সঙ্গে গঙ্গা পেরিয়ে শহর। শহরে ইসমাইলের বাড়ি। তার বউ ফালতুর ইতিহাস জানে। দেখলেই মুখটা গম্ভীর করে। জল চাইলে ফুটো এনামেলের গেলাসে জল দেয়। ছিঘেন্নার চূড়ান্তই করে। ইসমাইল কাঁচুমাচু হাসে খালি। কী বলবে। অথচ ছোঁড়াটা খুব কাজের। পাকাচুল তোলে। ফরমাস খাটে। নিজের ছেলেরা ইস্কুলে পড়ে। তারা যেন এ হারামী ড্রাইভারী কাজের ত্রিসীমানা না ঘেঁষে! হাতে স্টিয়ারিং এলে দুনিয়াটা পয়মাল হয়ে যায়, কে বুঝবে? থিতু হয়ে বসা যায় না ঘরে। শয়তানের চাক্কা ঘোরে সারাক্ষণ এই শরীরে। থামতে দিলে তো? আর শয়তান তোমাকে শেষঅব্দি জাহান্নামের দিকেই নিয়ে চলেছে, টের পেয়েও কিছু করার নেই তোমার।...

কতকাল পরে রানীরঘাটে আরেক শীতে আবার এসেছেন সেন্সাসের বাবুরা। এ

বাবুরা সেই তাঁরা নন। এরা সরকারী বড় সেন্সাসের লোক। এ রানীরঘাটও সে রানীরঘাট নয়। তিনটে বাসরুট এসে মিলেছে ঘাটে। দোকানপাট বেড়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে। শ্মশানঘাটের ওপাশে ব্রিজ গড়ে উঠেছে। চৌবেজী ঘাটোয়ারির এই শেষ ইজারা। খাঁচার ময়নাটাও গেছে মরে। আর পাখি পোষেন না। তক্তাপোশের তলায় ঘুণধরা খাঁচাটার কী অবস্থা কেউ জানে না। সেন্সাসের বাবুরা ঘুরে-ঘুরে লোক গুনছিলেন। পোষা জীবজন্তুর হিসেবও নিচ্ছিলেন। আরও কত কী তথ্য। লোকসংখ্যা সতের থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে বাহান্ন। নেহাত পেটেরটা বাদ দিয়ে ধরলে। লোকেরা ব্রিজের দিকেই সরে যাবার তালে ছিল। কিন্তু গিয়ে করবেটা কী? নেহাত ঘর বেঁধে থাকাই হবে। উঁচু পুলের ওপর দিয়ে বাসবোঝাই লোকজন সোজা গিয়ে ওপারে নামবে। এখানে কোথাও আর রাস্তা আগলে দাঁড়াবার সাধ্যি নেই। রানীরঘাট হিম হয়ে ঝিম মেরে গেছে। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সময় গোনা। নেহাৎ ভিটের মায়ায় কেউ কেউ থেকে যাবে। সেন্সাসের বাবুরা টের পেলেন, এ বাহান্ন আবার সতেরয় নামবে, কিংবা আরও নেমে সাতে ঠেকলেও অবাক হবার কিছু নেই। যারা দোকানদারি করতেই এখানে ঘর বেঁধেছে, তারা ওপারে নতুন বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে দু-চার হাত জমির জন্যে মাথা ভাঙছে।

অথচ বাইরে-বাইরে এই মৃত্যুযন্ত্রণা বোঝার উপায় নেই। তেল ফুরোবার আগে সলতে পুড়ছে হু হু করে। রানীরঘাট ভিড় হল্লাজেল্লায় চঞ্চল। মোটর অফিসের টেবিলে শেষ সংখ্যা বসিয়ে সেন্সাসের বাবুরা নেমে এলেন চায়ের দোকানে, যেখানে আগের সেন্সাসের দুই বাবু চা খেয়েছিলেন। ওপরে এক টুকরো টিনে লেখা : অন্নপূর্ণা টি স্টল! বাঁকাচোরা হরফ। তার তলায় লেখা প্রোঃ জগন্নাথ—পদবী ধুয়ে গেছে। চা বানাচ্ছে ষোল-সতের বছর বয়সের একটি মেয়ে। শ্যামলা ছিপছিপে গড়ন। দেখতে মন্দ না। ভেতরে দরমাবাতার দেয়াল ঘেঁষে একটা বেঞ্চের কোনায় বসে চা খাচ্ছে এক নবীন যুবক। মাথায় ঝাকড়মাকড় চুল। সরু চিকন গোঁফ। তামাটে রঙ। শক্তসমর্থ চেহারা। তার পরনে তোবড়ানো খাঁকি ফুলপ্যান্ট, আর খয়েরি শার্টের ওপর হাত-কাটা সোয়েটার। বাঁ হাতে স্টিলের বালা। ভারি অমায়িক তার হাবভাব।

তার দিকে ঘুরে জগন্নাথের মেয়ে টুকটুক হাসল।—ও ফালতুদা, তোমার নাম লিখিয়ে দাওনি বাবুদের?

সেন্সাসবাবুদ্বয় বেঞ্চে বসেছেন। ফালতু ভুরু কুঁচকে বলল—কিসের নাম?

হাসতে হাসতে টুকটুক বলল—ওর নাম লিখুন। ও যে বাদ পড়ে গেল।

প্রথমবাবু বললেন—তুমি বুঝি এখানেই থাকো?

ফালতু নিস্পৃহ ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে সিগারেট ধরাল। পানুটি কি এখানে? বত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা ঠেঙিয়ে বাস নিয়ে এসেছে একটু আগে। পথে দুবার বিগড়েছিল। ঠেলতে হয়েছে। মালিককে বললে বলেন, 'আর ক'টা দিন চালিয়ে নে বাবা। নতুন গাড়ি আসছে।' ইসমাইলকে বুড়ো করেছে এ গাড়ি। সেই গাড়ি ফালতুকেও বুড়ো করবে।

দ্বিতীয়বাবু কাগজপত্র বের করেছেন ব্যাগ থেকে।—কেউ তো বলেনি তোমার কথা! হুঁ, নামটা বলো ভাই।

ফালতু হেসে বলল—নাম লিখতে হবে?

প্রথমবাবু বোঝাতে শুরু করলেন। টুকটুকিও বলল—ভয় নেই বাবা। কেউ ধরে নিয়ে যাবে না। আমারও নাম লিখে নিয়েছে। নেননি বাবু? বলুন তো একবার।

একটু পরে কাচুমাচু মুখে ফালতু রাজি হল।—লিখুন তাহলে। ফালতুই লিখুন।

—ফালতু! হাসলেন উভয় বাবুই। ওটা নিশ্চয় ডাকনাম? আসল নাম বলো।

মেয়েটা হেসে খুন হল। চায়ে দুধ ঢালতে গিয়ে উনুনে পড়ে গন্ধ উঠল। ফালতু গোঁ ধরে বলল—আসল নকল জানি না স্যার, ফালতু আমার নাম। লিখতে হয় লিখুন, নয় বাদ দিয়ে দিন।

—বেশ, ফালতু। হুঁ, বয়স?

—বিশ-পঁচিশ হবে।

আবার হাসি উঠল অন্নপূর্ণা টি স্টলে।—বিশ, না পঁচিশ?

—যা মনে হয় লিখুন। ফালতু বিরক্ত হয়ে বলল।

—মাঝামাঝি লিখছি। বাইশ। কেমন? জাতি কী ভাই?

একটু চুপ করে থাকার পর ফালতু বলল—হিন্দুই লিখুন।

—বাবার নাম?

হঠাৎ বজ্রাঘাত। জগন্নাথ মেকদারের হাসিখুশি মেয়েটা শক্ত হয়ে গেল। আড়-চোখের বাঁকানো দৃষ্টি ফালতুর গায়ে গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ রানীরঘাট নিঃঝুম। ঝড়ের আগে যখন পাতাটিও গাছে নড়ে না। খালি বাজ পড়ার শব্দ।

—বলো ভাই!

ফালতু বেঞ্চের কোনায় সিগারেট ঘষটে নেভাল। তারপর বলল—মায়ের নাম লিখুন সুরিক্ষেপী। তাহলেই হবে।

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল জগন্নাথ মেকদারের মেয়ে।—না, সুরেশ্বরী লিখুন। বাবা বলত ক্ষেপীমার নাম সুরেশ্বরী। উইখানে থাকত—মাথায় জটা। আমি দেখিনি। বাবা দেখেছে। ঘাটের কত লোক দেখেছে। গঙ্গাপুজোর সময় নাকি ভর হত। লোকেরা মানত করত।…

সবাই গম্ভীর। তারপর আস্তে বললেন দ্বিতীয়বাবু—হুঁ অজ্ঞাত। এবার বলো, বাড়িতে কে আছে। কখানা ঘর। পোষা জীবজন্তু আছে কি না। বাড়ির গারজেন থাকলে তার নাম কী…

প্রথমবাবু বললেন—ট্রেন চালিও না। একে একে জিজ্ঞেস করো।

ফালতু উঠে দাঁড়াল। বলল—বাড়িটাড়ি নেই। থাকি মোটর আপিসে। তারপর চলে গেল।

বাবুরা চা খাচ্ছেন। তখন গঙ্গায় নেয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে মেয়ের বাবা

জগন্নাথ এসে গেল। কোমরে বরাবর বাত। এখন শরীর দু' ভাঁজ হয়ে গেছে। কোমর থেকে মাথা অব্দি মাটির সমান্তরাল। তাই হাঁটলে হাত দুটো উড়ন্ত শকুনের ডানার মতো দুপাশে ঝটপট করে। এখন একহাতে ঘুকে। ঘটিতে গঙ্গাজল। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে সেই হাতটা ঝুলে স্বাভাবিক হয়েছিল। কিন্তু ঘটি রাখতেই আবার যে-কে-সেই। সেন্সাসের বাবুদের চা খেতে দেখে খুশি হল। টুকটুকি ঠোঁটের কোনায় হেসে বলল—ফালতুদার নাম লিখে নিয়েছে বাবা। আমিই বললুম তো লিখতে। বাদ পড়ে যেত কেমন।

জগন্নাথ হাসল।···তোর যেন দিদির স্বভাব। বুঝলেন স্যার? সেবারে আপনারা আসেননি। অন্য দু'জন এসেছিলেন। আপনাদের চেয়ে বয়স অনেক কম। দিদি থাকত ওই যে ভিটে দেখছেন, ওখানে। ওই ফালতুর মায়ের নাম লিখিয়েছিল। খুব ভালবাসত মেয়েটাকে।

কথার কথা হিসেবে প্রথমবাবু বললেন—কাকে?

—সুরিক্ষেপীকে। মানে ফালতুর মা। জগন্নাথ রোদে দাঁড়িয়ে পঁথি খুলল। পঁথিতে অল্পবিস্তর রঙ চড়বেই। তাই—কোন জাত না কোন জাত, জাত মানামানি নেই। দিদি ঘাটে ফেলে মেয়েটাকে রগড়াত। কী ভাল না বাসত স্যার! ঘাটের অনেকে জানে। দেখেছেও, যারা ছিল তখন। আমার দিদি মুরুক্ষু মেয়ে হলে কী হবে, প্রাণটা ছিল বড়। ফালতুর জন্মের রাতে কি বিষ্টি কী মেঘ। পেলয়ঙ্কর চলছে। তার মধ্যে দিদি কাঠ রে আগুনের সেঁকা রে, পোড়া রে, আপনার মশাই লণ্ঠন রে করে রানীরঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আজকাল আর অমন মানুষ হয় না স্যার! তো ফালতু এখন মানুষ হয়েছে। এ লাইনে খুব পাকা ড্রাইভার। ও জানেই না এসব কথা। কে ওর চোখে কাজল পরিয়ে গায়ে তেল মাখিয়ে রোদে বসে থাকত জিগ্যেস করুন, বলতে পারবে না।

সেন্সাসের বাবুদ্বয়ের অত সময় নেই। শহরে শিক্ষকতা করেন। স্কুলের সময় হয়ে এল। উঠে গেলেন পয়সা দিয়ে। জগন্নাথ একটু বেজারই হল। এক সময় সুরিক্ষেপীর বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা রানীরঘাটের মনমেজাজ চাঙ্গা রাখত। কার না মনে পড়ে সে-সব দিন? ফিস্টি। গানের আসর। সুরিক্ষেপীর ঘর গড়ার দিন কত হৃইচই স্ফূর্তি। যে আসছে, সেই হাত লাগাচ্ছে। জগন্নাথ কত কাপ চা খাইয়েছিল হিসেব নেই। আজকাল সবাই কেমন যেন হয়ে গেছে। ফালতু তখন মোটেই ফালতু ছিল না। এখন ফালতু তো বটে, মানুষই যেন ফালতু হয়ে গেছে। ঘাটোয়ারিজী একটা লাল হাফপেন্টুল দিয়ে ফালতুকে বলেছিলেন—যেদিন বাবা বলা ছাড়বি, সেদিন থেকে রোজ একপো করে রসগোল্লা। ফালতু ছাড়তেই পারেনি। ও বাবা, তোমার পাখিটা দাও না! ও বাবা, আমি খৈনি খাব। ও বাবা, দুটো পয়সা দাও। হু*, ফক্কুড়ে লোকেরা শিখিয়ে দিত ছোঁড়াটাকে। ঘাটোয়ারিজীকে নাকাল করে ছাড়ত। শুধু ঘাটোয়ারিজী কেন, জগন্নাথের ওপরও লেলিয়ে দিত না? একবার অশ্বিনী দারোগা এসেছেন ঘাটে। কে লেলিয়ে দিয়েছে ফালতুকে। ফালতু দারোগাবাবুর হাফপ্যান্টুল খামচে ধরে বলে—ও বাবা

সাইকেল চাপব। বাবা সাইকেল চাপব। দারোগাবাবু বললেন—এটা সেই পাগলীর বাচ্চাটা না? আহা! রানীরঘাটে সে এক দিনকাল ছিল। দু'দে দারোগা হো হো করে হেসে সাইকেলের রডে চাপিয়ে সত্যি একচক্কর ঘুরিয়ে দিলেন। নামিয়ে দু-আনা পয়সাও দিলেন। বললেন—কী রে ছোঁড়া? আমার সঙ্গে যাবি? আমার বাড়িতে থাকবি। লেখাপড়া শেখাব অ্যাঁ? যাবি?

সেদিন ফালতু গেলে ভালই করত। রানীরঘাটের লোকগুলো যেন ছোঁড়াটার মাথায় পড়ে গিয়েছিল। ও গেলে যেন ঘাট ফাঁকা হয়ে যাবে। এক ফাঁকে শম্ভু মাঝি ডাকল—আয় বে। নৌকোয় চাপবি। ফালতু চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দারোগাবাবু সাইকেলে চেপে গেলেন আসামী ধরতে কনকপাড়া-গোপগাঁ।...

তবে ছোঁড়াটার লোভ ছিল না কিছুতে। দিদি একখানা বেগুন হাতে দিলে তো প্রায় সারাদিন ধরে তাই কুচকুচ করে দাঁতে কেটে খাবে। দিদি ওদের মা-ব্যাটার মত যত্ন করত। এখন ভাবলে অবাক লাগে। কেন এমন করত দিদি? কেন কেন করতে করতে জগন্নাথের শীতটা গেল বেড়ে। তোবড়ানো মুখে ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকল।

—বাবা, আমি আসছি।

জগন্নাথ তাকায় মেয়ের দিকে।—নাও! মাথায় পোকা কামড়াল। খদ্দেরপাতি আসবে-টাসবে।

—তুমি দেখ না ততক্ষণ। মরতে তো যাচ্ছি না!

লম্বা পা ফেলে টুকটুকি বাসস্ট্যাণ্ডের ওপাশে চলে গেল। মা-মরা মেয়ে নিজের জোরে বড় হয়েছে। বাড়টা বড্ড বেশি। ঘাটসুদ্ধু লোক তার কুটুম্ব। মামা, খুড়ো, কাকা মামী, খুড়ি, কাকীমা, দাদা, বউদি, আরও কত রকম সম্পর্ক মানুষের থাকে।

বাস সিণ্ডিকেটের লক্ষ্মণবাবু ডাকেন—ও টুকটুকি, কোথায় যাচ্ছিস? টুকটুকি সোজা বলবে—আপনার কনে খুঁজতে দাদামশাই। লক্ষ্মণবাবু দাড়ি চুলকে বলবেন—ওরে, ওরে। তুইই তো আমার কনে। টুকটুকি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলবে—আমার বর যে ঠিক হয়ে আছে দাদামশাই। আহা, আগে বলতে হয়।

আর ওই চৌবেজী। ওকে দেখলেই খৈনি ডলতে ডলতে—কেমনে হোবো এ গঙ্গা পার / হামি জানে না সাঁতার।

ঘাটোয়ারিজী লোটা হাতে শিমুলতলায় দাঁড়িয়েছিলেন। কানে পৈতে জড়ানো। হাতমাটি করা হয়ে গেছে। মোছা হয়নি। নির্মীয়মান ব্রিজ দেখছেন। দেখতে দেখতে ঘুরলেন ডাইনে বাঁশবনের দিকে। আকন্দ ও সাঁইবাবলার ঝাড়ের পিছনে জগন্নাথের মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। হাতমুখ নেড়ে কথা বলছে কার সঙ্গে। একটু সরলে ঘাটোয়ারিজী অবাক। ওটা ফালতু না? চোখের নজর ইদানীং কমেছে। তাহলেও চিনতে ভুল হল না। হেঁড়ে গলায় কাঁপা-কাঁপা সুরে গেয়ে উঠলেন—'কেমনে হোবো এ গঙ্গা পার...' টুকটুকি হন হন করে চলে গেল গঙ্গার আঘাটায়। ফালতু একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর বাস অফিসের দিকে হাঁটল। চৌবেজী খুব হাসলেন।

কতক্ষণ আপনমনে হাসলেন। হাসার পর গম্ভীর হয়ে গেলেন। মন খারাপ হয়ে গেল।

—টুকটুকি! ও রী টুকটুকি! শুন, শুন! ইধার আ।

—বলো ঘাটোয়ারিজী। যা বলার ঝটপট বলো, আমার শোনার সময় নেই।

—আ রী বৈঠবি, তব তো বোলবো।

—হুঁ বসলুম। বলো।

—হাঁ রী, এত্তো কী ফসুর-ফাসুর কোরে বেড়াস ফালতুর সঙ্গে।

টুকটুকি মুঠো পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মারব! তারপর কান্নার ভান করে—হুঁ, মাগো। এবং আবার মুঠো তুলে—মারব!

চৌবেজী নির্লজ্জের মতো ফিসফিস করলেন—সাচ বলছি রী বেটি। বাত তো শুন।

—শুনব না। চিলচ্যাচানি চেঁচাল জগন্নাথের মেয়ে।

পাগলী বেটি! বোল, বিভা করবি তো বোল হামাকে। হামি লাগিয়ে দেবে। চৌবেজী চাপা স্বরে বলতে থাকলেন। আরী! হামি তো ঘাট ছেড়ে চলেই যাবে। তোদের বিভা দেখে যাই। এত্তোকাল ঘাটে থেকে বুঢ়া হোয়ে গেল। হামার বহুত সুখ হোবে, বেটি। বহুত ধুমধাড়াক্কা লাগিয়ে দেব।

টুকটুকি ভেংচি কেটে পালিয়ে গেল। তারপর থেকে তারও মন খারাপ। চৌবেজীকে দেখলে সেখান থেকে কেটে পড়ে। জগন্নাথ তাকে ওপারে শহরে পাঠালে সে আঘাটায় জল ভেঙে চলে যায়। শীত যত যায়, জল তত শুকোয়। বালির চড়ায় মাথা কোটে। ওদিকে ঘাটের সামনে বারোমাস দহ। ফালতুকে বিয়ে করলে ঘাটোয়ারিজীর কেন সুখ হবে, টুকটুকি বোঝে না।

শীত ফুরিয়ে বসন্ত এল। রানীরঘাটের বনভূমি সাধ্যমতো সাজল। এবার নিষ্পত্র ঢ্যাঙা শিমুল শ্মশানে দাঁড়িয়ে রইল কিংবদন্তীর সেই রাহুচণ্ডাল। ভাগীরথীর বুকে ঘূর্ণি ঘুরে বেড়ায়। ভূতেরা নাইকুণ্ডল খোঁজে আপন-আপন। নাইতে গিয়ে টুকটুকি চেঁচায়—গবু খা, গবু খা, গবু খা! সেই সময় একদিন শম্ভু মাঝি থপথপ করে হেঁটে ফালতুর কাছে এল।

—কেমন আছিস বাপ ফালতু?

খাতির করে সিগ্রেট দিয়ে ফালতু বলল—ভাল আছি শম্ভুকাকা। তুমি ভাল তো?

রানীরঘাটের সবচেয়ে বড় আর বুড়ো শিরীষগাছের তলায় ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল শম্ভু মাঝি। —বাপ ফালতু রে!

—বলো কাকা!

শম্ভু মাঝি হঠাৎ গামছার খুঁটে চোখ মুছে বলল—জোয়ান হয়েছ। বড় হয়েছ। ভাল রোজগারপাতি করছ।

—তা করছি কাকা! ফালতু অকৃতজ্ঞ নয়। রানীরঘাটের এসব লোকই তাকে

মানুষ করেছে, সে জানে। সবাইকে শ্রদ্ধাভক্তি করে চলে।

—এবারে বিয়েটিয়ে করে ফেলো বাপ। আর কদিন আছি? ঘাটও তো উঠে যাচ্ছে। তোমার বিয়েটা দেখেই যাই।

ফালতু হাসল। —আমাকে কে মেয়ে দেবে শম্ভুকাকা?

বুড়ো ঘাটমাঝি তার গায়ে হাত বুলোতে থাকল। লাঁগধরা কড়াপড়া হাত। লোলচর্ম বাহু। গোঁফ ছাপিয়ে জল ঝরছে। কী স্নেহে কোন মায়ায় কাঁদে এতদিন বাদে, কে বলতে পারে সে গুহ্য কথা? —যদি ইচ্ছে করো, জগাইকে বলি। লজ্জা করে কী হবে? ঘাটে তো সবাই জেনেছে, তোমাদের বড্ড মনামনি ভাব। বুড়ো ঘাটমাঝি ফ্যাঁচ করে নাকই ঝেড়ে ফেলল, এমন আবেগ এসেছে।

ফালতু হো হো করে হেসে উঠল।—ধ্যাৎ! আমাকে কেন মেয়ে দেবে? কাকার আবার কথা!

শম্ভু গম্ভীর হয়ে বলল—দেবে। দিয়ে বর্তে যাবে। আমরা ঘাটশুদ্ধ গিয়ে ধরব। ঘাটোয়ারিজী বলেছেন, সবাই মিলে ফালতুর বিয়ে দেব। খরচ যা লাগে তিন ভাগ ওনার। খুব ধুমধাম হবে বইকি।···

সেদিনই একটু রাত গড়ালে চৌবেজীর গদিতে সভা বসেছে। পুরনো লোকেরা সবাই এল। জগন্নাথকেও ডাকা হল। সে-বেচারা কিছুই জানে না। দু হাত দু পাশে ছড়িয়ে শকুনের ডানার মতো ঝটপট করতে করতে কুঁজো হয়ে এল। এসেই অবাক। তার খাতিরটা বড্ড বেশি করা হচ্ছে। ধরাধরি করে তাকে উঁচু গদিতে উঠিয়ে দিল লোকেরা। মদন কণ্ডাক্টর এখন চুলপাকার দলে। ফালতুর ব্যাপারে সেই বরাবর লিড নিয়েছে। এবারও নিল। চৌবেজীর দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে কথাটা উঠুক ঘাটোয়ারিজী। সবাই সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চৌবেজী বললেন—জরুর।

মদন শুরু করল। ফালতুর মা সুরিক্ষেপী থেকেই শুরু করল। ফালতুকে মানুষ করার ইতিবৃত্ত, ফালতুর চালচলন, ইসমাইল ড্রাইভারের স্নেহ (আহা, এখন সে বেঁচে থাকলে কত খুশি হত, এবং কয়েকটি জিভের চুকচুক শব্দ, মাথা নাড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ), খুঁটিনাটি ঘটনা, অশ্বিনী দারোগার আহ্বান (খুব হাসির রোল পড়ে গেল এইতে), ফালতুর দুষ্টুমি—আধঘণ্টারও বেশি। তার সঙ্গে রানীরঘাটেরও নানা ঘটনা জুড়ে দেওয়া হল চারপাশ থেকে। ব্রিজও এল। রানীরঘাটের অনিবার্য মৃত্যুর প্রসঙ্গও উঠল (দীর্ঘশ্বাস ও নীরবতা) তারপর জগন্নাথের দিদি—যাকে সবাই বলত ময়রামাসি, তার কথা—এ পাপে রানীরঘাট একদিন ভেসে যাবে। তাই যাচ্ছে। আগের দিনের মানুষেরা যা বলত, ফলে যেত।

এই সময় চৌবেজী মানুষের লোভকেই দায়ী করলেন। তুলসীদাস আওড়ে বললেন, 'সেবক সুখ চহ মান ভিখারী / ব্যসনী ধন সুভ গতি বিভিচারী / লোভী জনু চহ চার গুমানী / নভ দুহি দুধ চহত এ প্রাণী।' মানুষ আকাশ দুহে দুধ চায়! হায় রে লোভ!

জগন্নাথ খুব মাথা নাড়ল। মদন কণ্ডাক্টর বলল—তো কথা হচ্ছে, ময়রা মাসির

কাছে শোনা কথা, (স্রেফ মিথ্যে কিন্তু) সুরিক্ষেপী মাসির আগের চেনাজানা ছিল। মাসির স্বজাতিরই মেয়ে। স্বামীর অত্যাচারে···

এ পর্যন্ত শুনেই জগন্নাথ জোরে মাথা নেড়ে বলল—না! না!

শম্ভু মাঝি একটু তফাতে মাটিতে বসে ছিল। বলল—আহা, বলতেই দাও জগাইদা!

মদন একটু হেসে বলল—মাসি আমাকে বলেছিল। সত্যমিথ্যে সেই জানত। আমি যা শুনেছি বলছি। আর স্বজাতি না হলে অমন সেবাযত্ন করত? বলুন সবাই! না কি ঘাটোয়ারিজী, বলুন?

সবাই শোরগোল তুলে বলল—ঠিক ঠিক। বেজাত হলে অমন করবে কেন?

জগন্নাথ গতিক বুঝে গুম হয়ে বলল—হলেও হতে পারে তাহলে।

মদন বলল—আমরা রানীরঘাটওয়ালারা ছেলেটাকে মানুষ করেছি। এখন লায়েক হয়েছে। ভাল কামাচ্ছে। লাইনের নামকরা ড্রাইভার। না হয় লেখাপড়াটাই ভুল করে আমরা শেখাইনি। তাতে কী? যে বিদ্যে ধরেছে, তাই বা মন্দ কী! বইপড়াও বিদ্যা, গাড়ি চালানোও বিদ্যা।

সবাই সায় দিয়ে বললে—একশোবার একশোবার।

মদন বলল—এখন তাহলে ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। ওর মা-বাবা নেই তো কী হয়েছে। আমরাই ওর মা-বাবা। আমরাই ওর বিয়ে দেব। চৌবেজী, আপনাকে তিন ভাগ খরচ দিতে হবে। বাকি এক ভাগ আমরা দেব। কী বলো জগাইদা?

আগে থেকে সব সাজানো ব্যাপার। জগন্নাথ না জেনে বলল—নিশ্চয় দেব।

এবার মদন আচমকা পর্দা তুলল। —ফালতুর স্বজাতের কনে রানীরঘাটেই আছে—উপযুক্ত কনে। মদন চাপা হেসে বলল, না কী চৌবেজী?

—জরুর।

মদন গলা ঝেড়ে বলল—আমরা সবাই জানি। সকালসন্ধ্যে দেখছি ওদের দুটিতে খুব ভাব-ভালবাসা। আমরা এখন বাকিটুকু ছেড়ে দিলুম কনের বাপের হাতে। বলেই সে চতুর হেসে জগন্নাথের কাঁধে ডান হাতটা রেখে সহাস্যে বলে উঠল—বলো জগাইদা।

আর যায় কোথায়? কুঁজো বুড়ো নড়বড় করে প্রায় ঝাঁপ দিল নীচে। তোবড়ানো মুখখানা যতটা পারে ভয়ঙ্কর করে চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল—ন্না। আবার ডানা ঝটপট করে গদির দিকে ঘুরে গর্জন করল—না! কক্ষনো না!

শোরগোল শুরু হল। সবাই ওকে বোঝাতে চায়। জগন্নাথের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। কাকুতিমিনতি কতরকম। সাধ্যসাধনা। জগন্নাথ দু হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে মাথাটা দুপাশে জোরে দোলাতে দোলাতে বলল—না না না! না না না! না না···

বুড়ো মানুষ অমন করে কাঁদলে বড্ড খারাপ লাগে। যেন জবাই করা হচ্ছে ওকে। অদ্ভুত লোক তো। দেখব কী দিয়ে বর জোটে মেয়ের।···

তখনও ফরাক্কার ফিডার ক্যানেল খোঁড়া হয়নি। বসন্তের শুরুতেই ভাগীরথীর জল শুকিয়ে জ্যোৎস্নারাতে বালির চড়ায় বসে যুবক-যুবতীদের চমৎকার প্রেম জমত। ওপারে শহরে বিদ্যুৎ, এপারে রানীরঘাটে বিদ্যুৎ—ভাগীরথীর গর্ভে সে আলো পৌঁছয় না। জ্যোৎস্নাটা ভালই খেলে। রানীরঘাটের নীচে অবশ্য কিছুটা দহ। দক্ষিণে শ্মশানের ওদিকটায় প্রায় সবই শুকনো, একখানে সেই মাথা কুটতে থাকা জল ঝিলমিল করে বয়ে যায় ফুরফুরে বাতাসে গা শিরশির করে। দুটিতে বসে অনুচ্চ স্বরে কথা বলছিল।

—ঘাটের কিসের মিটিঙ ডেকেছে। গেলে না যে?

—আমাকে ডাকেইনি।

—ডাকবে আবার কী? তুমি ঘাটের লোক নও?

—নাঃ। আমি ফালতু।

—শোন, তুমি এবারে একটা নাম নাও। ভাল নাম।

—তুমিই দাও না একটা নাম।

—নেবে?

—হুঁউ।

—আগে জানলে ওই গুনতিবাবুদের কাছে···আচ্ছা, ওরা আর লোক গুনতে আসবে না?

—কে জানে। কী নাম দিচ্ছ, দাও আগে।

—দিচ্ছি। নতুন বাসমোটর কবে আসবে তোমার?

—ব্রিজ খুলুক। কেন?

—প্রথম—একেবারে প্রথম পেসেঞ্জার আমি। ভাড়া দেব না কিন্তু। চাপাবে?

—হুঁউ।

—তখন থাকবে কোথায়?

—ওপারে নতুন আপিস হচ্ছে না? সেখানে। আমার থাকার ঘরও হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে আবার—বাবা ওখানে জায়গাই পেল না। লক্ষ্মণ দাদামশাইকে বলতে বলেছিল বাবা। বলেছি তো। সে কথা নেই, শুধু দেখলেই ফক্কুড়ি করে। তুমি বলবে একবার?

—বড় মুখ করে বললে যখন, বলব।

আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর—গুনতিবাবুদের কাছে তুমি বাবার নাম বললে না। আমার খুব খারাপ লাগছিল, জানো? যা হোক একটা বললেই পারতে। কী ভাবল ওরা?

—কী ভাববে? বয়ে গেল।

—যাঃ। বাবা না থাকলে চলে? বাবা না থাকলে···

—কী ?

—আমার লজ্জা করছে। তুমি হয়তো রেগে কাঁই হয়ে যাবে।

—না, না। বলোই না।

—থাক। তোমার বাবার কথা জানতে ইচ্ছে করে না ?

জোরে মাথা দোলাল এবং জ্যোৎস্নামাখা বালিতে আঁচড় কাটতে থাকল প্রেমিক যুবক। গায়ে ছায়া ফেলে উড়ে গেল একঝাঁক রাতের পাখি। শ্মশানের বাঁশবনে শেয়াল ডেকে উঠল। তার একটু পরে কী একটা শব্দ হল কোথায়। তারপর প্রেমিকা তরুণী উঠে দাঁড়াল ঝটপট। অস্ফুট স্বরে বলল—কে যেন আসছে। আমি যাচ্ছি। এদিকেই আসছে যেন। যাচ্ছি !

ডানা থাকলে উড়ে যেত এভাবে চলে গেল, যেন পা বালি ছোঁয় না। নিঃশব্দে। ফালতু উঠল একটু পরে। সিগারেট ধরাল। আলো দেখেই আওয়াজ এলো—কে ওখানে ?

ফালতু লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে বলল—জগাইকাকা নাকি ? আমি ফালতু।

—টুকটুকি কই ? হাঁড়ির ভেতর থেকে জগন্নাথ কথা বলল যেন।

একটু দ্বিধা হল। তারপর সেটুকু ঝেড়ে ফেলে বলল—কী হয়েছে জগাইকাকা ?

জগন্নাথ একটা অদ্ভুত ব্যবহার করল। সে খপ করে ফালতুর হাত দুটো ধরে ফেলল। তারপর মরণকালের ঘড়ঘড় শ্বাসকষ্টের আওয়াজ তুলে বলে উঠল—ফালতু বাবা ! তোর হাত দুটো ধরে বলছি রে, এ নিশুতি কাল। মা গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে বলছি। ঘাটওয়ালারা ষড়যন্ত্র করেছে, জোর করে তোর সঙ্গে আমার টুকটুকির বিয়ে দেবে। ফালতু রে ! আবার বলছি, মা গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে আছি—ওরে, তোরা ভাইবোন রে ! আমি মহা পাপী রে ! টুকটুকি আর তুই ভাইবোন—তোদের বিয়ে হয় না রে···

এক ঝটকায় ফালতু হাত ছাড়িয়ে নিল।

—আমি বলছি বাবা। নীচে মা গঙ্গা, আমি বলছি, আমার পাপের কথা।

ফালতু হুংকার দিতে গিয়ে সামলে নিল। সে জানে, সে দুঃখী। লোকের করুণায় বেঁচেছিল। জোর দেখাতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়। অমনি চুপসে যায়। আস্তে বলল—হতে পারে তুমি লম্পট। হতে পারে বইকি। আমার মা আটচালায় থাকত আর তোমারা রানীরঘাটওলারা···থাক সে কথা। এখন বয়েস হয়েছে তো। বুঝতে পারি সব। কেন আমাকে মানুষ করা, সবই বুঝি।

জগন্নাথ ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে পাছায় হাত মোছে। ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে কুড়াক ডাকতে ডাকতে একটা পেঁচা উড়ে যায় শ্মশানের পাশে শিমুলগাছটার দিকে। কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে একবার কেঁউ করে ডেকেই চুপ করে যায়। লেজ নাড়ে। জ্যোৎস্নায় নিজের ছায়া শোঁকে একবার।

ফালতু আবার বলতে থাকে—আজ পারুলিয়ার নতুন বুটে গাড়ি খারাপ হয়েছিল।

মিস্ত্রি ডাকতে পাঠালুম। মাথায় টুপিপরা, সাদা দাড়ি মুখে, এক মুসলমান হাজিসায়েব এল। চিনলেও চিনবে। ইব্রাহিম হাজি নাম বলল।

ভাঙা গলায় জগন্নাথ বলে—হ্যাঁ। ডাকাত ছিল। পরে তীর্থ করে হাজি হয়েছে। খুব চিনি বাবা, কে না চেনে। খুনের মামলায় জেল হয়েছিল যাবজ্জীবন। তাও জানি।

—কথায়-কথায় বলল, ঘাটে এক পাগলী থাকত—সে বেঁচে আছে, না মারা গেছে? বললুম, মারা গেছে। আমি তারই ছেলে। শুনেই লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরল। তুমি, তারই ছেলে বাবা? আমি তো অবাক। এমন কেন করছে লোকটা? তারপর কিছুতেই আসতে দেবে না। প্যাসেঞ্জার আছে গাড়িভর্তি। শোনে না। মিষ্টির দোকানে নিয়ে গেল। বলে—আমার ব্যাটাকে পেট ভরে রসগোল্লা খাইয়ে দাও। আমার কেমন যেন লাগল। আমি খেতে পারলুম না। সে আমাকে ছাড়বে না। জড়িয়ে ধরে টানাটানি। বলে, আশ্বিন মাসে ঝড়জলের রাতে···

এ পর্যন্ত শুনেই জগন্নাথ বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাতটুকু ওপারে মোক্তারবাবুর বাড়িতে লুকিয়ে থেকে পরদিন আদালতে হাজির হত। অত রাতে তখন খেয়া বন্ধ। শম্ভু গাঁজা খেয়ে মড়া। এদিকে ঝড়জল। ইব্রাহিম আমাকে জায়গা চাইল। খুনী ফেরারকে জেনেশুনে জায়গা দিতে পারলুম না। বললুম, আটচালায় গিয়ে থাকো বরং।

ফালতু সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল জোরে। সাদা কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে শুঁকল এবং ছ্যাঁকা খেয়ে ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক ঝাড়তে থাকল।—এতকাল পরে ওর খেয়াল হল সুরিক্ষেপীর কথা। ফালতু দম-আটকানো গলায় বলে উঠল।—ওই ছাতুখোর ঘাটোয়ারি। ওই মাতাল মদন কণ্ডাক্টর। আবার দেখি জগাইকাকা তুমি! তুমি আরও এককাঠি সরেস। কী না টুকটুকি আর আমি ভাইবোন। এবার ফালতু গর্জন কিংবা হাহাকার করে উঠল। —কী বাবা দেখাচ্ছো আমাকে সবাই মিলে। রানীরঘাটের মড়াখেকো শেয়াল-কুকুরগুলো ফালতুকে বাবা দেখাচ্ছে। আমার বাবার দরকার নেই। হুঃ, বাবা দেখাচ্ছে শালারা! আরে, আমার হাতে যে স্টিয়ারিং ধরে দিয়েছে, সেই আমার বাবা।···

ময়রা মাসি বলেছিল—এ মহাপাপ সইবে না। রানীরঘাট ভেসে যাবে। শেষ অবধি তাই ফলে গেছে। এখন ভাগীরথীর ওপর বিশাল ব্রিজ হয়েছে। ফরাক্কার ফিডার খাল থেকে জল আসছে। বারো মাস নদী কূলে-কূলে ভরা। সেই কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ কাজল-জল আর নেই। শ্যাওলায় গা ঘষে বেড়ানো রূপসী মৌরালার ঝাঁকও আর দেখা যায় না। রোদে-জ্যোৎস্নায় বুকের তলার রূপোলি বালুকণাও আর অলীক মুক্তোর ঝিলিক দেয় না। চৌবেজীর গদি, আটচালা, জগন্নাথের অন্নপূর্ণা টি স্টল জুড়ে আকন্দ সাঁইবাবলা কালকাসুন্দে আর বনতুলসীর জঙ্গল। সুরিক্ষেপীর 'থানে', বাসস্ট্যাণ্ডের চত্বরে, হরেকরঙা গাঁদা ফুলের ঝাড়। এক সাধু এসে আশ্রম খুলেছেন। পিচের রাস্তায় কবে কারা ধানচাষ করেই ফেলবে। বিদ্যুতের শালকাঠের খুঁটি যে যা পেরেছে উপড়ে নিয়ে গেছে। শুধু ঘাট আর শ্মশানের মাঝামাঝি জায়গায় সেই রাহুচণ্ডাল শিমুলটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখনও মাঘ মাসে সে মাথায় লাল পট্টি জড়াতে ভুল করে না।···

ওই একটু দূরে ষাট সত্তর ফুট উঁচু পুলের উপর দিয়ে ঝকঝকে এক রুপোলী বাস যাচ্ছে পুরন্দরপুর, মনসুরগঞ্জো, বিনোটি, মাহিমাপুর। ড্রাইভারটি মধ্যবয়সী। সারা পথ দুধারে যত গ্রাম আছে, যত মানুষ আছে, সবার কাছে তার মোটরগাড়ি সময় জানিয়ে দেয়। ক্ষেতের মুনিশ বলে ওঠে, ফালতুর গাড়ি গেল। নাস্তা এল কই? স্যাবে ধান শুকোতে দেওয়া চাষী বউ, ঘুটেকুড়ুনী মেয়েটা, খুঁটি ও দুরমুশ হাতে গাইগরু বাঁধতে আসা বুড়ী—কার সঙ্গে না কথা বলে যাবে সে। গাড়ির গতি কমিয়ে বলে যাবে—বোনটি ভাল আছ তো? ও বুড়ীমা, কাল দেখিনি কেন? ও বউঠান, মাছ রেখো তো চাট্টিখানি—ফেরার সময় নিয়ে যাবো। ওরা বলবে—ফালতুদার খবর ভাল তো? বাবা ফালতু, দুটো মাথাধরার বড়ি এনে দিস বাবা, আমার সোনার বাবা! বিনোটির মাস্টারমশাই স্কুল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বলবেন—ফালতু, প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে যা বাবা! এই নে টাকা। বেশি লাগলে দিস, দোব'খন।

ফালতু এখনো ফালতু নামেই থেকে গেছে। যে তাকে নতুন নাম দিতে চেয়েছিল, রানীরঘাটের জগন্নাথের মেয়েটা তার মতো নির্বোধ আর কেই বা ছিল। বাপ যেই না বলা, তোরা ভাইবোন—হতভাগী আপন দাদার সঙ্গে জ্যোৎস্না রাতে মা গঙ্গার বুকে শুয়েছে, এই তীব্র পাপবোধে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। বিষাক্ত করবী-ফল, কেউ বলে ধুতরো, শিলে বেঁটে গিলে ফেলেছিল। বাপ কোন মতলবে কী বলছে, বুঝবি তো তলিয়ে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই ফালতুর রাগ হয়। স্পিড বাড়ায়। পৃথিবীকে চাকার তলায় মাড়িয়ে শোধ নেয়।
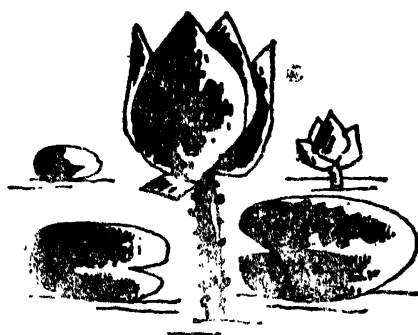
দেবেন পরামানিক

আবদুল আজীজ আল-আমান

আজও 'দেবেন কা' এসে বসল বটগাছটার তলায়। সেই পরিচিত জায়গায়, সেই পরিচিত ভঙ্গিতে ; তারপর ধীরে ধীরে পাশে রাখল যন্ত্রপাতি—একটা কাঁচি, বাঁটে সুতো বাঁধা একটা ক্ষুর, খানিকটা শ্লেট ভাঙা আর পিতলের একটা ছোট্ট বাটি। এই বাটিটা তার ঠাকুর্দার আমলের। ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন রসুনের খোলা। 'দেবেন কা' বলে যাদু করা বাটি। ঐ বাটির জলে চুল ভেজাও। চুল একেবারে গলে মোম। তারপর এই ক্ষুর দিয়ে মার টান—খদ্দের ঘুমিয়ে পড়বে। দাড়ি কাটা হ'য়ে গেলে জাগিয়ে দাও, তবে গিয়ে তোমার বাড়ি যাবে।

এতক্ষণে উপরের দিকটা খেয়াল হল দেবেন কা-র। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। কোত্থেকে একপাল বন-টিয়া এসে জুটেছে বটগাছটায়। তারা কিছুটা নীরব হ'ল। কিন্তু গোটা দুই কাক ঠিক ডাল চেপে বসে রইল মাথার উপর। কাল মুখুজ্যে মশাই চুল কেটে উঠতে যাবে—দিলে পিঠটা নোংরা করে। সুতরাং ও-দু'টোকে তাড়াতে হয়। আরও একটু জোর শব্দ করল দেবেন কা'। শব্দ শুনে ঘাড় নিচু করে পায়ের উপর ভর দিয়ে এমন একটা উড়ন্ত ভঙ্গি করল যেন এখুনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু নড়ল না। ঘাড় বাঁকিয়ে দারুণ সতর্ক হয়ে ঠায় বসে রইল চুপচাপ।

কে আসছে বটে।

চোখটা ছোট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল দেবেন কা। উত্তরপাড়ার করিম শেখের ছেলে আসলাম। কে জানে চুল কাটবে কিনা। নিকটে আসতেই এক গাল হেসে দেবেন কা শুধাল, 'কোথায় যাবে গ বাবাজী ?'

কথা বলার আগেই দেবেন কা মাথা দেখে নিয়েছে। চুল ঠিক কাটার মত হয়নি এখনও।

এবার কে আসবে কে জানে।

পথের দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকল দেবেন কা।

দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। খদ্দের একেবারেই কমে গেছে। ইটের উপর বসে আর কেউ চুল কাটতে চায় না। সবার বারমুখী টান।

বারমুখী টান!

নিজের মনে প্রশ্ন করে দারুণ সচকিত হয়ে উঠল দেবেন কা। নয়ত কী! এই ইটে উবু হ'য়ে বসে আর কে চুল কাটবে বল। পাকা রাস্তাটাই হল কাল। কি যেন আবার নাম—ন্যাশনাল হাইওয়ে। সকালে উঠে দলে দলে ছেলে বুড়ো এই বটতলা পেরিয়ে যাবে ওখানে। মোড়ে বসে চা গিলবে। তারপর বসবে গিয়ে সেলুনে।

সত্যই বড় খারাপ চলছে দিনকাল! কাল সারা দিনে মাত্র আশি পয়সা—একটা টাকাও পোরেনি।

তবুও দেবেন কা'র চোখে মুখে আজ খুশি খুশি ভাব। অন্যদিন এতক্ষণ দুটো-একটা খদ্দের না হলে অস্থির হয়ে পড়ত দেবেন কা। দশবার উঠত, দশবার বসত। বারবার পথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত, 'আজ নিগ্‌ঘাৎ উপোষ! সকাল টানেই যদি খদ্দের না হল—'

সেই উচাটন ভাবটা নেই আজ। কদিন ধরেই নেই। বিগত কয়েক দিন ধরে এই শুভ মুহূর্তটির জন্যে অস্থির হয়ে আছে দেবেন কা। মোটামুটি আদায় করবে। আর কিছু পরেই যাবে বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে। আঁতুড়ে মাথায় মারবে টান। একটু আদর করবে। তারপর মা-জননীর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, দুখানা কাপড়ের কম—

ঘোষ পাড়ার অনাথ এসে বসল। বসতে বসতে বললে, দাও তো কাকা ভাল করে ফেসিয়ান ছেঁটে।

স্পষ্ট দৃষ্টি মেলে তাকাল দেবেন কা। বেশ চেহারা হয়েছে ছেলেটার। উঠতি যৌবনের ল ল করা চেহারা। কিন্তু ফেসিয়ান ছাঁটার বাতিক কেন? শ্বশুর বাড়ি যাবার আগে ঐ ইটের উপর এসে বসে সুবল। কিন্তু অনাথ?

বেশ রহস্যজনক হাসি হেসে কাঁচি তুলে নিল দেবেন কা। তারপর পোঁচ চালিয়ে শুধাল কেন গা বাবাজী—যাবে কোতা?

অনাথের সখা নরেন এসে গেছে ততক্ষণে। বললে, গাঁয়ে বাস কর দেবেন কা—খবর কিছু রাখ না। ওকে যে আজ দেখতে আসবে।

ও তাই বল। এক গাল হেসে দেবেন কা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাঁচি চালায়। কাটতে কাটতে শুধোয়, তা ক'দিন চুল কাটনি গ—এযে একেবারে গয়ার মারির জঙ্গল—

নরেন হাসে কিন্তু অনাথ রাগ করে। বলে জঙ্গল বলে সব উপড়ে দেবে নাকি—দুমিনিটেই মাথা ব্যথা হয়ে গেল—

কেন বাবা, কেন বাবা। মুহূর্তে সমব্যথী হয় দেবেন কা। দেখবে আর লাগবে না। এই ত গেল হপ্তায় শান দিয়ে আনলুম।

এখন দেবেন কা স্থির দৃষ্টিতে মাথার দিকে তাকিয়ে। অত্যন্ত মনোযোগী। কাঁচি চালায় ধীরে ধীরে ; সাবধানে। এবং সাবধানে চালাতে গিয়ে অনুভব করে হাত কাঁপছে। আঙুলের ডগায় আগের মত কাঁচি আর নিথর হয়ে থাকে না।

বেল বাজতেই ঘাড় বাঁকিয়ে পথের দিকে তাকাল দেবেন কা। অনাথের ঘাড়টা নিচু করে ধরা। ঘাড়ের উপর শূন্য বাতাসে কাঁচিটা কিচ্ কিচ্ করছে সমানে। দেবেন কা দেখলে সাইকেল চড়ে বিমল যাচ্ছে চৌমাথার 'দি নিউ হেয়ার কাটিং সেলুনে'। গিয়ে চায়ের দোকানে চা গিলবে। তারপর—ফোঁস করে তপ্ত শ্বাস ছাড়ল দেবেন কা, 'আজ তুই বাবু হয়েছিস—না ? তোর বাবা এই ইঁটের উপর বসে বসে—'

একসময় শান্ত হয় দেবেন কা, যাগ্‌গে—যার যেখানে ইচ্ছে যাক। অনাথের চুল প্রায় কাটা হয়ে এল। কেবল ক্ষুরের কাজটুকু বাকি। আবার পথের দিকে তাকায় দেবেন কা। ডাকতে আসার সময় হয়ে গেছে। বাঁড়ুজ্যে বাড়ির লোক এই এল বলে।

আজ কদিন ধরে কত কথাই ভাবছে দেবেন কা। কি বলবে, কেমন ভাবে কতটা চাইবে। বাড়ির ত সবাই চেনা। আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বাঁড়ুজ্যে পরিবারে চুল কাটছে দেবেন। এই দেবেনের হাতেই হরি বাঁড়ুজ্যে বুড়ো হয়ে এল। মাথায় এখন মস্ত টাক—চুল কাটার দরকারই হয় না। তার ছেলে কমল হতে আতুড়ের চুল কেটেছে, তিন বছর আগে কমলের 'বর-কামান' করেছে। সেই কমলের ছেলে হয়েছে। আজ তিন পুরুষ ধরে দেবেন কা ওদের পরামাণিক। সুতরাং—

দুখানা কাপড়, পাঁচটা টাকা, পাঁচ সের চাল, পাঁচ পো ডাল—কি ডাল, মুসুর না মুগ—শূন্য বাতাসে দেবেন কা মাথা দোলায়—

বেশ চলছিল। ঐ পুঁচকে ছোঁড়া কোথা থেকে এসে দিলে দোকান। আবার নাম কি—না 'দি নিউ হেয়ার কাটিং সেলুন'। প্যান্ট পরে জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল কাটে। ঢঁট্ কি ! গদি দেওয়া চিয়ার, সাবান, স্নো, পাউডার—

ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো—

প্রথম প্রথম দেবেন কা-র সারা শরীরটা জ্বলে উঠত। মনে হত পুড়ে যাচ্ছে। এখন কেবল বিষণ্ণ চোখে পথের দিকে তাকায়।

মাথা, দাড়ি-গোঁফ কামান হয়ে গেছে অনাথের।

নগেন বলে, কামাতে হয় ত কামা দেবেন কা-র কাছে। তোর ঐ সেলুন-ফেলুন এসব কাজ করে না—

ভারি উৎসাহিত হয়ে ওঠে দেবেন কা, বগল হল গিয়ে নরম জায়গা—অনেকেই ওখানে ক্ষুর নিয়ে যেতে ভয় পায়। আর 'আঁতুড়ে কামান'—পারবে তোমার ঐ ফচকে ছোঁড়া। আজ দু বছর দোকান করেছে—কই একটা আঁতুড়ে মাথাতে হাত দিতে পেরেছে ? না কেউ ডেকেছে ? কেমন মন্দর বেটা মন্দ—কাটুক দেখি। কাঁচ মাথা—একেবারে

ফুলের মত নরম। সে ক্ষুর ধরাই আলাদা—শিখতে হয় বাবা, শিখতে হয়।

পয়সা মিটিয়ে উঠে গেল অনাথ।

আবার চুপচাপ বসে থাকল দেবেন কা। মাথার উপরে সেই কাক দুটো আবার এসে বসেছে। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে ও দুটোকে তাড়িয়ে দিলে। তারপর বটগাছের কোটর থেকে একটা মুড়ো ঝাঁটা বার করে চুলগুলো ঝেঁটিয়ে এক পাশে রাখলে। ওতে পা দিতে নেই। কত গুণীজনের মাথার চুল—

কিন্তু এখনও এল না কেন? আর দেরি করা ঠিক নয়। কচি বাচ্চা। এত বেলা করা অন্যায়। হঠাৎ বাঁড়ুজ্যে বাড়ির মানদারকে দেখে আশান্বিত হল দেবেন কা। পলকে নিচু হয়ে বসে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিলে। কিন্তু মানদারকে সোজা পথ বেয়ে মাঠের দিকে চলে যেতে দেখে বললে, শোন শোন—মাঠে যাচ্ছ যাও। কিন্তু এখুনি ফিরে এসে কচি নিমপাতা ভেঙে দিও। মা জননী যেন এক হাঁড়ি নিমপাতার গরম জল করে রাখে—

ভারি রাগ হল দেবেন কা-র। এরা সব মানুষ। বলি বেলা বারটার সময় কচি বাল্লোকের মাথা কামাবি—এ্যাঁ!

একবার ভাবলে এখুনি চলে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্মানে দারুণ ঘা খেল। না—কেন যাবে। এসব কাজে না ডাকলে যেতে নেই।

আজ কত কথাই মনে পড়ছে দেবেন কা-র।

সারা গ্রাম ভেঙে পড়েছে বিচার-সভায়। গভীর রাতে রায় বেরুল বিচারের। তখন সবাই ছুটল দেবেন কা-র কাছে। ডাঁটের মাথায় দেবেন কা বলে দিলে, এত রাতে যাব না। আবার লোক এল বিচারসভা থেকে। মোড়লের নাম করতে তবে উঠল দেবেন কা। বললে, পাঁচ টাকা চাই। তারপর বুক ফুলিয়ে এল বিচার স্থলে। সবাই তার প্রতীক্ষা করছে। সে নিজেও যেন একজন মোড়ল। কী? না পরের মেয়ের গায় হাত দিয়েছে হারামজাদা—দাও মাথা নেড়া করে।

তখন গর্ব ছিল, সম্মান ছিল, অর্থও ছিল!

সেই পরিচিত ভঙ্গিতে দেবেন কা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসল আবার। তারপর চেয়ে থাকল রাস্তার দিকে।

কে যায় বটে!

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে জ্বল জ্বল চোখে তাকায় দেবেন কা। অবিনাশ। চুল কেটে ফিরছে না? হ্যাঁ কামিয়েছে ত! বড় পয়সার গরম হয়েছে—না! তোর বাবা-ঠাকুর্দা এই অধমের হাতে মানুষ হল আর আজ তুই—

অবিনাশ!

শান্ত গলায় ডাকল দেবেন কা।

হাই স্কুলের ছাত্র অবিনাশ। কাছটায় এসে বললে, তোমার ও ইটালিয়ান সেলুন এখন অচল। তার থেকে বরং—

হৈ হৈ করে উঠল দেবেন কা, ও কথা বল না। কারটা সচল, কারটা অচল সে

ভগবান জানে। কিন্তু তোমার ও চুলটা কেটেছ কোথায়? সামনেটা তো ঠিক তেমনি, পিছনটাও তাই। একেবারে চুলের বস্তা। তা হলে কাটলে কি?

অবহেলার হাসিতে মুখ ভরিয়ে অবিনাশ বললে, এ হল গিয়ে কাকা 'উত্তমকুমার ছাঁট' —সারাজীবন যদি তুমি চেষ্টা কর তা হলেও—

কানের গোড়া দুটো রি রি করে ওঠে দেবেন কা-র। এক ফোঁটা ছোঁড়া—বলে কী? আজ যদি থাকত রে সেই দিন—

সেদিনও এখানে চুল কাটতে বসেছিল দেবেন কা। একজন কাটতে বসেছে—আরও জন চার-পাঁচ বসে আছে। তখন এখানে চারদিকে ইট ছড়ানো থাকত। ইট ছাড়াও গাছের শিকড় চেপে উবু হয়ে বসে হত্তে দিত কতজন। এল হরদয়াল সাঁপুয়ের ছেলে কৃপানাথ। হরদয়াল তখন সাঁপুই পাড়ার মাথা। দেড় শ বিঘে জমি নিজে চাষ করে হালে, তা ছাড়া ভাগে-ভিতেয় আছে আরও শ-খানেক। বললে, দেবেন কা—ফেসিয়ান।

সবার চুল কেটে তবে কৃপানাথের মাথায় হাত দিলে দেবেন কা, ফেসিয়ান ছাঁট চাই তাই হবে বাবাজী। এখন বস দেখি থির হয়ে। কাটা হয়ে যেতেই যে দু-চারজন দাঁড়িয়েছিল—হেসে উঠল সমস্বরে। ফেসিয়ান ত দূরের কথা, দশ আনা-ছ আনাও নয়—একেবারে আগে-পিছে সমান করে দিয়েছে। কটু ভাষায় গালাগালি দিলে কৃপানাথ। দেবেন কা-রও মাথা গেল গরম হয়ে। উঠে আচ্ছা করে দিল কান মলে। শুধু কান মলা নয়—বললে, ন মাসের ছেলে—তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে গলায় দুধ বসে যায়, তার আবার ফেসিয়ানর সখ। মারি টেনে এক চড়—

কৃপানাথ কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার কানে হাত দিয়েছ তুমি—চল বাবার কাছে—

দেবেন কা-ও বললে, চল্ তোর বাবার কাছেই বিচার হবে—

কিন্তু সাঁপুই পাড়ায় আসতে আসতে মুখটা শুকিয়ে গেল দেবেন কা-র, সত্যই কানে হাত দেওয়া ঠিক হয়নি। অতবড় মানী লোকের ছেলে, সম্মানীয় বংশ! কিন্তু কী আশ্চর্য সব শুনে হরদয়ালবাবু বললেন, শুধু তুমি কান মলে দিলে দেবেন—কেন সেখানে কঞ্চি ছিল না!

কী দিনই গেছে! চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে দেবেন কা-র। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেন নিথর হয়ে গেল!

নিমাই এসে বসল ইটে। দাড়ি কাটবে।

ভাল করে দাড়িটা ভিজিয়ে নিল প্রথমে। তারপর ক্ষুরটা খুলে উল্‌টি পাল্‌টি করল হাতের তালুতে। অবশেষে কপালে ঠেকিয়ে তবে পোঁচ দিলে দাড়িতে। দাড়ি কাটতে কাটতেও দু' একবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল দেবেন কা। এতবেলা হল, অথচ—

যন্ত্রণায় কাৎরে উঠল নিমাই।

আহা-হা, সমব্যথী হল দেবেন কা, লাগল নাকি গ বাবাজী?

অসহিষ্ণু গলায় নিমাই উত্তর দিলে, লাগবে কেন? দেবেন কা একদিকে টানছে, যমে একদিকে টানছে। আরামে ঘুমিয়ে পড়ছি আর কি—

নিমাইকে ছেড়ে দিয়ে শ্লেট ভাঙাটা নিয়ে বসল দেবেন কা। জলে ভিজিয়ে ক্ষুর ঘযছে। আহা—কাঁচ ফুলের মত মাথা!

নানান ভঙ্গিতে ক্ষুর ঘষে আর মাঝে মাঝে আঙুলের আগায় পরখ করে মাঝে মাঝে আশান্বিত দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকায়। মাঝে মাঝে ঘাড় উঁচু করে ডালপালার ভিতর দিয়ে সূর্য দেখার চেষ্টা করে।

কি ব্যাপার—এখনও আসে না যে! না আসুক—তা বলে আঁতুড়ে চুল যেচে কাটতে যাবে না!

এদিকে আর বসে থাকা যায় না। দুপুর হয়ে গেছে। বাড়ি যেতে হয়। যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নেয় দেবেন কা। তারপর অহেতুক পা ঘষে। হৈ হৈ করে অনর্থক কাক দুটিকে তাড়া করে। বটের শীর্ষে বনটিয়ারা এখন নিশ্চুপ। একটু আগে এই বট আর ঐ ঝাউয়ের মাথায় দুটি ঘুঘু পাখি বসে দীর্ঘলয়ে আলাপ করছিল। তারাও থেমে গেছে এখন। পথঘাটও আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে এল। সব দেখতে দেখতে কয়েক পা এগিয়ে গেল দেবেন কা। কি মনে করে আবার ফিরে এসে বসল সেই নির্দিষ্ট জায়গায়। বসেই থাকল।

বড় রাস্তা থেকে দুজন লোক ফিরল। সড়ক বেয়ে বিড়ি টানতে টানতে তারা এগুচ্ছে। দেবেন কা দেখল ওরা চুল কেটেছে। পিছনে ঘাড়ে, কানের দু' পাশে পাউডারের ছোপ। দাড়ি কামিয়ে ডেটল না কি একটা লাগিয়ে দেয়। বাতাসে তারই ফিকে ফিকে গন্ধ।

দেবেন কা-র নাকটা এই মুহূর্তে দারুণ গন্ধলোলুপ হয়ে ওঠে। দারুণ সতর্ককতার সঙ্গে বাতাসে কি যেন অন্বেষণ করে আর ঘৃণা ভরে থু থু ফেলে, ছোহ্—বাবার জন্মেও ত এসব দেখিনি।

দেবেন কা!

উঁ! মুখ তুলে তাকিয়ে পুলকে-উল্লাসে ব্যাকুল হয়ে উঠল দেবেন কা। ক্ষণিক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল তাই দেখতে পায়নি। আজ তিন দিন ধরেই ত এই শুভ মুহূর্তের প্রত্যাশা। যন্ত্রপাতি গোছানই ছিল হাতে নিয়ে বাঁড়ুজ্যে বাড়ির ছেলেটাকে বললে, তা বাছা এত দেরি করলে কেন গ?

ছোট ছেলেটা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বলে, বারে—কাকা ত তোমার জন্যে সেই ককোন থেকে বসে রয়েছে।

তাই বুঝিন!

দেবেন কা দারুণভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠে, চল—চল।

ছোট ছেলেটা নিবিড় হয়ে দেবেন কা-র হাত ধরে। বলে, জান কাকা—তোমার জন্যে এই এত আলু, এত্তো ডাল, নতুন কাপড়—

বল কী গ? চল—চল।

মনে হয় যেন চারটে পা গজিয়েছে দেবেন কা-র। বাকি পথটুকু মুহূর্তে চলে এল। সত্যিই ছেলেটা মিছে বলেনি। বংশের প্রথম আলো। নতুন কাপড়, কুলো ভরা চাল,

ডাল, আলু আর ঝকঝকে রুপোর টাকা—একটা নয়, তিনটে। বৈঠকখানাতেই বসে অপেক্ষা করছিল সকলে—বাঁড়ুজ্যেবাবু, কমল, কয়েকজন আত্মীয়স্বজন আর ছেলেপিলের দল—

বাঁড়ুজ্যেবাবুই, হাসতে হাসতে প্রথমে কথা বললেন, কি গ দেবেন—মনঃপুত হল ত ?

দেবেন কা'তখন লুব্ধ দৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়ে। বললে, আমি ত জানি গ—মা জননী কিছুতেই বৈমুখ করবে না—

ঐ নতুন কাপড়টাতেই সব বেঁধে সেধে নাও দেখি। বড্ড দেরি করে ফেললে।

ততক্ষণে বাঁধাবাঁধি আরম্ভ করেছে দেবেন কা। মহাখুশি, সত্যই এতখানি সে আশা করেনি। বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল দেবেন কা। তারপর দারুণ খুশিতে মুখ উজালা করে বললে, চল গ বাবাজী—আগে আমার মানিকের—

যেন রজনীর প্রারম্ভ হতে সহস্র ঝাড় লণ্ঠনের অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় সমগ্র জলসাঘর আপন গরিমায় ঝলমল করছে। দেবেন কা সেই জলসা ঘরের মূল গায়েন। অমূল্য সাজে সজ্জিত হয়ে আপনভোলা গায়েন সেই সভামণ্ডে প্রবেশ করছে। জলসা নীরব। এবার শুরু হবে মহাসংগীত—

বাঁড়ুজ্যেবাবুই কথা বললেন, পরেশের বাচ্চাটা আজ দু মাস ভুগছে। তুমিই ত কামিয়েছিলে—সেপ্‌টিক হয়েছে। তাই কাজটা সেলুনের ছেলেটিকে দিয়েই করিয়ে নিয়েছি—

মুহূর্তে ম্লান প্রাণহীন একটা শবে পরিণত হল দেবেন কা। অকাল বৈশাখীর উত্তাল উন্মত্ত ঘূর্ণিতে ঝাড় লণ্ঠন বিচূর্ণ হয়ে গেল। মহাঅমাবস্যার অতল অন্ধকারে সমগ্র জলসা জুড়ে ভয়ঙ্কর কুৎসিত প্রেতাত্মার তা থৈ নৃত্য শুরু হয়েছে। ন্যুজ দেহটাকে আস্তে আস্তে সোজা করে দেবেন কা একবার করুণ চোখে বৈঠকখানার দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে ন্যুজ দেহ আরও ন্যুজ হয়ে গেল। বেশ কিছু পরে মূক দেবেন কা দানসামগ্রীগুলি কম্পিত হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির পথে পা বাড়াল। সবার অলক্ষ্যে সজল চোখে চোখ দুটি একবার মুছে নিল। তারপর বাঁড়ুজ্যেদের আম বাগান পার হতে হতে এতিম কাঙালের মত শব্দ করে একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তার মনে হল, ক্ষৌর কর্মের এই সুদীর্ঘ জীবনে এমন নিষ্ঠুর অপমান তাকে আর কেউ কোন দিন করেনি।

মানুষ মানুষের জন্যে

আবদুল জব্বার

শ্রাবণের আকাশ আঁধার মেঘে ঢেকে যাওয়ার পর মুষলধারে বৃষ্টি নামলেও পাকা রাস্তা থেকে পাড়ার ভাঙা ইট পাতা আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি ছোটালো জাহেদ আলি। ঘোড়াটার পেটে এখন খিদে, ঘরমুখো হয়েছে, তাই কাঁধে জোর দেয়ও খুব। দু'মাইল দূরের হাটে ভোরবেলা থেকে আটক্ষেপ মাল বয়ে ঘোড়া আর সাঁইস দুজনেই ক্লান্ত। সারাদিন খুব কড়া রোদে ঘামের দরিয়া বয়ে গেছে। একাগাড়িতে প্রতিবারে কুড়ি-পঁচিশ মণ করে মাল নিয়ে গেছে। কাঁটাল, আমের ঝুড়ি, সবজি, চালের বস্তা শেষবেলায় কিনা শ্মশানে-দাহ-করতে-যাওয়া একদল মাতাল আর মড়া। মুসলমানের একায় হিন্দুর মড়া তুলতেই হল। খালিগাড়ি দেখে ওরা ধরেছিল। জাহেদ আলি নারাজ। তার মড়া বওয়ার গাড়ি নয়। মড়া বইলে অন্য ভাড়া পাওয়া যাবে না। একজন বলল, 'আমাদের দায় থেকে উদ্ধার করো ভাই—বারোজন লোক আর এই মড়াটা। জাত-বিজাত ভাবলে আমরা বাধ্য করব। সেকুলার দেশ। যা ভাড়া চাও দোব।'

'খুন-জখমের বা বেআইনী মড়া লয় তো?'

'লয় লয়, লে যাও চাচা। এক পাঁট মালও দোব।'

'তোবা তোবা!'

ওরা উঠে পড়ল। ঘোড়াকে আটকে পথরোধ করেছিল দুজন ছোকরা। নেশায় লাল চোখ। মড়াটার মুখ খোলা। বুড়ো মানুষ। গায়ে অনেক ফুল।

'কুড়ি টাকা দিতে হবে।'

'হাঁ—হাঁ—' সবাই রাজি। 'বলো হরি, হরিবল, হরি…।'

শান্তিপুরের তাঁতিপাড়ার রাস্তার দু-পাশের মুসলমান তাঁতিরা সবাই দেখেছে জাহেদ

আলি হিন্দুর মড়া নিয়ে ভাগীরথীর ঘাটে চলেছে। তারা ভাববে লোকটার আর 'ইমান' (ধর্মবিশ্বাস) বলে কিছু নেই।

কিন্তু এদেশে বাস করতে গেলে মিলেমিশে চলতে হবে তো। হরিধ্বনিটা অবশ্য ওরা একটু বেশিই দিচ্ছে ইচ্ছে করে মুসলমান পাড়া দেখে আর সহিস চাচাকে রাগাবার জন্যে। একজন বলল, 'কি করব চাচা, মালদার পার্টি, খুব মাল খাইয়েছে। কলেরা রোগী। চিতায় আগুন দিলেই সুদখোর বুড়ো খ্যান পেয়ে ঝেড়েমেড়ে উঠলেই সোটানি। গলা কাঁটাল খেয়ে পেট নাবিয়ে মরেছে বেচারা। ভাবলেও কান্না পায়।...'

কুড়ি টাকাই দিয়েছিল ওরা। দাড়ি ধরে একটু চুমোও খেল।

বৃষ্টিতে এখন গাড়ি ধুয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটা ভিজে কালো কুচকুচে হয়ে উঠেছে। ট্যাকে আজ এক বাণ্ডিল টাকা। ষোল, আঠারো, কুড়ি, পনেরো, আঠারো, কুড়ি, সতেরো, কুড়ি। মনে মনে যোগ দেয় জাহেদ। আকাশ কড়কাতে থাকে। সন্ধ্যা নেমে গেছে। ফাঁকা মাঠের পথ। ঘন ঘন আকাশ-চেরা বিজ্‌লি ঝলক দিয়ে বাজ পড়তে লাগল। ফাঁকা মাঠে হালগরুর ওপরেও বাজ পড়ে—তাই জোর গাড়ি হাঁকালো জাহেদ। বৃষ্টিও প্রচণ্ড জোরে নেমেছে। তার সঙ্গে ছুটে এলো আবার ঝড়ঝাপটা।

মালঞ্চ জুনিয়ার হাই স্কুলটার সামনে বকুলতলাটার নিচে এসে গাড়ি দাঁড় করালো জাহেদ। নেমে উঠে গেল স্কুল বারান্দায়। ট্যাকের টাকাগুলো ভিজে গেছে। কয়েক-জন লোক বসে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যেতে সমস্ত বাড়ির তাঁত চলা বন্ধ হয়ে গেল। আলোর অভাবে সরু সুতোর কাজ করা যায় না।

একটা মেয়ে বলল, 'আমাকে নিয়ে যাবে ঐ হেঁতালখালির বোষ্টমপাড়ায়?'

'ওখান দিয়েই তো আমি যাব। ভাড়া দিতে হবে।'

'কত?'

'এক টাকা।'

'হাঁ! আট আনা দোব।'

জাহেদ আলি আর কিছু বলল না। এক বাণ্ডিল টাকা ভিজেছে। হপ্তার দুদিনের হাটবারেই যা তার একটু বেশি উপায়। তবে গাড়ি তার বন্ধ যায় না। মোটরের চাকা লাগানো ঠেলা আর রিক্শাভ্যানেও অনেকে মাল বয় এখন। লরীর পর ম্যাটাডোর উঠেছে। শাড়ির গাঁট তারাই নিয়ে যাচ্ছে বেশি। রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর—সর্বত্র চলেছে।

এক্কাগাড়ি উঠে যাচ্ছে।

জাহেদ আলিদের চোদ্দপুরুষ এই এক্কাগাড়িই চালিয়ে আসছে।

হাটবারের উপায় হলেই তার সংসার চলে যাবে।

লোকজন চলে যায় ঝড়বৃষ্টি ধরে আসতে। জামা খুলে নিংড়ে গামছায় গা-হাত মুছে নিয়েছে জাহেদ। নেমে পড়ে এবার সেও।

বোষ্টমপাড়ার মেয়েটি যেন অসহায়ভাবে বলে ওঠে, 'আমাকে নিয়ে যাও। আঁধার রাস্তায় এতদূর যেতে আমার ভয় করবে।'

'এসো, উঠে এসো।'

মেয়েটা নেমে এসে হাত বাড়ায়। ঘোড়া ছটফট করার ফলে চাকা-দুটো গড়াচ্ছে। তার পাকিতে পা দিয়ে ওঠাও মুশকিল। আঠারো বছরের শাড়ি পরা মেয়েটা তার যৌবন-প্রকট চেহারা নিয়ে তবুও চাকার পাকিতে একটা পা রেখে অন্য পা-খানা গাড়িতে রাখতেই ঘোড়া আকস্মিক হেঁচকা টান মারল। মেয়েটা মুখ গুঁজে পড়ে যেত যদি জাহেদ না পাঁজা করে ধরে ফেলত।

মেয়েটা লজ্জা পেল। হাসতে লাগল। তার এখন যেন কত আনন্দ। অন্ধকারে বাঁশ-কাঁঠাল বাগান, শ্মশানচর পার হয়ে একা তো আর যেতে হবে না।

গাড়ি চলতে লাগল। জনবসতি পার হয়ে এলো।

'কার মেয়ে তুমি?'

'নন্দ অধিকারীর।'

'কোথা গেছিলে?'

মেয়েটা কিছু বলল না। শুনতে পায় না নাকি? আবার জিজ্ঞেস করতে বলল, 'মাসির বাড়ি।'

মেয়েটার নাকটা যেন একটু খাটোমতো। ঠোঁট-দুটো মোটা আর পুরুষ্ট। বুকভরা দুরন্ত যৌবন। ভিজে গেছে কাপড়চোপড়। সপসপ শব্দ করছে। চেপে বসেছে সে সহিসের কাছ থেকে হাত-দুয়েক দূরে চাকা বরাবর।

'দুর্ভাগ্য শালা, এই গাড়িতেই কলেরা রোগী নিয়ে যেতে হল।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠে কাছে সরে এলো মেয়েটা।

'ভয় পাবার কিছু নেই—গাড়ি সব ধুয়ে গেছে।'

'ঐ যে সব ফুল পড়ে আছে। একটা মালাও।'

'গলায় দিয়ে দোব তোমার?' ছড়ি দিয়ে মালাটা তুলে নিল জাহেদ। মড়ার গায়ের মালা। মাতালদের টানাটানিতে পড়ে গেছে কখন।

'দোব, গলায় পরিয়ে দোব?'

'না না, ছিঃ! ফেলে দাও।'

'ফেলে দিলে যদি এই মালার সঙ্গে মড়ার আত্মাটা উঠে আসে!'

'ভয় দেখিও না আমাকে, সহিস-ভাই!' গায়ের কাছে ঘন হয়ে আসে মেয়েটি। মালাটা একটা পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জাহেদ। বলে, 'আজ শালা 'আমাবস্যে'র অন্ধকার।'

'ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার যেন শীত করছে। কাঁপুনি পাচ্ছে।'

'জ্বর হয়েছে তাহলে। দেখি গায়ে হাত দিয়ে।' গালের ওপর হাত রাখল জাহেদ। যুবতী মেয়ে। আগুনের কুণ্ড। বলল, 'তাই তো! জ্বর নাকি তোমার? কাঁপছ কেন

এমন ? ভিজে কাপড়চোপড় নিংড়ে ফেল। অন্ধকার—কেউ দেখতে পাবে না।'

ঘোড়াটা হঠাৎ হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। কয়েকটি শিয়াল পথের ধারে মরা গরু খাচ্ছিল।

বাঁশবনের মধ্যে জমাট অন্ধকার। কেবল ঘোড়ার পায়ের টকাটক টকাটক শব্দ।

'তোমার নাম কি ?'

'ডালিম।'

চুল নিংড়াতে থাকে ডালিম। গায়ের সপসপে ব্লাউজ খুলে পাক দিয়ে নেংড়ায়। বুক-বাঁধাও খুলে ফেলে। শাড়ির খানিকটা অংশ নিংড়ে চুলে পাক দেয়।

গাড়ি আস্তে আস্তে চালায় জাহেদ। একটু সরে গিয়ে মেয়েটা ভাল করে কাপড়-চোপড় নিংড়ে আবার পরে এসে বসে।

ঘোড়াকে এবার তাড়া লাগায় জাহেদ। শুধোয়, 'এত রাত হয়ে যাচ্ছে, তোমার মা-বাবা ভাববে না ?'

'আমার বাপ নেই।'

'ক' ভাই-বোন ?'

'চারজন। দুই বোন দুই ভাই আর মা। আমিই বড়। আমার পরেই আমার বোন। ভাই দুটো ছোট। স্কুলে পড়ে। মা ফুল কিনে শহরের দোকানে দিতে যায়। জ্বর হয়েছে—যেতে পারেনি। তাই আমি দিতে গেছিলুম।'

'তাহলে মাসির বাড়ি যাওনি ?'

'না।'

'তোমাদের কষ্টের সংসার ?'

'হ্যাঁ। আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়ে জন্মাতাম—যা হোক করে সংসার চালাতাম। গরিব মেয়ের পণ না দিতে পারলে বিয়ে হয় না।'

'ছেলেরাও আজকাল বেকার আছে অনেক। দিনকাল বড় খারাপ চলেছে এখন। এই যে নদীর ধারের আর একটা শ্মশানঘাট দিয়ে যাচ্ছি, আগে আমাদের ছেলেবেলায় নাকি অনেকে দেখেছে কলসী গড়াগড়ি যেত। মড়ার মাথা থেকে বাঁশি বাজত।...'

'চুপ কর তো তুমি। মা দুর্গা, মা কালী।'

'একবার কি হয়েছিল শোন, আমার ঠাকুরদা আমার মতোই এমনি একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রাতকালে বৃষ্টির পর সারাদিন গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে ফিরছিল। পথ ভুল করে তারা নাকি কেবলই এই শ্মশানের গোলাকার পথে ঘুরেছিল। আসলে গাড়িতে যে উঠেছিল সে ছিল নাকি একটা শাঁকচুন্নি। গায়ের কাপড়ে ছিল তার আঁশটে মাছের গন্ধ। বলেছিল—মাছ বেচে ফিরছি।'

'দোহাই তোমার, আমাকে ভয় দেখিও না। মায়ের জ্বর—কখন ফিরব ? সবাই মুখ চেয়ে বসে আছে। হ্যাঁগো ও সহিস-ভাই, এ তুমি কোন্ দিকে এলে ? এটা তো নয়নচকের বিল—'

গাড়ি দাঁড় করায় জাহেদ আলি। বলে, 'বটেই তো—কেন পথ ভুল হল? মড়া নিয়ে যাবার পর—আচ্ছা, তুমি কি সত্যিকার মানুষ—ভূত-পেত্নী অন্য কিছু নয় তো!'

'না না, আমি মানুষ সহিস-ভাই।'

'না, আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি নেবে যাও। দোহাই! আমার তিরিশ বছর বয়স। দশ বছর গাড়ি চালাচ্ছি শান্তিপুর এলাকার গ্রামাঞ্চলে। কখনো ভুল হয় না। আজ এমন কেন হবে? শালা, ঐ হরিধ্বনিতেই আমার মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল। তুমি সত্যি মানুষ—মেয়েমানুষ?' ভয় মেশানো অদ্ভুত গলায় জাহেদ আলি কথা বলতে লাগল।

'হ্যাঁ সহিস-ভাই, আমাকে ছুঁয়ে দেখেও বুঝতে পারলে না?'

'আলো থাকলে দেখতাম তোমার ছায়া পড়ে কিনা। তোমার চুল পুড়িয়ে দেখতাম পোড়ে কিনা।'

'কি মুশকিল. চলো তো এখন—হেঁয়ালি করো না। আসলে তুমি ভুলপথেই একলা যুবতী মেয়ে পেয়ে এনেছ!'

'কি বলছ তুমি, ভাল করলে মন্দ হয়? নেবে যাও তুমি, তোমাকে ভাড়া দিতে হবে না।'

'তুমি কি মানুষ! একটা অসহায় মেয়েকে এই শ্মশানচরের নির্জন জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যাবে? বাঘের ভয়ে আমি কুমীরের গালে পড়েছি! আগেই ভাবা উচিত ছিল একজন মুসলমানের গাড়িতে একা হিন্দু মেয়ে অন্ধকার-পথে যাব কিনা।'

'হুঁ। মুসলমানের গাড়িতে তবে হিন্দুর মড়া তুলল কেন? ভাল শালা ল্যাঠায় পড়লাম! গাড়ি ঘোরাবোই বা কি করে এখানে? আরো এগিয়ে যেতে হবে। চল—হিস হিস···'

কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর একটা পল্লী শুরু হল। আলো দেখতে পেল। একজন বুড়ো লোককে ডেকে শুধোলে জাহেদ, 'ও দাদা, এটা কোন্ গ্রাম?'

'অনন্তপুর।'

'ওরে শালা. কোথা এসেছি!' জাহেদ গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার যে পথে এসেছিল সেই পথে ছুট করালো। বলল, 'এটা ডাকাত পাড়া! এই শ্মশানের এমুখে বহু খুন, লুটপাট হয়েছে। সঙ্গে আমার আবার অনেকগুলো টাকা রয়েছে!'

মাথাটা বড্ড ধরেছে। কনকন করছে। জ্বর হয়েছে বোধহয় ডালিমের। শুয়ে পড়ল সে। বসে থাকলে শ্মশান বাঁশবন ঝাউবনের শনশনানি নড়াচড়া চোখে পড়ে। তাকে কেউ টেনে তুলে নেবে না তো!

জাহেদ আলি মনে মনে কল্‌মা পড়ল কিছুক্ষণ। আল্লার বাণী পড়লে ভূতের বাবাও ছুঁতে পারবে না।

তেমাথানি একটা পথ। কোন্ দিকে যাবে?

'ডালিম! ও ডালিম!' গায়ে হাত দিল জাহেদ। 'এ কি, গা যে তোমার পুড়ে যাচ্ছে!'

'দুপুরের রোদে পুড়েছি, আবার বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর এসেছে। কাঁপ্‌নি ধরেছে আমার।'

'কেউ নেই এখানেও। কোন্‌ দিকের পথে যাব? ডানদিকেই যাই।'

কিছুক্ষণ আসার পর জাহেদ পরিষ্কার বুঝতে পারল বিকালে যে শ্মশানটায় মড়া নামিয়ে দিয়ে গেছিল সেখানেই এসেছে।

ঐ তো মন্দির! চিতার আগুন বৃষ্টির জলে নিভে গেছে।

সাধুবাবা হাঁক মারলেন, 'মড়া আছে?'

'না···তোমাকে এই হিন্দু সাধুর আশ্রমে রেখে যাব ডালিম।'

'না। বরং তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও।'

'আমার যে বউ আছে। সে তোমাকে দেখে কি বলবে! পথ আর ভুল হবে না। পাকা রাস্তায় এসে গেছি। বরাবর এবার পাকা রাস্তা দিয়ে যাব।'

'হেঁতালখালির বোষ্টমপাড়ার কাছ দিয়ে যেতে পারবে না?'

'আল্লা জানে কী আছে কপালে!'

টকটক টকাটক—টকটকাটক—কেবলই পাকা রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ঘোড়াটা মাঝে মাঝে চিঁহি চিঁহি করে ডাক ছাড়ে।

মুসলমানের গাড়িতে ওঠার আগে হিন্দুর মেয়ের ভাবা উচিত ছিল। কেন এই অবিশ্বাস? মেয়েটা তাহলে ভাল? পেটের দায়ে দু-নম্বরী করে বেড়ায় না? ভাবছিল জাহেদ।

উত্তরবাংলা যাবার স্টেট বাস চলে গেল। তার আলো পড়তে ডালিমকে দেখল জাহেদ।

ললিত শ্যামবর্ণের মেয়েটির শরীরে যৌবনের উদ্দাম জোয়ার যেন কূল ছাপিয়ে পড়ে প্লাবন বওয়াতে চায়।

মালঞ্চ স্কুলের কিছুদূরে এসে বাঁশবনের অন্ধকারে দুটি পথ একটা বড় পুকুরের দু-পাড় বেয়ে আবার দু-দিকে চলে গেছে। তখনই উল্টোপথে চলে গিয়েছিল। সোজাপথে এলে হেঁতালখালির বোষ্টমপাড়া দিয়েই আসত। মেয়েটারও ভোগান্তি। কখন আজ ভোরবেলায় বেরিয়েছে জাহেদ আলি, তার বউ জয়তুন বিবি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে দুটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে!

পাকা এই সড়ক থেকে মাইল দুয়েক ভেতরে গেলে তবে পাবে হেঁতালখালির বোষ্টম পাড়া। সেখানে অনেক সব গোঁসাই।

যদি বাড়িতে নিয়ে যায়, জয়তুন কি বিশ্বাস করবে এই মেয়েটাকে ভোগ করেনি? মুসলমান পুরুষকে কি বিশ্বাস করা যায়? জয়তুন তো জানে তার স্বামী কি রকম অসংযত-যৌবন। ষাঁড়ের মতন! কথাটা ভাবতে হাসি পেল জাহেদের।

দু-ঘন্টা যদি দেরি হয়ও, তবু সংসারে অবিশ্বাস আর অশান্তির (মিথ্যে) বীজ বুনে লাভ কী? মেয়েরা মেয়েদের কিছুতেই বিশ্বাস করে না। জানে বোধহয় নিজেরা সবাই সাপিনী।

'ডালিম !' ডাকল জাহেদ।

'দাদা !'

'বাড়িতে দিয়ে আসছি তোমাকে।'

'আমাদের বাড়িতে থাকবে আজ ?'

'আমি মুসলমান। তোমার বদনাম হবে।'

'আমরা বৈষ্ণব। জাতধর্মের ওপরে। আমাদের কাছে সবাই সমান। শ্রীচৈতন্যের মুসলমান ভক্তও ছিলেন।'

'তবে যে বলেছিলে মুসলমানের গাড়িতে ওঠার আগে ভাবা উচিত ছিল !'

'রাগে ধিক্কারে বলেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো সহিস ভাই।' উঠে বসল ডালিম। হাই ভাঙল। মাথার চুল গুটোলো। বলল, 'হাঁ, এবার ঠিক পথে যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ গাড়ি চলল।

জাহেদ আলি বলল, 'আজ পয় ভাল ছিল, উপায়ও বেশি হল—শেষটায় কেন যে এমন ভূতে ধরল ! পথ ভুল করে শালা ভোগান্তি !'

হঠাৎ হিহি করে হেসে উঠে মুখ ঢাকল ডালিম।

'হাসছ কেন ?' শুধোল জাহেদ।

'পথে আমাকে ভূত না পেত্নী বলছিলে !'

'ভয় পেয়েছিলাম। পুরনো গপ্প মানুষের মনে দানা বেঁধে থাকে।'

'নামিয়ে দিয়ে এলে কি হতো ?'

'না, তা কি পারতাম ! ঐ তোমাদের হেঁতালখালির বোষ্টমপাড়া। ডালিম, তুমি লেখাপড়া জানো ?'

'ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলাম। কেন ?'

'তোমার জন্যে একটা বর দেখব ?'

ডালিম কিছু বলল না। এতক্ষণে অন্ধকারে হারানো তাদের গ্রামটাকে পাওয়া গেছে। বলল, 'সহিস-ভাই, তোমার নাম কি—কোথায় বাড়ি ?'

'আমার নাম জাহেদ আলি। গ্রাম—সীতারামপুর।'

বৈষ্ণবপাড়ায় এসে গাড়ি বাঁধল। হ্যারিকেন নিয়ে যে মধ্যবয়সী বিধবা আর চোদ্দ বছরের মেয়েটি বেরিয়ে এলো তারাই যে ডালিমের মা বোন, জাহেদ আলি তা বুঝতে পারল।

'ডালিম ?'

'হাঁ মা।'

'এত রাত হল কেন ?'

'চলো বলছি। এসো জাহেদ ভাই। একটু চা খেয়ে যাও। বোনের যখন বর খুঁজে দেবার কথাও বললে, সম্পর্ক একটু থাকবে না ?'

জাহেদ আলি ভেতরে এলো। ইটের পিলার দেওয়া টালির ছাউনির একখানা বাড়ি

আর উঠোনপারে উনুনশালা। দাবার তক্তাপোশে বসল জাহেদ।

ডালিম মাকে সব কথা জানাতে মা খুব খুশী। চা আর মুড়ি দিলে।

'মেয়ের জ্বর, যদি না আনতে অন্ধকারে কি যে কাণ্ড ঘটত কে জানে বাবা!'

'না মাসিমা, হয়তো হেঁটে এলে ও আগেই আসত। আমাকেই ভূতে ধরল। অন্য-পথে চলে গেল ঘোড়াটা। এরকম ভুল ওরও হবার কথা নয়। একা হলে হতো না। ভেবেছিল সওয়ারী আছে—তার অন্যপথ।'

উঠে পড়ল জাহেদ আলি। প্রণাম করল ডালিমের মাকে।

ডালিম কাপড় ছেড়ে চা খেয়ে এসে দাঁড়াল।

প্রণাম করল জাহেদ আলিকে। তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিতে গেলে নিল না জাহেদ আলি। বলল, 'ছোট বোনের কাছে কেউ টাকা নেয়!' ডালিমের মাথায় চুমু খেতে সে বলল, 'দাদা আবার এসো!'

'আসব।'

গাড়িতে উঠতে ডালিমের মা বলল, 'আজ না-হয় থাকো না বাবা!'

'আমার বউ ছেলেমেয়ে ভাববে মাসিমা।'

ডালিম বলল, 'হয়তো ভাববে ভূতে ধরেছে!'

হেসে উঠল জাহেদ আলি।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ হতে লাগল টকটক টকাটক—টকটক টকাটক···

বেশ কিছুদিন কেটে যায়।

একদিন জাহেদ আলি। নবদ্বীপ ঘাটের ভাড়া নিয়ে গিয়ে নদীর এপারে দাঁড়িয়ে-ছিল। মায়াপুর-থেকে-আসা একদল বাবাজী আর তাঁদের সঙ্গের একটি মেয়েকে নৌকো পার হতে দেখল। চা খাচ্ছিল সে। যাত্রীর অপেক্ষায় ছিল।

মেয়েটির দুরন্ত যৌবনভরা চেহারা। আশপাশের ছোকরাগুলো। যেন নড়েচড়ে ওঠে। একজন রিকশাঅলা মন্তব্য করেই বসে, 'দারুণ জিনিস আসছে মাইরি!'

মেয়েটির কপালে তিলক। গলায় তুলসীর মালা। লালপাড় সাদা শাড়ি পরনে। গায়ে একখানা উড়ানি। কে মেয়েটা, ডালিম না?

বাবাজীর দল ঘোড়ারগাড়ির সহিসকে খুঁজলে জাহেদ আলি এসে দাঁড়ায়।

'যাবে গো হেঁতালখালির বৈষ্ণবপাড়ায়?'

'যাব।' বলল জাহেদ।

'দাদা তুমি!' বলল ডালিম।

'হাঁ, উঠে পড়ো।' জাহেদ আলি বললে।

দলের প্রধান পালা-কীর্তনীয়া নকুড় গোঁসাই বললেন, 'ভাড়া ঠিক হল না ডালিম, গাড়িতে উঠে যাচ্ছ?'

একতারা বাজিয়ে যে ছোকরাটি বাউল গেয়ে গতরাতে মায়াপুরের মানুষজনের মন

মাতিয়ে এসেছে সে সুর করে একতারায় টংকার দিয়ে বলল, 'রাধার ভরসায় থাক হে গোঁসাই—তোমার আর পারের ভাবনা নাই।'

সবাই উঠে পড়ার আগে জাহেদ আলি গাড়িতে উঠে বসে। ওঁরা সবাই জুৎ হয়ে বসলেই গাড়ি ছেড়ে দেয়। কাছেই বসেছিল ডালিম। সেই রাতকালের কুহকিনী মেয়ে নয় যেন এখন সে। কেমন শান্তশ্রী। বলল, 'তুমি বুঝি নামগানও করতে পারো ?'

'পারে মানে। ডালিমই তো এখন আমাদের সব কিছু। ওর গানের গলার তুলনা হয় না।' বললেন নকুড় বাবাজী।

বাবাজীর পায়ের ধুলো নিলে ডালিম।

উজ্জ্বল রোদে নীল আকাশ হাসছে। চারদিকে সবুজ ধানক্ষেত। আশ্বিন মাসের শেষদিক। ধানের শীষ দেখা দিয়েছে দু-চারটে। সামনে বড়পুজো।

ওঁরা সবাই নানান কথায় মাতলে জাহেদ ঘোড়া তাড়তে তাড়তে একসময় আস্তে আস্তে বলে, 'মাসিমার সঙ্গেও আর দেখা হয় না—ভাল আছে তো ?'

'হাঁ দাদা, কই তুমি আর গেলে না ? বৌদিকে বলেছিলে সেই ভূতুড়ে রাতের কথা ?'

'না, তা কি বলতে আছে !'

'বারে, আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাওনি সেদিন রাতে !'

হাসল জাহেদ আলি। বলল, 'একটা ছেলে দেখেছি।'

'চলো, বাড়িতে গিয়ে কথা হবে।'

জাহেদ আর কিছু বলল না।

হেঁতালখালি আসার পর বাবাজীরা সবাই নেমে পড়লেন। ডালিমও নামল।

নকুড় বাবাজী বললেন, 'কত দেবো ভাই ?'

'যা আপনার খুশি দিন।'

দশটা টাকা হাতে দিলেন বাবাজী। জাহেদ আর কিছু বলল না।

ডালিম তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। ঘোড়া দেখতে জুটল পাড়ার ছেলেমেয়েরা।

মাসিমা তখন ফুল এনে ছোট মেয়েকে নিয়ে মালা গাঁথতে বসেছিল। জাহেদকে দেখে বলল, 'এসেছ বাবা, বসো। কতদিন শান্তিপুর শহরে যাবার-আসবার সময় ভাবি, কই জাহেদ আলির সঙ্গে তো আর দেখা হয় না।

'গোটা নদিয়া জেলায় ঘুরে বেড়াই মাসিমা—কি করে দেখা হবে। শোন মাসিমা, ডালিমের বিয়ে দেবে ?'

'ছেলে আছে বাবা ? নামগানের দলে থাকলে ঘর-সংসার হবে না। কোথায় কোথায় রাতে থাকবে। গলা পড়লে বয়স হলে তখন। মেয়েদের একটা অবলম্বন চাই।'

ডালিম পুকুর থেকে স্নান করে এসেছে। পরপর দু-রাত গান করে বিনা ঘুমে তার মাথা ঘুরছিল। শাড়িটা শুকোতে দিয়ে এসে চুলে চিরুনি টানতে থাকে দাওয়ার কোলে উঠোনে দাঁড়িয়ে।

জাহেদ বলে, 'ভারি ভাল ছেলে মাসিমা, নাম সুশান্ত বণিক। লেখাপড়া জানে।

বি. এ. পাস। চাকরি নেই, তবে উপায় করে ভাল। কৃষ্ণনগর স্টেশনের ওপর ভাড়ায় একটা পুতুল বিক্রির দোকান করেছে। তার মাল বয়ে নিয়ে গেছি আমি কতবার কত মেলায়। কৃষ্ণনগরের সমস্ত বড় বড় পুতুল ব্যবসায়ীরা তাকে ধারে মাল দেয়, বিক্রি করে দাম মেটায়।'

'কে কে আছে?'

'না, তেমন কেউ নেই, আছে মাত্র এক পিসিমা। তার ছেলেমেয়ে হয়নি বলে ওকে পালতে নেয়। আম-কাঠাল বাগান, পুকুর আর সুন্দর সাজানো একটা মাটির বাড়ি আছে। কত পুতুল আর বই আছে সেই ঘরে! আমাকে খুব ভালবাসে সুশান্ত। ওর বাপের সংসারেও সাহায্য করে। দুটো বোনের বিয়ে দিয়েছে।'

'আমার এই কালো মেয়েকে পছন্দ করবে বাবা?'

'ডালিমকে কালো বলা যায় না। তবে প্রবাদ আছে জানো তো, নাক খাঁদা-খাঁদা, চোখ দুটো ভাসা, সেই মেয়ে দেখতে খাসা।'

ডালিম মুখ তুলে হাসল। বলল, 'সে দেখতে কেমন জাহেদ ভাই?'

'ভাল।'

'তোমার মতো সুন্দর চেহারার হবে তো? চোখ টিপল ডালিম তার বোন বেদানার দিকে।

আমি 'তো কাটখোট্টা পাঠান চেহারার লোক। আমার চাইতে দেখতে ভাল। শামলা রঙ বটে, নাক খাড়া। চোখ দুটো সুন্দর। গোলগাল চেহারা।'

মাসিমা বলল, 'তবে যা তোর দাদার গাড়িতে—একদিন দেখে আয়।'

ডালিম নখ খুঁটতে থাকল। ভাবছে বুঝি সে কিছু।

মাসিমা বলল, 'ওই বাউল ছেলে ভবানন্দর চালচুলো নেই, ওর ফন্দিতে ফাঁসবি না মা। ফাঁসবি তো ভাসা কাঠ হয়ে ভাসবি। ঘাটের মড়া হয়ে যাবি।'

জাহেদ আলি দিন ঠিক করে দেয়। আগামী রবিবার সে সকাল আটটায় পাকা রাস্তার মোড়ে আসবে। ডালিম যেন যায়।

ডালিম মাথা নেড়ে সায় দিলে।

'গোলমাল হলে কিন্তু সমস্ত সম্পর্ক কেটে দোব। আমি এক কথার লোক!'

'একেবারে খাঁটি মুসলমান!'

'আলবৎ। দেখিস এই বিয়ে আমি দিতে পারি কি না। আজ থেকে তুই আমার ধর্মবোন। যে ধর্ম মানুষের ধর্ম। হিন্দু কিম্বা মুসলমানের নয়!'

ডালিম প্রাণভরা হাসিতে যেন উপচে পড়ল হঠাৎ। প্রণাম করে দিল জাহেদ আলিকে।

দিনের দিন ডালিম পাকা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াতেই দেখল জাহেদ আলি একা ছুটিয়ে নিয়ে আসছে।

গাড়িতে তুলে নিল ডালিমকে। আরো কয়েকজন মেয়ে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে উঠল। কিছুদূরের পথে নেমে গেল তারা।

বেলা দশটার পর কৃষ্ণনগরে এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে ডালিমকে সঙ্গে নিয়ে সুশান্তর দোকানের সামনে এলো জাহেদ আলি।

'দাদা।' হেসে বলল সুশান্ত। সঙ্গের মেয়েটিকে এক চোখ দেখতে গিয়ে হঠাৎ যেন তার চোখ আটকে গেল।

'এর নাম ডালিম।' বলল জাহেদ।

'বসুন বসুন। আপনার কথা শুনেছি।'

'আরে ও নাকি খুব ভাল কীর্তন গান গাইতে পারে। বাবাজীদের দলে গাইতে যায়।'

'তাই নাকি! তাহলে চালাক-চোস্ত মেয়ে আছে। আসরে গান গাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আজ আমার কী শুভদিন জাহেদদা। সকালেই প্রথম বউনি এক মার্কিন সাহেবের হাতে। নগদ সাতশো টাকার মাল নিলেন। সাহেবকে ফ্লুয়েন্ট ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিয়েছি। তাঁর মেমও খুশী। বলেছেন মার্কিন মুলুকে আমাকে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। যাক গে, ডালিম, তুমি ভাই, আমার চেয়ে জুনিয়ার—তুমিই বলি....

'হাঁ, বলুন।'

'আমার একজন সাহায্যকারী দরকার। মানে চাকরি দোব। মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে এখন আমি দিতে পারব। পরে না হয় কমিশনে কাজ করবে। থাকবে তুমি?'

'হাঁ।'

'এককথায় রাজি। বারে মেয়ে! তাহলে সন্দেশ খাওয়াতে হয়।' পাজামা পরা সুশান্ত হওয়ায় ভাসতে ভাসতে যেন চলে গেল। আর এক থাবা ডেলা সন্দেশ আনল।

গাড়ির ভাড়া হয়েছে, জাহেদ আলি চলে যেতে চাইল। সন্দেশ দিল তার হাতে সুশান্ত।

'থাকো তুমি। বিকেলে এসে নিয়ে যাব। সুশান্ত, দুপুরে খাইয়ে দিও ওকে। আমার ধর্মবোন হয়। তোমার হাতেই তুলে দিয়ে গেলাম।'

'কি যে বলেন দাদা, আমি অধম একটা গরীব ছেলে। আচ্ছা, আসুন আপনি। আলাপ-পরিচয় করে দেখি। মেয়েদের তো সহজে বোঝা যায় না। সহজে ওরা মনও খোলে না। তবে দেখে মনে হচ্ছে যেমনটি আমি খুঁজছিলাম ভগবান আমার কাছে তা পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'আর আমি শালা কেউ নয়?'

জিভ কাটল সুশান্ত। বলল, 'আপনি আমার দাদা!'

জাহেদ আলি চলে গেল।

দোকানে ফিরে এসে দেখল খদ্দের লেগেছে। কয়েকজন বাইরের মেয়ে। বেড়াতে এসে ফিরে যাবার আগে কিছু কেনাকাটা সারছে।

তারা নাড়ুগোপাল' শ্রীচৈতন্য, ইন্দিরা গান্ধী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এইসব পুতুল কিনল।

দোকান ফাঁকা হয়ে গেল।

'তুমি আমার পিসিমার কাছে যাবে, কীর্তন শোনাবে, পিসিমা বড় কীর্তন ভালবাসেন। আমি তেমন গাইতে পারি না। একটা গান গুনগুন করে গাও তো শুনি।'

'এখানে? লোক জমে যাবে যে!' হেসে কেঁদে খুন হয়ে যেন বলল ডালিম। কী প্রাণবন্ত এই মেয়ে! ডাগর দুটো চোখে কী গভীর আবিলতা!

কার ঘরের কি কি মাল, কত টাকা দাম, লিখে খাতা পরিষ্কার রাখতে লাগল সুশান্ত। বিক্রিও সঙ্গে সঙ্গে লিখতে হয়। কি জিনিস কত দাম।

ডালিম গুনগুনিয়ে শুধু তার গলার সুরটাকে বোঝাতে চাইল দু লাইন কীর্তন গেয়ে ঃ

'এতেক সহিলা অবলা বলে
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে...'

'আরে আরে! দারুণ দরদভরা মধুকণ্ঠী গলা তো তোমার। গাও না গলা ছেড়ে —এটা তো কেষ্টনগর! কোন্ শালা কী বলবে! ভিড় জমে যাক আমার দোকানে।'

লজ্জা পেলে ডালিম। কেন তার হৃদয় এমন উত্তাল পাতাল করছে কে জানে! গলার ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। ঘাম দিচ্ছে তার।

ময়ূর পাখায় ব্যজন করে সুশান্ত।

খুঁটিনাটি কথায় ক্রমেই জমে যায় দুজন। দুপুরে সুশান্ত ভাল একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে মাছভাত খাওয়ায় পেট ভরে।

বিকেলটা যেন কোথা দিয়ে কেটে যায়। বৈষ্ণব না হলেও অত্যন্ত বিনয়ী আর মধুর ভাষী সুশান্ত। বাইরের বইপত্র পড়াশুনো করে। বই আর পত্রিকা কেনাতেই তার মাসে কিছু খরচ হয়। একটা লাইব্রেরী হয়ে গেছে ঘরে।

'তোমাকে একদিন পিসিমার কাছে নিয়ে যাব।'

'আগে আমাদের বাড়ি যেতে হবে।'

'হাঁ, নিশ্চয়ই যাব।'

জাহেদ আলি এসে হাজির হল। বেঞ্চিতে বসতে দিল তাকে। সে বলল, 'ছ-টা বেজে গেছে ডালিম। চলো এবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে যাব।'

'চলো দাদা!' উঠে পড়ল ডালিম।

করজোড়ে নমস্কার জানাল সুশান্ত। বলল, 'প্রতিদিন আসতে হবে। পরশু একটা মেলায় নিয়ে যাব। জাহেদদাই নিয়ে যাবে। চাপড়ার ওদিকে। জলঙ্গীর তীরে।'

'যাব আমি। আজ আসি তাহলে, নমস্কার।'

গাড়ি চলল জাহেদ আলির।

আবার সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে।

'কেমন লাগল ছেলেটিকে?' শুধোল জাহেদ।

লজ্জা পেলে ডালিম। তবু বলল, 'ভাল।'

আরো কিছুদূর আসার পর জাহেদ আলি বলল, 'আজ তোকে ভূতে ধরেছে ডালিম। কথাবার্তা বলছিস না কেন?'

'ভাবছি!'

'কি ভাবছিস?

'সেদিনের মতো কুহক রাতে আজ যদি তুমি আমাকে নিয়ে হারিয়ে যাও—বেশ হয়!'

'পাগলি!'

মাঠের নির্জন পথ। হঠাৎ কীর্তন গেয়ে উঠল ডালিম।

'দারুণ গলা তো তোর!' বলল জাহেদ আলি।

নিজের মনেই গাইছিল ডালিম। তীর বেঁধা পাখী যেন সে আজ।

একদিন পথে মাসিমা বিরজাবালার সঙ্গে দেখা। গাড়িতে তুলে নিল জাহেদ। বলল, 'মাসিমা, ডালিম ঠিক কাজে যাচ্ছে তো?'

'হাঁ বাবা। তিন মাস হল ঠিক ঠিক মাইনেও পেয়েছে। সুশান্ত তিন-চারদিন এসেছে। কতগুলো মেলা ঘুরে এলো। জয়দেবের মেলায় যাবে।'

'ওদের এবার বিয়ে দিতে হবে।'

'হাঁ বাবা, একটা দিন ঠিক করো সুশান্তর সঙ্গে যুক্তি করে।'

জাহেদ আলি বলল, 'করব মাসিমা।'

জয়দেবের মেলা থেকে বেশ কয়েকদিন বাদে ফেরার পর জাহেদ দেখা করে যখন বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করতে বলল সুশান্ত কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল। বলল, 'এখনি বিয়ে করব? পাকাঘর বাঁধব না? তাছাড়া বিয়ে করলে সন্তানাদি হবে। ডালিম তখন তার বাচ্চা আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন আমাকে সাহায্য করবে কে?'

'আর একটা লোক আমি দোব। বেদানা আছে।' বলল জাহেদ।

হাসতে লাগল ডালিম।

সুশান্ত আর উত্তর দিতে পারল না।

জাহেদ বলল, 'আর দুটো ভাই আছে ওর। তাদের সঙ্গে নেবে। না নিলে সেই বজ্জাত দুটোকে আমি সহিস বানাব।'

'না না, ওরা পড়াশুনো করুক। ঠিক আছে—একটা দিনক্ষণ ঠিক করো।' বললে সুশান্ত।

শাঁখ বাজল। উলুধ্বনি হল। ডালিমের সিঁথিতে সিঁদুর এঁকে দিল সুশান্ত।

ডালিম বউ হয়ে এলো ঘর আলো করে।

জাহেদ আলি তার বউ জয়তুন বিবিকে এনেছিল বিয়ে বাড়িতে। সে যে এমন রূপবতী মেয়ে কস্মিনকালেও বলেনি জাহেদ আলি। আগুনের শিখার মতো জ্বলছে যেন এখনো মেয়েটা।

ডালিম ভাবে, তাই কুহক রাতে জাহেদ আলি এত সংযত ছিল?

জয়তুন বিবি কিন্তু বাংলা বলতে পারে না। সে নাকি কাশ্মীরী মেয়ে। তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল জাহেদ আলি।

ডালিম বলল, 'দাদা, তাহলে তুমি তো ভয়ানক দুর্বৃত্ত!'

জাহেদ বলল, 'হাঁ একজন মুসলমানও। যা বলি, তাই করি।'

সাজানো পর্দা ঘেরা গাড়ির মধ্যে সুন্দরী 'জয়তুন' (জলপাই) বিবিকে বসিয়ে নিয়ে জাহেদ আলি উর্দু কবি গালিবের 'শের' (কবিতা) গাইতে গাইতে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ মিলিয়ে গেলেও জাহেদ আলির মাথার চিকন উড়ানির পাগড়ি দেখা যায়। তাও মিলিয়ে যাবার পর ডালিমের চোখ পড়ে জয়তুন বিবির নিজের হাতে নকশা তোলা বর-কনের দুখানা শালের দিকে। অপূর্ব তার সূচিকাজ। যেন নকশার সমুদ্র।

কেন ঠিক জানে না ডালিমের দু চোখ ভরে জল আসে।

মাঝি

প্রফুল্ল রায়
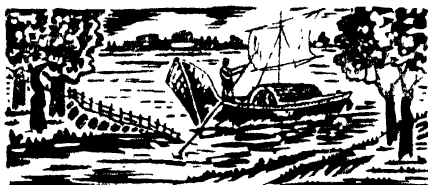
দু-পাশে ঘন সবুজ জলঘাস তার মাঝখান দিয়ে মেঘমতী রাজকন্যার সিঁথির মত ঋজু রেখায় রয়নাবিবির খালটা সামনের ধলেশ্বরীতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। সেই খালটা যেখানে নারকেল আর সুপারি গাছের মর্মরিত কুঞ্জে আশ্বিনের প্রসন্ন সকালে ঝলমলিয়ে ওঠে, ঠিক সেইখানেই আবছা ভোরেই একমল্লাই কেরায়া নৌকাটা এনে ভিড়িয়েছিল ফজল। তার অস্থির দৃষ্টিটা একবার পাড়ের কুরমচা ঝোপের আড়াল দিয়ে সুপারি বনের মধ্য দিয়ে সামনের ক্যাঁচা বাঁশের চৌচালা ঘরখানার চারপাশ দিয়ে এক নিমেষে চক্রাকারে ঘুরে এসেছিল। কিন্তু নাঃ সলিমা হয়তো ভুলেই গেছে কাল সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতির কথা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল ফজল। তারপর কাঁঠাল কাঠের বৈঠাখানা হাতে তুলে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সিরাজদীঘার হাটে যেতে না পারলে অন্য মাঝিরা সব সওয়ারী ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে।

নৌকাটা ছেড়েই দিত ফজল, সেই সময় রয়নাবিবির খালের একটা উচ্ছল ঢেউ কলশব্দে এসে ভেঙে পড়েছিল কানের ওপর। একটা দীঘল নারকেল গাছের পাশ থেকে জলতরঙ্গের বাজনার মত খিল খিল করে হেসে উঠেছিল সলিমা।

ফজল তাকায় নি, পিঠ ফিরিয়ে বসে ছিল। সলিমার এত দেরি হওয়ার জন্য তার মুখে অভিমানের মেঘ ঘন হয়ে নেমে এসেছিল।

এদিকে একেবারে নৌকার গলুইয়ের কাছে এসে পড়েছে সলিমা। তার চোখের নীলাভ মণিদুটিতে সকালের প্রথম আলো টলমল করে উঠেছিল। নিটোল নরম সজীব ভুঁইচাপার মত সুদেহিনী সলিমা। কিন্তু জিভের ডগায় কৌতুকের তীক্ষ্ণ ঝাঁঝ তার,

'ইস' গোসা হলি নিকি আবার। রঙ্গ দেইখা শরীর আমার জ্বইলা যায় মরিচের লাখান (মতো)।'

ফজল নির্বাক।

সলিমা আবার বলেছিল, 'কী হইল, মুখ ফিরা—'

ফজল মুখ ফেরায় নি। আগের মতই নিশ্চুপ বসে ছিল।

এবার গাঢ় স্বরে সলিমা বলেছিল, 'অমুন মুখ ঘুরাইয়া বইসা থাকলে আমার কিন্তুক ভাল লাগে না। হুধাহুধি গোসা হইলেই হয় নিকি! বাজানের চৌখে ধূলা দিয়া তর কাছে আইতে হয়। হে যে কত কষ্ট তুই তো জানস। দিনরাইত আমারে আগলাইয়া রাখে। ঘুম থিকা উইঠা এতক্ষণ উঠানে বইয়া তামুক খাইতে আছিল বাজানে। এট্টু আগে জমিনে গেছে. হেই ফাকে তর কাছে আইছি।'

এবার মুখ ফিরিয়েছিল ফজল। সলিমার দেরি হওয়ার যুক্তিসঙ্গত একটা কৈফিয়ৎ পেয়ে তার কাঁচা আনাজের মত মুখখানা থেকে অভিমানের মেঘ উড়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, 'বাজানের লগে (সঙ্গে) আর বেশিদিন লুকাচুরি খেলতে অইব না। দুই চাইর দিনের ভিতরেই হগল ব্যবস্থা কইরা ফেলাইতে আছি। ছয় কুড়ি দশ ট্যাকা অইছে। আর দশটা ট্যাকা অইলেই সাত কুড়ি পুরাইয়া যাইব। আইজের দিন কেরায়া বাইলেই দশটা ট্যাকা পাইয়া যামু। হিন্দুরা দ্যাশ ভিটামাটি ছাইড়া যাইতে আছে, কেরায়া পাইয়া যামুই। হেয়ার পর সাত কুড়ি ট্যাকা তর বাজানের হাতে দিয়া আমার ঘরে নিয়া আহুম তরে। আইচ্ছা, অহন আমি যাই।'

সলিমা বলেছিল, 'না-না, অহনই তর যাওন অইব না। এত কষ্ট কইরা আইলাম। দুই দণ্ড যদি এট্টু কথা না কই—' ছায়া নেমে এসেছিল সলিমার মুখে।

ফজল বলেছিল, 'তর বাজানে যা চামার, সাত কুড়ি ট্যাকা নিব গইন্যা গইন্যা (গুনে গুনে), হেয়ার পর মাইয়া দিব। যাই অহন, সন্ধ্যার সময় আবার আহিস।'

'তবে যা। ঠিক সন্ধ্যার সময় আহুম। আবার দেরি করিস না য্যান।'

'না-না দেরি করুম না।'

একটুক্ষণ কি ভেবে সলিমা বলেছিল, 'একখান কথা—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল ফজল।

'কাইল রাইতে নবীপুরের কাসিমালি ট্যাকা লইয়া বাজানের কাছে আইছিল। আমারে সাদি করতে চায় শয়তানটা। আমি তারে কাইন্দা খেদাইছি। এর আগে আইছিল বাসাইলের আইবুদ্দি, তার আগে গিরিগঞ্জের হবিব মিঞা। হগলেরে ভাগাইছি। কিন্তুক বেশিদিন আর পারুম না। বাজানেরে তো চিনস (চিনিস)। ট্যাকা হাতে লইয়া কুনদিন আমারে কার লগে যে গাইথা দিব হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'একা একা আমার আর ভাল লাগে না। পরান জানি কেমুন করে।'

সকৌতুকে ফজল বলেছিল, 'কেমুন করে? আসমানের পংখী হইয়া উইড়া যাইতে চায়?'

সলিমা লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল, 'জানি না, যা।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলে নি ফজল। অনেকক্ষণ কি যেন ভেবে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিল, 'ডর নাই কাসিমালি সিকিমালি—কারো সাইধ্য নাই তরে আমার কাছ থিকা ছিনাইয়া নিতে পারে। কাইলই তর বাজানের পাওনা আমি মিটাইয়া দিমু। অহন যাই।' বলে আর অপেক্ষা করে নি সে। বৈঠার ধাক্কায় নৌকাটাকে রয়নাবিবির খালের মাঝখানে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর নৌকা বাইতে বাইতে একখানা ভাটিয়ালি গলায় তুলে নিয়েছিল।

যোল বছরের তাজা মাইয়া
সতেরে দিছে পাড়া,
আখির মইধ্যে রাখছে বাইন্ধা
পরভাতিয়া তারা।

প্রভাতিয়া তারার স্বপ্ন-ধরে রাখা চোখের মেয়ে তার যৌবন-বন্দনা শুনতে শুনতে সেই সুন্দর সকালে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর খালের নীলচে রেখাটা ধরে অনেক দূরে ধু-ধু একটা বিন্দুর মত মিলিয়ে গিয়েছিল ফজলের নৌকাটা আর তার গলার আচ্ছন্ন সুর।

এখন সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এসেছে। সিরাজদীঘার কেরায়া ঘাটে নৌকাগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে।

হাটের চালার তলায় ভিন্-গেরামী দোকানীদের কেরোসিনের কুপীতে এই অন্ধকারে লাল লাল শিখা ফুটে উঠেছে অজস্র। দূরের কোন একটা মহাজনী নৌকা থেকে মাঝির গলায় নামাজ পড়ার শান্ত গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে।

শেষ সওয়ারীর ক্ষেপ দিয়ে এইমাত্র ফজলের একমাল্লাই কেরায়া নৌকাটা এসে ভিড়ল নদীর ঘাটে। সারাদিন সওয়ারী পারাপার করে আজ মোট সাতটা টাকা মিলেছে। লগিটা পারের মাটিতে শক্ত করে পুঁতে মোটা কাছি দিয়ে বাঁধল ফজল। তারপর কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে কোমরের গোপন গেঁজেটা বার করে কাঁচা টাকাগুলো একটা একটা করে গুনে নিল। মোট ছ' কুড়ি সতের টাকা। সাত কুড়ি পূর্ণ হতে এখনও তিনটে টাকা বাকি। আশা ছিল, আজই সাত কুড়ি পূর্ণ হবে। নাঃ, আরও একটা দিন লাগবে, দেখা যাচ্ছে।

হিন্দুরা সাত পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে বেবাজিয়াদের মতো চলে যাচ্ছে কলকাতার দিকে। একটা কেরায়া মিললে পাঁচ-দশ টাকা পাওয়া আজকাল আশ্চর্য কিছু না। আর তা কালকের দিনের মধ্যে মিলবেও। এ বিশ্বাস ফজলের আছে। সকালবেলা সলিমাকে বলে এসেছিল, কালই তার বাপের সাত কুড়ি টাকার খাঁই মিটিয়ে আসবে। নাঃ, কাল আর সম্ভব হবে না। একেবারে পরশুই যাবে সে। সলিমার বাজানের বুনো খাটাসের মত মুখটার ওপর হাতের সমস্ত শক্তিতে এক শ' চল্লিশটা কাঁচা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে সলিমাকে নিজের ঘরে আনার সব ব্যবস্থা পাকা করে আসবে।

দিন কয়েক আগে সলিমার বাজান শকুনের মত তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল,

'সলিমারে সাদি করতে চাও। সাত কুড়ি ট্যাকা ডাইন হাতে দিয়া বাঁ হাতে মাইয়ারে নিয়া যাইও। আর এট্টা কথা মনে রাইখ্যো। সাদির হগল খরচ তুমার।'

বিরস স্বরে ফজল বলেছিল, 'আমার কাছে চাইর কুড়ি ট্যাকা আছে। অহন তা-ই দেই। সাদির পর বাকি ট্যাকা দিয়া যামু। খোদার কসম।'

বাকি বকেয়ার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন সলিমার বাজান। বাকি টাকা হল আসমানের তারা। কখনই তা মুঠোয় এসে পৌছয় না। অতএব নির্লিপ্ত স্বরে বলেছিল, 'ধার-বাকি লইয়া আমার কারবার নাই মিঞা। আমি নগদ লইয়া ব্যাপার করি।'

'বেশ, তাইলে আমারে এক মাসের সময় দ্যান। আমি ট্যাকার যোগাড় কইরা লই।'

'এইর ভিতরে আর কেও যদি ট্যাকা লইয়া আইয়া পড়ে তো আমি হেইখানেই মাইয়ার সাদির ব্যবস্থা কইরা ফেলামু।'

সেইদিন আর জবাব দেয় নি ফজল। ধীরে ধীরে সলিমার বাজানের কুৎসিত মুখ-খানার সামনে থেকে উঠে খালের কিনারে একমাল্লাই নৌকাটায় চলে গিয়েছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেমন করে হোক আর যত তাড়াতাড়ি হোক, টাকাটা সে যোগাড় করে ফেলবেই

সেদিন থেকেই একটি একটি করে টাকা জমিয়েছে সে। তার সমস্ত যৌবনের কামনাকে ঘাম-ঝরানো পরিশ্রমের মূল্যে কিনবার জন্য একাগ্র নিষ্ঠায় কেরায়া বেয়ে সওয়ারী পার করেছে। দেলভোগ, সাভার, বাসাইল, সোনারঙ—জলবাংলার দিগ্‌দিগন্তে নৌকা ছুটিয়েছে অবিরাম। দিনরাত, পল-প্রহর, ক্লান্তি-অবসাদ—কোন কিছুর হিসাব ছিল না এই ঝড়ের মত দিনগুলিতে। সলিমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য নিশ্ছেদ পরিশ্রম চালিয়ে গেছে ফজল। ঘরের ভেতরে সলিমার স্বপ্নকে নিবিড় করে পাবার জন্যই ঘরের বাইরে এই ক্ষান্তিবিহীন আয়োজন।···যাই হোক, টাকাগুলো গুনে একটা একটা করে আবার গেঁজের মধ্যে ভরে নিল ফজল। তারপর কোমরে বেঁধে ফেলল। একটা টাকাও যাতে হারিয়ে না যায়, তাই শরীরের চামড়ার সঙ্গে তার স্পর্শ ধরে রেখেছে সে। এর মধ্য থেকে একটি টাকা নিয়ে নিয়ে বেহেস্তে কি দোজখে গেলেও কারো রেহাই নেই। নিশিরাত্তিরের অপযোনির মত তার পিছু পিছু ধাওয়া করে যাবে ফজল।

আর মাত্র তিনটি টাকা। তারপরেই সলিমাকে সাদি করা যাবে। ভবিষ্যতের সেই মধুর স্বপ্নময় দিনটির কল্পনা করে মৃদু আচ্ছন্ন গলায় গান ধরল ফজল ঃ

কালো চোখের মদ খাইয়াছি
হইয়াছি উন্মন
আর মদ খাইয়াছি আমার বধূর
পেরথম যৈবন।
কেম্‌নে ভাঙ্গুম আমি হেই
বধূয়ার মান—
চোখের পাতায় চুম্মা দিমু
ঠোঁটে সাবি পান।

গান-গাওয়া তন্ময়তার মধ্যে আচমকা সকালবেলার সেই প্রতিশ্রুতির কথাটা মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যার সময় মর্মরিত নারকেল বনে সলিমার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল তার।

অতএব তাড়াতাড়ি উঠে 'পারা' তুলল ফজল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সওয়ারীর গলা শোনা গেল, 'মাঝি, কেরায়া যাইবা নিকি? আরে কে? আমাগো ফজল মাঝি নিকি?'

পরিচিত স্বর। পেছনে ফিরে ফজল দেখল. জলের প্রায় কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে মালখানগরের ইয়াছিন শিকদার। আর তার ঠিক পেছনেই বোরখা ঢাকা এক নারী-মূর্তি। খুব সম্ভব মিঞা সাহেবের বিবিজান।

কেরায়াঘাটের লাগোয়া লঞ্চঘাটা। একটা নিশ্চল জেটি সেখানে পড়ে রয়েছে। এইমাত্র নারায়ণগঞ্জ থেকে একটা লঞ্চ এসে জেটিটার গায়ে ভিড়ল। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় সমস্ত এলাকাটা ভরে গেছে। ফজল জিজ্ঞেস করল, 'কই যাইবেন মিঞাছাব?'

'চর ইসমাইল।' ইয়াছিন বলল।

'অহন অতদূর যাইতে পারুম না। রাইত অইয়া গেল। কাইল হকালে আইয়েন।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল ইয়াছিন। নৌকার গলুইটা চেপে ধরে বলল, 'রাইত কইরা কেউ যাইতে চায় না। আমার বড় ঠেকা। তুমি লও, খুশী কইরা দিমু।'

এবারে মন দেবার চেষ্টা করল ফজল, 'কেরায়া কত দিবেন?'

'পাচ ট্যাকা।'

'পাচ ট্যাকা—ফুঃ! একখান কাথা দেই, বিবিজানেরে লইয়া হারা রাইত পইড়া ঘুমান ঐ হাটের চালায়। হকালে উইঠা হাতর (সাঁতার) দিয়া যাইয়েন গিয়া।'

হ্যাঁ, অনেকটা সময় বাজে খরচ হয়ে গেছে। এতক্ষণে মর্মরিত নারকেল বীথির আড়ালে প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে রাত্রির সমস্তটুকু অন্ধকার নিশ্চয়ই ঘন হয়েছে সলিমার মুখে।

এদিকে গলুইটা আরো তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরল ইয়াছিন, 'সাত ট্যাকাই দিমু; আমারে আইজ যাইতেই অইব চর ইসমাইলে।'

ফজল বলল, 'সাত ট্যাকা আমারে দিবেন ক্যান? ঐ দিয়া আড়াই স্যার ত্যাল কিন্যা নাকে দিয়া পইড়া থাকেন। চর ইসমাইলে যাওনের কথা মনেও থাকব না। ছাড়েন ছাড়েন, নাও ছাড়েন—'

'তাইলে কত চাই তুমার?'

'দশ ট্যাকা দিতে অইব মিঞাছাব! একেবারে সাফা হিসাব।'

'দশ ট্যাকা!' আতঙ্কিত চিৎকারের সঙ্গে মহাপ্রাণীটাও যেন গলার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল ইয়াছিনের. 'নাঃ, পাহিস্তান (পাকিস্তান) হওনের পর তুমরাই সাপের পাচ পাও দেখছ—'

খুব নির্লিপ্ত সুরে ফজল বলল, 'ঐ ট্যাকাটা দিতে পারলে নায়ে ওঠেন, নাইলে গল্পই ছাড়েন। আমার কাম আছে।'

চাপা গলায় গজ গজ করে উঠল ইয়াছিন, 'মোচড় দিয়া ট্যাকা আদায় কর। ঠ্যাকায় পাইছ। কী আর করুম—দশ ট্যাকাই দিমু।'

প্রথম কথাগুলো যেন শুনতেই পায় নি ফজল। কিন্তু শেষের কথা ক'টা নির্ভুলভাবে তার কানে ঢুকেছে। ফজল বলল, 'এই তো মিঞাছাবের মরদের লাখান কথা বাইর অইছে। বিবিজানেরে নিয়া নায়ের পাটাতনে ওঠেন।'

ফজলের কথা শেষ হতে না হতেই ইয়াছিন শিকদার পিছনের বোরখা-ঢাকা নারী-মূর্তির হাত ধরে একটা টান লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা অথচ তীক্ষ্ণ এক চিৎকার করে উঠল নারীমূর্তি, 'না না, আমি যামু না। আমারে ছাইড়া দ্যান। আপনের পায়ে পাড়।'

চাপা গর্জন শোনা গেল ইয়াছিনের, 'হারামজাদীর সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। গিয়া থাকবি খাজা খাঁর নাতিনের লাখান। নাইলে গুয়াখোলার ঐ কেরামত ডাকুই তরে নিয়া যাইত। তার কীল খাওয়ার থিকা আমার খোদ বেগম হওন কি ভাল না?'

এবার মৃদু চিৎকারটি মর্মান্তিক হয়ে উঠল। চমকে উঠল ইয়াছিন। তারপর দুটো ভারী কর্কশ হাত নারীমূর্তির মুখে ঠেসে ধরল, 'চুপ চুপ—একেবারে খুনই কইরা ফেলামু তরে।'

গলার আওয়াজে অমন একটা সাঙ্ঘাতিক কর্ম করা যে একেবারে অসম্ভব নয়, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

ফেরী লঞ্চের সার্চ লাইটটা অন্যদিকে ঘুরে গেছে। আলোর দিকটায় কালো কাচের মত ধলেশ্বরীর জল ঝকমক করছে। আর এদিকটায় নিশ্ছেদ অন্ধকার, আর তারই মধ্যে সাপের মাথার মণির মত জ্বলছে ইয়াছিনের চোখদুটো।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দুটো চোখ আর দুটো কানের মধ্যে একত্র করে দেখা এবং শোনা, দুই-ই করছিল ফজল। আচমকা সে বলে উঠল, 'কি মিঞাছাব, বিবিজান চর ইসমাইলে যাইতে চায় না নিকি?'

ফজলের স্বরটা কেমন যেন সংশয়জনক। লাফিয়ে নৌকার কাছে ছুটে এল ইয়াছিন। এলোমেলো গলায় বলল, 'পোলাপান (ছেলেমানুষ) কিনা। বাজানের কাছ থিকা হোয়ামীর ঘরে যাইতে কান্দে। ও কিছু না মাঝি, ও কিছু না।'

'অঃ, আমি আবার ভাবলাম অন্য কিছু বুঝি।'

ফজলের কথার কোন উত্তর না দিয়ে নারীমূর্তিটিকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নৌকার পাটাতনে তুলে নিয়ে এল ইয়াছিন। সঙ্গে সঙ্গে বোরখার আড়াল থেকে আকাশ ফাটানো চিৎকার উঠল।

কাঁপা ভীত সুরে ফজল বলল, 'মিঞাছাব, আমার য্যান কেমুন লাগতে আছে। আপনে কাইল হকালেই যাইয়েন।'

'বাগে পাইছ। আইচ্ছা পনের টাকাই দিমু। লও, আর দেরি কইরো না। নাও খুইলা দাও। আইজ রাইতের মধ্যে চর ইসমাইলে আমায় যাইতেই অইব।'

পনের টাকা! বলে কি লোকটা। নৌকার বাদাম তুলে দিলে উত্তুরে বাতাসের টানে রাত ভোর হবার অনেক আগেই চর ইসমাইলের মাটিতে পৌঁছনো যাবে। হালের বৈঠাটা শক্ত করে মুঠোয় চেপে আকাশে নক্ষত্রমালার ফাঁকে ফাঁকে সলিমার মুখ দেখবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন কাজ থাকবে না। তার বদলে নগদ পনের টাকা! সলিমার পণের জন্য সাত কুড়ি পূর্ণ হয়েও বারোটা কাঁচা টাকা গেঁজের ভেতর পাশাপাশি শুয়ে আনন্দে বাজতে থাকবে। ভাবতে ভাবতে মনটা খুশিতে ভরে গেল ফজলের।

এতক্ষণে নারকেল বনে তার আশায় আশায় দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চয়ই চলে গেছে সলিমা। তা যাক। কাল সকালে পুবের আকাশে লালচে ছোপ লাগার আগেই সে সলিমার চামার বাজানের নাকের ডগায় পণের টাকাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে তাজ্জব করে দেবে। তারপর এই মাসটা গেলেই সলিমাকে সাদি করে তার ঘরে নিয়ে আসবে। সাদাসিধা মানুষ ফজল মাঝি। সলিমাকে ঘিরে ছোট আনন্দ, ছোট খুশি আর ছোট ছোট সুখের কল্পনায় কয়েকটা মুহূর্ত সে ডগমগ হয়ে রইল।

একটু পরেই ফজল আরেকবার ইয়াছিনকে পরখ করল, 'কত ট্যাকা দিবেন?'

ছইয়ের ভেতর থেকে জবাব এল, 'পনের।'

মোচড় দিলে আরো রস ঝরবে, এ ব্যাপারে ফজল নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে আর গুণাহ্ করল না। কিঞ্চিৎ ধর্মভয় অন্তত তার আছে।

যাই হোক, আর দেরি করল না ফজল। বৈঠা দিয়ে খোঁচা মেরে নৌকাটাকে নদীর মাঝখানে নিয়ে এল। এরপর ধলেশ্বরীর অন্তহীন খরধারা। কালো কুটিল রাত্রি ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌দিগন্তে। ঘোলাটে চাঁদের আলো ধলেশ্বরীকে ভৌতিক করে তুলেছে। জামকাঠের নৌকার গায়ে ছপ্ ছপ্ শব্দে ঢেউয়ের আঘাত বাজছে।

হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আবছা আকাশের দিকে তাকাল ফজল। মিট মিটে জোনাকির মত আকাশের গায়ে অগণিত তারা ছড়ানো। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সলিমার কথা ভাবতে লাগল সে। মনটা আশ্চর্য এক মাদকতায় ভরে গেল যেন। নাঃ, সলিমাকে না পেলে জীবনটা ব্যর্থই হয়ে যাবে তার। আজকাল দোচালা ঘরের বিছানাটাকে মরা সাপের হিমাক্ত আলিঙ্গনের মত ভয়াবহ মনে হয়। বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। আর সেই নিরানন্দ নিরুৎসব একাকিত্বের মধ্যে সলিমার স্বপ্ন দেখতে দেখতে সমস্ত রাত জেগেই কাটিয়ে দেয় ফজল।

আজ রাত্রেই চর ইসমাইলে সওয়ারী পৌঁছে দিয়ে সলিমাদের বাড়ির দিকে নৌকার বাদাম তুলে দেবে। আনন্দে উত্তেজনায় শিরায় শিরায় যেন টান পড়ল, রক্তে মাতামাতি শুরু হল, হৃৎপিণ্ডে দোলা লাগল।

তরতর করে নৌকাটা জল কেটে এগিয়ে চলেছে। হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় ধরে গান ধরল ফজল :

যৈবন আইল কইন্যার অঙ্গে
জোয়ারের জল রে—
আমার চৌখের জলে পদ্ম নাচে
টলমল রে—
ও কইন্যা, তুমি হইও চান্দোবদন,
আমি হমু মুখের আচল।
তুমি হইও নয়নমণি, আমি হমু
কালো কাজল, ও কইন্যা—'

আচমকা গানের সুরটা ছিঁড়ে গেল যেন। তীব্র ঝাঁকানি লাগল ইন্দ্রিয়গুলোতে। গোটা সত্তাকে কানের মধ্যে এনে উৎকণ্ঠ হয়ে বসল ফজল।

ছইয়ের ভেতর তাণ্ডব শুরু হয়েছে। ধস্তাধস্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বুকের ভেতর একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর বোধ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল ফজলের।

সাপের শিসের মত শব্দ করে ইয়াছিন শিকদার গর্জাচ্ছে, 'চুপ চুপ, একেবারে গলা টিপা মারুম।'

'তাই, তাই করেন। হয় আমারে মাইরা ফালান্, নাইলে ছাইড়া দ্যান। না হইলে আমি জলে ঝাপ দিমু।' নারীকণ্ঠটি অবরুদ্ধ আর চাপা।

গোরস্থানের শিয়ালের মত খিক খিক করে হেসে উঠল ইয়াছিন, 'মরণ কি অতই হস্তা, এমনে তরে মারুম নিকি? এট্টু এট্টু কইরা খুন করুম।'

ইয়াছিন আর সেই নারীমূর্তিটির কথোপকথন ক্ষ্যাপা তুফানের মত ধড়াস করে আছড়ে পড়ল ফজলের হৃৎপিণ্ডে।

ধলেশ্বরীর অন্তহীন খরস্রোতে নৌকাটা উল্কার মত ছুটে চলেছে। পাড়ের নারকেল আর হিজল বনে ঝড়ো বাতাস এলোপাথাড়ি আছাড় খাচ্ছে।

এদিকে ছইয়ের তলার ধস্তাধস্তি একসময় থেমে গেল। যে মনটাকে একাগ্র উৎকণ্ঠ করে ইয়াছিনদের দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছিল ফজল, ধীরে ধীরে সেটাকে আরেক দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আকাশময় অগুণতি তারা ছড়ানো। দৃষ্টিটা সেদিকে ছুঁড়ে দিয়ে সলিমাকে আবার ভাবতে চেষ্টা করল সে।

মোরগ ডেকে উঠবার আগেই কাল ভোরে সলিমার বাজানকে জাগিয়ে সাত কুড়ি টাকার মেয়ে-পণ নাকে ছুঁড়ে মারার পর তার মুখখানা কেমন হাবাগোবা বলদের মত দেখাবে, সেটা ভাবতেই খুব আমোদ লাগল ফজলের।

বেশিক্ষণ অবশ্য তার মনটা সলিমার বাজানকে নিয়ে মগ্ন রইল না।

একটু একটু করে সলিমার স্বপ্ন সমস্ত চেতনার মধ্যে নিবিড় হয়ে এল। টানা টানা দুটি ঘন কালো চোখ, শ্যামলী লতার মত সতেজ সুঠাম দেহ, তার ডোরাকাটা রঙীন শাড়ি—সব মিলিয়ে সলিমা যেন এক আশ্চর্য রহস্য, বিস্ময়।

স্বপ্নটা আবার ছিঁড়ে গেল।

ছইয়ের ভেতর থেকে বাষ্পভরা অসহায় নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'আমারে কইলকাতায় দিয়া আহেন। আপনে আমার ধর্মের বাপ, আপনের পায়ে ধরি।'

চাপা বীভৎস গলায় ইয়াছিন হেসে উঠল, 'তর বাজান না লো হুমুন্দির ঝি, আমি তর পোলার বাজান হইতে চাই। অহন চুপ মাইরা থাক। তরে আনতে গিয়া তর হোয়ামীর তিনটা সড়কির খোচা খাইছি।'

ইয়াছিনের হাসি, তরঙ্গিত কালো ধলেশ্বরী, আবছা অন্ধকার, ঢেউ আর পালের শব্দ, বাতাসের আওয়াজ, সব একাকার হয়ে একটা ভয়ানক অশুভ ইঙ্গিত চারদিক থেকে ক্রমাগত ঘনিয়ে আসছে। নদীর অতল থেকে কোটি কোটি ইবলিশ উঠে এসে দিগন্ত জুড়ে অট্টহাসি শুরু করে দিয়েছে যেন। কেমন ভয় করতে লাগল ফজলের।

আবার ইয়াছিনের সেই ভয়ঙ্কর গলা আর হাসি শোনা গেল, 'বেশি ঘ্যান ঘ্যান করবি না মাগী, একেবারে শ্যাষই কইরা ফালামু।'

সেই নারীকণ্ঠটি এবার মরিয়ার মত শোনাল, 'হেই করেন, তাইলে আমি বাইচা যাই। আপনে আমার হোয়ামীরে মারছেন।'

'হোয়ামীরে মারছি। পুরান হোয়ামীতে কতদিন আর হোয়াদ (সম্বদ) থাকে? নয়া হোয়ামী লইয়া অহন ঘর করবি। মন-ম্যাজাজ তাজা অইব।' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটানা অট্টহাসি চলল ইয়াছিনের।

এইবার অমানুষিক গলায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটি। বোরখার আড়ালে এমন একটা আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ কোথায় লুকিয়ে ছিল, ভেবে দিশেহারা হয়ে গেল ফজল।

চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত চকিত নারীকণ্ঠটি শোনা গেল, 'আমারে ছুইবেন না, ছুইবেন না। এই আপনের ধর্মের বিচার! এইর লেইগা অগো হাত থিকা আমারে ছিনাইয়া আনছেন? আপনে কইছিলেন না আমারে কইলকাতায় পৌঁছাইয়া দিবেন। আমারে ছুয়েন না—আঃ—'

'ইস, সতী বেউলা একেবারে! ছুয়েন না!' টেনে টেনে বলল ইয়াছিন।

তারপরেই ছইয়ের মধ্যে নতুন করে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়ে গেল। নৌকাটা ঢেউয়ের মাথায় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। এত দুলছে, যে-কোন সময় ডুবে যেতে পারে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ফজল। তার আগেই তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটি, 'আমারে বাচাও মাঝি, বাচাও। আমার সব্বনাশ কইরা ফালাইল।'

সে চীৎকার ফজলের শিরা-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা ফুঁড়ে চেতনায় বিঁধে গেল যেন।

ওপরে অবারিত আকাশ, হু-হু বাতাস, নিচে উথল-পাথল নদী। দুটি সওয়ারী ছাড়া কেউ নেই কোথায়ও। মনের মধ্য থেকে সলিমার স্বপ্নটা অনেক আগেই মুছে গেছে। শিরায় শিরায় রক্তস্রোতে কি এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল ফজলের। চোখদুটো বাঘের চোখের মত জ্বলে উঠল। সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন। ভয়ঙ্কর গলায় ফজল চেঁচিয়ে উঠল, 'মিঞাছাব—'

ডাকটা শেষ হবার আগেই হালের বৈঠাটা বাঁ হাতে শক্ত করে চেপে ধরে ডান হাতখানা আড়কাঠের নিচে ধারাল কোঁচের ফলাগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিল সে। আজ সারাটা রাত আবছা আকাশ আর মিটমিটে অগণিত তারার দিকে তাকিয়ে সলিমার স্বপ্ন দেখার সুন্দর একখানা সাধ ছিল তার। কিন্তু কে জানত, সেই সাধটার পাশে এমন একটা কদর্য দুর্যোগ ওৎ পেতে আছে।

ডাকটা কানে যাওয়ামাত্র ছই খুলে বাইরের পাটাতনে এসে বসল ইয়াছিন শিকদার। সঙ্গে সঙ্গে একরকম ঝাঁপিয়েই বেরিয়ে এল মেয়েটা। নৌকা কাত হয়ে ডোরায় জল উঠল। মেয়েটা সেইরকম অমানুষিক স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'আমারে বাচাও মাঝি, আমারে বাচাও। আমি তাঁতি-বাড়ির বউ। দাঙ্গায় আমার হোয়ামীরে মারছে অরা। আর এই—'

মেয়েটার গলায় অশরীরী একটা আত্মা যেন ভর করেছে। ফজলের স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে স্বরটা শিরশিরিয়ে বয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডর ওপর কি একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল অতর্কিতে। নিজের অজ্ঞাতসারে ফজলের হাতের থাবা থেকে কোঁচটা সাঁ করে ছুটে গেল। অব্যর্থ লক্ষ্য। ইয়াছিন বাধা দেবার আগেই সেটা তার পাঁজরে গেঁথে গেল। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল ইয়াছিন শিকদার, 'ইয়া-আ-আ —'

তারপরেই নৌকার ভার খানিকটা হাল্কা করে ইয়াছিনের শরীর ধলেশ্বরীর খরস্রোতে পাক খেতে খেতে কোনদিকে মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে কোঁচের ফলাগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে আবার ডোরার তলায় চালান করে দিয়েছে ফজল।

আতঙ্কে শ্বাসনলীটা বোধহয় চেপে চেপে আসছিল মেয়েটার। আঙুল ফেটে ঝিঁ ঝিঁ করে ঝিরঝিরা রক্ত ছুটবে। চোখের মণিদুটো হয়ত ঠিকরেই বেরিয়ে আসবে।

শান্ত, যেন কিছু ঘটে নি এমন ভঙ্গিতে ফজল শুধলো, 'আপনে কই যাইবেন?'

আবছা স্খলিত স্বরে মেয়েটি বলল, 'এইখানে আমার কেউ নাই। দাঙ্গায় সব পলাইছে। হোয়ামী মরছে। কইলকাতায় আমার এক ভাসুর আছে। হেইখানেই যাইতে চাই।'

ফজল আর কোন প্রশ্ন করল না। নৌকার গলুইটা শুধু তারাপাশা স্টীমারঘাটার দিকে ঘুরিয়ে দিল।

আবার একটানা খরস্রোত, সোঁ সোঁ ঢেউ, সাঁই সাঁই বাতাস।

ভোরে পুব আকাশে এক আস্তর ছায়া ছায়া আলোর যখন ছোপ ধরল ঠিক সেই সময় তারাপাশা স্টীমারঘাটায় এসে লগি পুঁতল ফজল।

নৌকার পাটাতনে নিস্পন্দের মত বসে রয়েছে মেয়েটি। মুখের ওপর ভোরের ফুটি ফুটি আলো এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে চোখ-দুটো চমকে উঠল ফজলের। চকিতের জন্য মেয়েটির মুখে যেন সলিমার আদল ফুটে বেরুল।

স্টীমারঘাটায় অসংখ্য মানুষের জটলা। যাযাবরের মত দেশের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে।

এক সময় মেয়েটিকে নিয়ে ওপরে টিকিটঘরের দিকে এগিয়ে এল ফজল। বলল, 'ট্যাকা দ্যান, আপনের টিকিট কিনা দিই।'

মাথা নিচু করে মেয়েটি জানাল, তার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই।

এক মুহূর্তে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ফজল। তারপরই চকিতে মনে পড়ে গেল, কোমরের গোপন গেঁজেতে যৌবনের সুন্দর স্বপ্ন কিনে আনার মূল্য রয়েছে।

একটুক্ষণ দ্বিধা করল ফজল। বুকের ভেতরটা একটু দুলে উঠল। তারপরই নিজের প্রাণের দিকে সবলে পিঠ ফিরিয়ে বিরাট জনসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলকাতার টিকিট কিনে আনল একখানা।

ইতিমধ্যে গম্ভীর শব্দ করে স্টীমার এসে গেছে। টিকিটটা আর টিকিট কিনে যে টাকাগুলো অবশিষ্ট ছিল—সে সবই মেয়েটার হাতে দিতে দিতে ফজল বলল, 'এই ট্যাকা কয়টা রাখেন। এত মানুষ যাইতে আছে, তাগো লগে কইলকাতায় গিয়া উঠবেন। পারবেন তো?'

'পারুম, কিন্তুক এই ট্যাকা—' অপরিসীম সঙ্কোচে মাথাটা নিচে নেমে গেল মেয়েটির। খানিকটা পর যখন সে চোখ তুলল, কাউকেই দেখতে পেল না। অবিশ্বাস্য ভোজ-বাজিতে মাঝিটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কেরায়া ঘাটে নিজের একমাল্লাই নৌকাটার দিকে ফিরে আসতে আসতে ফজলের কী মনে পড়ল? সলিমাকে? না। তাঁতি-বাড়ির ঐ সর্বস্বহীনা বউটিকে? না। দু-চারদিনের ভেতর সাত কুড়ি টাকা পণ দিতে না পারলে সলিমার বাজান অন্য জায়গায় মেয়ের সাদির ব্যবস্থা পাকা করে ফেলবে, সেই চিন্তাতেই কি বিকল হয়ে গেল ফজলের মন? তাও না।

তার মনে পড়ল কাল রাতের সেই রক্তাক্ত কোঁচের ফলাটার কথা। চেতনার ওপর দিয়ে দুলে দুলে তারা অবিরাম নেচে চলেছে। ধলেশ্বরীপারের মাটিতে কোন নিভৃত ছায়াতরুর তলায় সলিমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার আগে রাতের ক্রুর অন্ধকারে কতবার ইয়াছিন্দের আবির্ভাব হবে তার নৌকায়? কতবার?

ফজলের মনে পড়ল, কোঁচটায় অনেকদিন শান দেওয়া হয় নি। আজই ধার দিয়ে রূপার মতো ঝকঝকে করে তুলতে হবে সেটা।

শেষ লড়াই

এ, মান্নাফ

মিলন প্রাণপণে ছুটছিল। সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন শেষ-রক্ষার জন্যে ছোটে, ঠিক তেমনি। কপালে ফোটা ফোটা ঘাম। ভীষণ হাঁপাচ্ছে। মিলনকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে অবাক হল শংকর। রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানের সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। ছুটন্ত মিলনকে দেখে শংকরের মনে হল, মৃত্যু যেন মিলনের পিছু পিছু তাড়া করেছে।

মিলন ইউনিভার্সিটির সেরা ছেলে। খুব শান্ত। কোন ঝুট-ঝামেলায় থাকে না। মিলনকে কিছু কথা বলার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শংকর সুযোগ পায়নি। কিন্তু আজ নিভুনিভু সূর্য্যের ম্লান আলোতে মিলন এমনভাবে ছুটছে কেন? ভীষণ ভাবিয়ে তুলল শংকরকে।

মিলন ছুটতে ছুটতে একেবারে সামনে আসতেই—বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল শংকর। শংকরের বলিষ্ঠ শরীর ওর পথরোধ করল। শংকরের পরনে ছিল সাদা পাতলুন, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী। নাক খাড়া। শ্যামলা গায়ের রং। একসঙ্গে রাত কলেজে পড়ত ওরা। এখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। শংকর ইতিহাসে, আর মিলন ইংরাজীতে।

শংকর মিলনকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে মিলন? এত ছুটছিস কেন?'

মিলনের দম আটকাচ্ছে। কথা বলতে পারছে না। শংকর ওকে টানতে টানতে দোকানের ভিতর বসিয়ে সান্ত্বনা দিল, 'স্থির হ' মিলন তোর কোন ভয় নেই', তারপর শক্তকণ্ঠে আশ্বাস দিল, এই শংকরের সামনে কেউ তোর ক্ষতি করবে, এমন সাহস কারও নাই।'

মিলন ভালভাবেই জানে শংকর একটা গোপন রাজনৈতিক পার্টির সদস্য। শংকর

কাছে এলে মিলন সরে গেছে। শংকরকে মিলন পারতপক্ষে এড়িয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে শংকরকে, মিলনকে পরম বন্ধু বলে মনে হল।

এখনও নিজেকে সামাল দিতে পারেনি মিলন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, জল।

শংকর এক গেলাস জল বাড়িয়ে দিল। এক নিঃশ্বাসে জলটা পান করতেই শংকর পূর্ব প্রশ্নের জের টানল, কি ব্যাপার বলতো মিলন।

মিলন ভয়ে ভয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে রাস্তার প্রতি দৃষ্টি ছড়িয়ে বলে, কুকুর।

কুকুর! মানে—কুকুরে তাড়া করছিল তোকে?

মাথা নেড়ে সায় দিল।

কার কুকুর?

দীপিকাদের।

দীপিকা। যার সঙ্গে তুই খুব মেলামেশা করিস, অর্থাৎ জীবন গাঙ্গুলীর মেয়ে।

হ্যাঁ।

খুব তো পীরিত ছিল। হঠাৎ কুকুর লেলিয়ে দিল কেন?

আমি গরীব বলে।

জানিস তো তেলে-জলে মেশে না; তবু ঐ সব বুরজোয়া মেয়েদের সঙ্গে তোরা মেলামেশা করিস কেন?

ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠল মিলন, না না, আমি মেলামেশা করতে চাইনি, উভয় সমাজের দুস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করেই আমি এড়িয়ে চলছিলাম।

সত্যিই মিলন দীপিকাকে এড়িয়ে চলছিল। এ-ক্ষেত্রে গায়ে পড়ার দোষ মিলনের নাই। আজই ইউনিভারসিটির চত্বরে দীপিকার কবলে ধরা পড়েছিল মিলন। দীপিকার সামনে সে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

দীপিকা মিলনকে টানতে টানতে একেবারে মাঠের মাঝে আমগাছ ঘেরা পুকুরের ধারে এনে বসেছিল। চারিদিক নিরালা। চোখের পাহারার কোন বালাই নাই।

প্রথম মুখ খুলেছিল দীপিকা, ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হবার পর এমনভাবে আড়াল দিয়ে চলছ কেন?

ভয়ে।

কার ভয়ে?

নিজের।

তার মানে?

লোভ যদি বেড়া টপকাতে চায়?

সে সাহস তোমার আছে মিলন।

সেটা গ্রহণ করার দুঃসাহস তোমার কতটুকু, সেটাই তো এখনও আমার জানা হয়নি।

আজ আমাদের অনেক কিছু জানা জানির আছে মিলন।

সেই জন্যেই বুঝি আমাকে ধরে নিয়ে এলে এখানে?

ঠিক তাও নয়। কতদিন, মানে ইউনিভারসিটিতে জয়েন করার পর একসঙ্গে বসিনি, কথা বলিনি, স্বপ্ন দেখিনি, পাখামেলে উড়িনি।

ইতিমধ্যে শংকরের নির্দেশে দু'কাপ চা এসে গিয়েছিল। একটা কাপ শংকর নিজে তুলে নিয়ে অপরটি মিলনকে বাড়িয়ে দিল। চায়ের কাপে চুমু দিয়ে আবার সুরু করল মিলন—আগেই বলেছি শংকর, দীপিকাকে দেখলেই লোভ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দীপিকার একটা নরম হাতে চাপ দিতে দিতে বললাম—দীপিকা, আমার ভিতর আজ একটা পাওয়ার আকাঙ্খা প্রবল হয়ে উঠেছে।

মুখের কাছে মুখ এনে বলল দীপিকা, বল কি পেতে চাও।

সেটা এই মুহূর্তে তুমি আমাকে দিতে পারো ?

দীপিকা ভীষণ চতুর, চট করে ধরা দিতে চায় না। প্রশ্ন করল—সেটা কি ?

দস্যুর মত তোমার সর্বকিছু লুট করতে ইচ্ছা করছে।

নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা কিছু না পেয়ে পেয়ে ভীষণ লোভী হয়ে ওঠে। তাই হাতের কাছে যা পায় তাই চেয়ে বসে।

নিম্নমধ্যবিত্তদের ফিলোজফি শোনাবার জন্যেই কি ধরে নিয়ে এলে দীপিকা ?

ঠিক তাও নয়। কিন্তু তোমার এত অধৈর্য্য কেন ?

ধৈর্য্য ধরতে গিয়ে যদি হাতের কাছের জিনিষটাও হারিয়ে ফেলি।

ধারণ করার ক্ষমতা থাকলে কেউ কিছু হারায় না। আচ্ছা মিলন, তুমি তোমার জীবন নিয়ে কিছু ভেবেছ ?

প্রয়োজন কি ?

প্রয়োজন আছে। যদি আমি বলি, তোমার জীবনটা একটা পাত্র মাত্র।

সে পাত্রে তোমাকে স্থান দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

মিলন তোমার ডাকে সাড়া দিবার আগে আমাকে দেখতে হবে, সে পাত্রের গভীরতা কতটুকু ? পাত্রটা কত শক্ত। কেন না আমারও তো একটা ওজন আছে। যদি তোমার পাত্রটা সেটা ধারণ করতে না পারে।

আমার মনের পাত্র অনেক বড় দীপিকা।

জানি, কিন্তু আমার রূপ-যৌবনের কি কোন ঘাটতি আছে ?

রূপ-যৌবন দিয়ে তা পূরণ হবে না দীপিকা !

বাকীটা যদি ঐশ্বর্য্য দিয়ে পূরণ করি !

তোমার ঐশ্বর্য্যকে আমার ভীষণ ভয় করে।

ঐশ্বর্য্য না থাকলে জীবন কোথায় ? ঐশ্বর্য্য মানেই তো ভোগ।

ভোগই যখন তোমার জীবন, তখন তোমার পাশে আমাকে মানাবে না দীপিকা। আমাকে ছেড়ে দাও।

আমি যদি তোমার ভোগের গ্রাউণ্ড তৈরী করেদি ?

কোন স্বার্থে ?

তোমাকে ভালবাসি বলে।

শিশিরদাও তোমাকে ভালবাসেন দীপিকা।

সে ভালবাসার অযোগ্য মিলন।

শিশিরদা অবশ্য অন্য জগতের মানুষ।

ভুল করছ মিলন। আমরা সকলে এক জগতের মানুষ, শুধু কৌশলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ভোগটার উপর দখল রেখেছি। প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে একটা আলাদা সমাজ সৃষ্টি করেছি। তোমাকে আমি সেই সমাজে তুলে দিতে ইচ্ছুক।

আমি নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, আমি কি পারবো উপরে উঠতে ?

তাহলে ইউনিভারসিটিতে এসেছ কেন ? লেখাপড়া শিখে মায়ের দুঃখ ঘুচাবে, জীবন স্বচ্ছন্দে আনবে এই জন্যেই !

ঠিকই ধরেছ দীপিকা।

তাহলে উপরে উঠতে ভয় কি ?

যদি পড়ে যাই !

আমি সিঁড়ি ধরে থাকবো। এখন আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও তো।

শুরু কর।

তোমার বাবা তো বেঁচে নাই, মা কি করেন ? আই মিন, তিনি কিভাবে জীবন-যাপন করেন ?

তিনি সৎ জীবন-যাপন করেন।

তুমি তো ষ্টাইফেনের টাকায় লেখাপড়া করছ। আর তোমার মা কিভাবে রোজগার করেন ?

মিলন অম্লান বদনে বলল, কাঁথা শেলাই করে। অবসর সময়ে পুকুরের ধারে ধারে তরকারী অভাবে শাক তুলে বেড়ান। বাঁশ বাগানের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো কঞ্চি সংগ্রহ করেন। গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে তৈরী করে বিক্রি করেন।

এইভাবে বাঁচা যায় মিলন ?

এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন তো এইভাবে কাটছে দীপিকা,

এসব কথা আমার বাবার সামনে কখনও বলবে না। তার সামনে এ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মত নিজের সম্বন্ধে ভীষণ বড় বড় বুলি কপচাবে।

মিথ্যা ভাঁওতা দিয়ে আমি স্বপ্ন রচনা করতে চাই না দীপিকা।

জানো মিলন, আমরা সবাই পরস্পরকে ভাঁওতা দিচ্ছি। গত রাতে বাবা যখন টলতে টলতে বাড়ি ফিরলেন, মা জিজ্ঞাসা করলেন—কি খাবে ?

বাবা অম্লান বদনে জবাব দিলেন—কিছু না।

কেন খাবে না ?

হোটেলে খেয়ে এসেছি।

আমি জানি বাবা মাকে ভাঁওতা দিলেন। বাবা তার এ্যাংলো ছুঁড়িটার সঙ্গে ফুর্তি-মেরে বাড়ি ফিরছেন।

তোমার মা এ খবর জানেন না ?

আমাদের নিয়ম হল, পুরুষদের সব খবর মেয়েদের না রাখা। তাতে দুঃখ বাড়ে। আমি বাবার সঙ্গে ঐ মেয়েটির বাড়ি গিয়েছি। বাবা আমাকে নিষেধ করে দিয়েছেন। এর ফলে আমার টু-পাইস আয়ও বেড়েছে। আমাকে রীতিমত সমীহ করে চলছেন। বাবাকে তোমার চাকরির কথা বলেছি, প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছি।

তোমার বাবা যে টলতে টলতে বাড়ি ফেরেন, তার জন্যে তোমার মা কিছু বলেন না ?

বলার অবসর কোথায় ? বাবার যেদিন বেসামালা অবস্থা, সেদিন একগোছা নোট টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বাবা শুয়ে পড়েন। ঐ নোটগুলো গুণতি করে স্তরে স্তরে সাজাতে মায়ের অনেকটা সময় লাগে, বাবা তখন নাক ডাকাতে সুরু করেন। তাছাড়া টাকার বিনিময়েও তো একটা মানুষকে ক্ষমা করা উচিত। প্রথমদিন মা তো টাকা দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বিস্ময়কণ্ঠে মা বলে উঠেছিলেন, এত টাকা কোথায় পেলে ?

বাবা বলেছিলেন, ভয় নাই গো ভয় নাই, অফিসের ক্যাশ ভাঙ্গিনি। আইনকে একটু চেপে রেখে, বে-আইনকে সামান্য প্রশ্রয় দিয়েছি মাত্র।

তোমার বাবা নিশ্চয়ই ঘুষ খান ?

মিলন, এ-দেশের ঘুষ শব্দটা কি নতুন ? নইলে লোকে এত বাড়ি গাড়ি করছে কি করে ? সৎভাবে জীবন কাটিয়ে ? মাইনের টাকায় ? অসম্ভব। নিম্নমধ্যবিত্তদের সেণ্টিমেণ্টের এখানে কোন স্থান নাই। এখন ওঠোতো বাবার কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো।

এই পর্য্যন্ত বলে, চায়ের তলানিটুকু নিঃশ্বেস করে নীরব হল মিলন।

শংকর জিজ্ঞাসা করল—তুই কি গুড বয় সেজে বড়লোক হবার নেশায় সুড়সুড় করে দীপিকাকে অনুসরণ করতে আরম্ভ করলি ?

তুই ঠিক ধরেছিস শংকর।

দীপিকা তোর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিল কখন ?

দীপিকা কুকুর লেলিয়ে দেয়নি শংকর। দীপিকার সতর্কবাণী ভুলে, আমার মায়ের সত্যিকার পরিচয় বলতেই—দীপিকার বাবা তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, তুমি ঘুটেওয়ালীর ছেলে !

আমি তখন চীৎকার করে উঠলাম—আমার মা সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার নোংরা কথা উচ্চারণ করলে ঘুষিয়ে আপনার মুখের ছবি পালটিয়ে দিবো। আমার মা একজন সৎ মহিলা। কোন প্রলোভন তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে নি।

শংকর আনন্দে মিলনকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুই আচ্ছা জবাব দিয়েছিস মিলন। আমি জানি তোর মধ্যে একটা শক্তি আছে। তোকে আমাদের দরকার, বল-বল মিলন তারপর ?

তারপর জীবন গাঙ্গুলী জলন্তচোখে দীপিকার প্রতি চেয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন, এই ঢোড়াসাপটাকে কোথা হতে ধরে এনেছিস ?

কম্পিতকণ্ঠে দীপিকা বলল, ইউনিভার্সিটির সেরা ছেলে বাবা।

এরা দেশের শত্রু।

ঐ জীবন গাঙ্গুলীর দল যে আমাদের জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করছে, তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই আমরা দেশের শত্রু। তারপর বল মিলন জীবন গাঙ্গুলী কি করল ?

তারপর জীবন গাঙ্গুলীর কর্কশ কণ্ঠস্বর বেজে উঠল—হনুমান, কুকুরটা ছেড়ে দে।

তখন দীপিকা কি করল মিলন ?

দীপিকা তখন আমাকে টানতে টানতে ঘর হতে বের করে দিয়ে বলল, পালাও পালাও, নইলে এখুনি ছিঁড়ে দিবে তোমাকে। ঐ দীপিকার জন্যেই তো বেঁচে গেলাম শংকর।

মিলন, সত্যি করে বলতো, এইভাবে এই সমাজে বেঁচে থাকা যায় ?

আমাদের কি করার আছে শংকর ?

দেওয়ালে দেওয়ালে আমাদের পোষ্টারগুলো লক্ষ্য করেছিস ?

করেছি।

শ্লোগানগুলো পড়েছিস ?

পড়েছি।

তাহলে এখনও তুই আত্মগোপন করে আছিস কেন ? বল মিলন বড়লোকের কুকুরের কামড় খেয়ে বাঁচতে তোর ঘৃণা করে না ?

করে। কিন্তু শুধু কি শ্লোগানে কাজ হবে শংকর ?

জনজাগণের জন্যেই শ্লোগান। এবার আমরা শ্লো-টা কেটে শুধু গানটা তুলে নেব রে, আয় আমার সঙ্গে।

মিলনের হাত ধরে টানতে টানতে চায়ের দোকান হতে বেরিয়ে ওরা অন্ধকারে মিশে গেল।

সুখেন গুঁই ও মুথাঘাস

আবুল বাশার

সুখেন গুঁইয়ের দিনে দিনে সব কেমন অস্পষ্ট ঠেকছে। কোন কিছুরই আখরি-রহস্য সে ভেদ করতে পারছে না। বসুমতী বড়ই উতলা হয়েছেন। মানুষের দুনিয়াদারী হয়ে উঠেছে নিতান্ত পঙ্কিল। ধরিত্রীর কোলে অন্ন আর ঘাসের অভাব, ধরিত্রীর কোলে ফুল নেই। মধুদণ্ডীর চটানে কতকাল বাদে বহুবর্ণ পাখির পাঁচখানা পালক কুড়িয়ে পেয়েছে সিধু পরামাণিকের ছেলে সুধন্য। বাংলা মায়ের সংসারে এ খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে কিনা সুখেন গুঁই সবিস্তারে বলতে পারে না। একখানি দৈনিক পত্রিকায় পাঁচটি খুনের কাহিনী লেখা হয়েছে, পাঁচটি পালকের সংবাদ ছাপে নাই। সুখেন গুঁই সাংবাদিক হলে কাগজের প্রথম পাতায় সংবাদটি বড় করে, মস্ত মস্ত অক্ষর সাজিয়ে এঁকে দিত। কিংবা সুখেন গুঁই এইরূপ সংবাদ ছাপানোর উপযোগিতা বোঝাতে গিয়ে বার্তা-সম্পাদকের কাছে তিরস্কার সহ্য করত। অন্তত সে মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারত। সেই দুর্ভাগ্যে বঞ্চিত সুখেন বর্তমানে ঘাসপুরের ডিহিতে গরু চরাচ্ছে। তার সংসারে ভগবতীর কৃপায় দুইটি গাভী লাভ হয়েছে।

খবরের কাগজে লিখবার কণামাত্র সাহস কিংবা যৌক্তিকতা সুখেনের না থাকলেও, অভিপ্রায় এবং বাসনার বাঁধন সে কোথাও রাখে নাই। কেন না, নির্বোধের কল্পনা সব সময় অসংযত এবং দুঃসাহসিক। একেবারে উদ্ভট ও অন্যায্য। যা খুশি যেমন খুশি, যেথা খুশি সেথা পৌঁছানোর এবং ভাববার শক্তি, উৎসাহ আর অবকাশ তার অফুরন্ত। কারণ, সবই সে কল্পনা করতে পারে। সব প্লটই তার কল্পনার ক্রীড়াক্ষেত্র। এই আকাশ নিয়ে তার কল্পনা সীমাহীন। সবুজ অরণ্য তার কল্পনার বিষয়। সে তার গরু নিয়ে ভাবে। গরুর ঘাস নিয়ে চিন্তা করে। গরুর জল নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। গরুর চিন্তা তাকে অন্নের চিন্তায় পৌঁছে দেয়। গরুর ঘাস তাকে ঘাস-

পতঙ্গের সমীপবর্তী করে, তার কল্পনায় সাধু ভাষা আছে কথ্য ভাষা আছে। গরুর চিন্তা তাকে খবরের কাগজের ভাষা চিনতে শেখায়। কেন না সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরাজীতে ফেইল হওয়ার পর বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করে। এবং তারপর গরুর পেছনের সঙ্গে বাক্য বিনিময়ের আজৈবনিক নাটক এই বসুধা-বক্ষে মঞ্চস্থ করছে। সে কাঙাল হয়েও কবিতা ছাড়ে নাই। অন্ন নাই, ঘাস নাই, জল নাই, তথাপি তার কবিত্ব থেকে গেছে। কারণ, তার দুইটি গাভী আছে। গাভীই তার কল্পনার উৎস। দুর্মর কল্পনা নিয়ে এখন সে গরু চরাচ্ছে। কালো গরুটির নাম কৃষ্ণা। সাদা গরুটি সরস্বতী। সরস্বতীর ছবি সে গত হপ্তায় সংবাদপত্রে মুদ্রিত দেখেছে। একটি গাভী, অবশ্যই কোন নাগরিক গাভীকে সে সরস্বতী ভ্রমে আশ্বস্ত হয়েছে। গ্রামে কোথাও ট্যাপের জল নাই, ট্যাপও নাই। গরুটি তেষ্টার চোটে জিভ বার করে ট্যাপের গোড়া চাটছে। ট্যাপের যে নাক দিয়ে জল গড়ায় সেই নাক শুঁকছে। সরস্বতীই ঠিক। ছবির তলায় লেখা রয়েছে 'খরা'। ছবিটির প্রতীক-মূল্য সে বোঝে না। কিন্তু ঐ ছবি তার মর্মে গিয়ে বিঁধেছে।

সাংবাদিক ভুল করেছেন। ওখানে কৃষ্ণার ছবি ছাপা উচিত ছিল। কৃষ্ণার গায়ে হাত বুলিয়ে চিন্তা করল সুখেন গুঁই। সরস্বতী একটু এগিয়ে ঘাসের বদলে মাটি চাটছে। কৃষ্ণার রঙ কালো। কালো রঙ রোদ এবং খরা শোষণ করে বেশি। ফলে দ্রুত তার গলা শুকিয়ে যায়। কালো চাষা রোদ এবং খরা শোষণ করে বেশি, তাই দ্রুত তেতে ওঠে। কালো এবং সাদা রঙ দুটির তাৎপর্য সাংবাদিক বোঝে না। কৃষ্ণার ছবি ছাপলে গুরুত্ব অনেক বেড়ে যেত। ভাবতে গিয়ে সরস্বতীর ওপর মায়া বেড়ে গেল সুখেনের। চাষার গায়ের রঙও কখনো কখনো উজ্জ্বল হয়। সাদা চামড়ার ভুপেন কি ক্ষেতমজুর নয়? সুখেন আপাতত বর্ণ-বিদ্বেষ ত্যাগ করে। কমলীডাঙার সবুজ টুকরো অরণ্যের দিকে চায়। ওখানে কি ঘাস আছে।

সুখেনের অনুভূতির মধ্যে সংকট ঢুকেছে। সব কিছু সরে যায় কেন? কত কাছে নদীটা ছিল। সরে যাচ্ছে দিনকে দিন। জল সরে যাচ্ছে। জাগছে কেবলই বালি। সবুজ অরণ্য লোপাট হয়ে গেল। অরণ্য সরে গেল। কোথায় গেল গভীর অরণ্যের গাছপালা, লতাগুল্ম, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার? গো-চারণের মাঠ, গো-দহ-র জল, কাদা, হিম—সে বা কোথায় গেল? সবুজ অরণ্য ছাড়া, গাছপালা ছাড়া মানুষ বাঁচে কিনা সুখেন ঠিক জানে না, গো-চারণের ঘাস ছাড়া কৃষ্ণা সরস্বতী যে বাঁচে না, সুখেন গুঁই খুব স্পষ্ট করে বোঝে।

সেই সকালে বেরিয়ে পড়েছে কোঁচড়ে চাল-ভাজা নিয়ে। পাকুড়িয়া বেন্দাসপুর পেরিয়ে সুবাসপুরের দহ। সেখানে জল নাই কাদা নাই। মধুদণ্ডীতে এসে দেখল চারদিক ধূ ধূ করছে। সামনে কলমীডাঙাও মস্ত কুহেলিকা। কী হবে কৃষ্ণার? কী হবে সরস্বতীর? সুখেন ভূমিহীন। শস্য করবার জমি নাই তার। পেটের অন্নের জন্য। গরুর খাদ্যের জন্য। অথচ তার দুইটি দুধেলা গরু আছে। বাজারে এখন গো-খাদ্যও বিক্রি হয় না। বিক্রির জন্য যদি কিছু ভুঁস আসে, কেনবার কড়ি নেই।

কৃষ্ণা-সরস্বতী বাঁচবে কী করে ? সুখেন শুনেছিল, সরকার গো-খাদ্য দিচ্ছেন পঞ্চায়েত মারফত। পাঁচ-সাত বছর আগে, অন্য রাজার জমানায় সুখেন গুঁই চৌধুরীদের বৈঠকে কাগজের সংবাদ পড়েছিল, ভুঁসি লইয়া কেলেঙ্কারী. অমুক মন্ত্রী, অমুক এম. এল. এ. মিলিয়া উক্ত ভুঁসি খাইয়া ফেলিয়াছেন. মানুষ হইয়া গো-খাদ্য খাইবার পাকস্থলী মানুষের পেটে গজাইল কী করিয়া সুখেন বুঝিতে পারে নাই। অবশেষে এ বছর সুখেন মুথা ঘাসকে শাপান্ত করেছে। ভোর থেকে সন্ধ্যা ইদানীং মুথাঘাসই তার উত্তম প্রসঙ্গ। কারণ, পঞ্চায়েত ভবনের উঠোনে বসে সুখেন গুঁই পঞ্চায়েত প্রধানের রাজনৈতিক আলাপ শুনেছিল গত সাত দিন পূর্বে. এ বছর। 'খরায় রাজ্য-সরকার গো-খাদ্য সরবরাহ করবেন।' শুনতে শুনতে সুখেনের বার বার কৃষ্ণা ও সরস্বতীর শুকনো মুখ মনে পড়েছিল। প্রধানকে শুধিয়েছিল—কবে দেবেন সেই ঘাস ?

প্রধান হেসে ফেললেন—ঘাস কিসের ? গরুর শুকনো খাবার দেব আমরা। দেব, যারা প্রান্তিক চাষী, তাদের। তুই তো পাবিনে সুখেন। তোর যে জমি নেই বাপু। সুখেন বলেছিল—তবে ঐ শুকনো খাদ্য বলদের জন্য। গাইটাই উপোসে থাকবে বলছেন, মা ভগবতীর মুখে গ্রাস উঠবে না ?

বলতে বলতে ঢোক গিলেছিল সুখেন। গলার কণ্ঠি-মালায় করুণার্ত ঢোকটুকু বেশ কষ্ট করে নেমে গেল। মালার সাথে গলার মাকুর মতো হাড়খানা নামা-ওঠা করল। সেদিকে চেয়ে ঘর্মাক্ত সুখেনকে মিঠে হেসে বললেন প্রধান—গ্রাস উঠবে কী করে বলবি তো ; বরাদ্দ হয় নাই। আমাদের সমাজে স্বামী-পুত্র খাবে, কাচ্চাবাচ্চা খাবে, তারপরে তো মা। মা খাবে সবার শেষে। তোর কৃষ্ণা, তোর সরস্বতীর জন্য বরাদ্দ হয় নাই সুখেন। গো-খাদ্যের বাজেটে নারী উপেক্ষিত। আমি এটা নোট করলাম সুখেন। গো-বাজেটের সাথে ভূমিহীনের যোগ নাই। এটাও নোট করা রইল। এটাকে যেন একটা ভুজুং ভেবে নিও না। আমি দুঃখ পাব বাছা।

তারপরই মুথাঘাসকে গালি-গালাজ করেছে সুখেন গুঁই। ধরিত্রী মায়ের কোলে মুথাঘাসও গজাতে পারছে না। সবচেয়ে শক্ত যার প্রাণ। সবচেয়ে দ্রুত গজিয়ে উঠে বেড়ে যাওয়ার ক্ষমতা যার বিস্ময়কর, সেই মুথাও আজ নিস্পন্দ। চৈত্র গেছে, বৈশাখ গেছে, জ্যৈষ্ঠও নির্বিকার। আষাঢ় এসেছে। বৃষ্টির ছোঁয়া লাগেনি ঘাসের শিকড়ে, যা দু'চার ফোঁটা পড়েছিল, বালুকা শুষে নিয়েছে, মৃত্তিকা জিভ দিয়ে টেনে নিয়েছে। গরু যখন বোবা হয়ে গেল, কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিলেন ভগবান। আগেকার কালে গরুর মুখে স্পষ্ট ভাষা ছিল। সুখেন এ কথা বিশ্বাস করে। কেন করবে না ? কৃষ্ণা-সরস্বতী তো দুনিয়ার মানুষ দেখেনি। দেখলে বুঝত, বোবা গরুও কথা বলে, তার স্পর্শ শক্তি আছে। ঘ্রাণ শক্তি আছে। কষ্টের অনুভূতি আছে। গরু কাঁদতে জানে। দুধের থলিতে আপন বাচ্চার জন্য দুধ লুকিয়ে রাখতে জানে। তার পক্ষে কথা বলা কি অস্বাভাবিক ছিল ? তা, ভগবান সেই কথা বলার ক্ষমতা নিংড়ে কেড়ে নিলেন। কেন নিলেন ?

গরু নাকি চাষীর কাজের সমালোচনা করত। চাষী যখন ধরে মারত গরুকে, অবাধ্যের মতন চিৎকার করত গরু। অভিযোগ করত। নালিশ করত। চাষীর মারধোর করার ব্যাঘাত হোত। ইচ্ছে মতন খাটানোয় অসুবিধা হোত। জোর করে দুধ নিংড়ে নেওয়ার বেলা তর্কাতর্কি হোত। গরুর মনিবের তা সহ্য হল না। সেই কারণে গরু বোবা হয়ে গেল। ভগবান যখন মুখের ভাষা কেড়ে নিলেন, তখন ভগবানের দয়াও হল খুব।

সুখেন কৃষ্ণার গলায় হাত বুলিয়ে ভাবল, ঘণ্টা নাড়িয়ে চিন্তা করল, মুখের ভাষাই যদি না থাকবে, তবে জলের ট্যাপে মুখ ঘযে কেন সরস্বতী? আহা! তাই কি? মুখে কথা নেই বলেই তো, অমনি করে ট্যাপের মুখ ধরে জিভ মেলে দিয়েছে। অতএব ভগবানের দয়াও হল খুব। সুখেন দেখল, খাসিপুরের পথ ধরে পুবকোণ বেয়ে কলমা-ডাঙার অরণ্যের দিগন্ত ভেঙে কে একজন যেন এদিক পানে এগিয়ে আসছে। এক ফোঁটা পাখিও হোতে পারে, মানুষও হোতে পারে। আকাশে দুর্ভিক্ষের চিল চক্কর দিচ্ছে। কখনও বা কেঁদে উঠছে টানা সুরে। সুখেন ভাবল, ভগবানের দয়াও হল তখন। ভগবান সবাইকে ডাকলেন। সবাই তো আর আসবে না। কেউ কেউ এল। গাছ এল। লতাপাতা এল। পোকামাকড়ও এল। পশুপাখি এল। কিছু কিছু সবাই এল। ভগবান তখন সকলকে বললেন—আমি গরুর মুখ বন্ধ করে দিলাম। গরু আর কথা বলতে পারবে না। খাদ্য-খাবার চাইতে পারবে না। কোন আপত্তি অভিযোগ তুলতে পারবে না। এই অবস্থায় গরুর ভার কে নেবে? গরু খাবে কি? ধান পাট বলল—আমরা পারব না। মানুষ আমাদের দখল করে নিয়েছে। গাছপালাও বলল, আমরাও নারাজ। আমরাও মানুষের কথা ভাবছি। তা সত্ত্বেও আকাশের কাছে আমরা জল চাইব। গরুও জল খায়। কেউ ঠিক রাজি হোতে পারল না। তখন মুথা ঘাস ছিল। সে বলল—তোমরা একটু জল চেও, ওতেই হবে। আমি গরুর দায়িত্ব নিলাম। চাষা আমায় কেটে মেরে শেষ করতে পারবে না। আমি মিনিটে মিনিটে মাথা তুলে দাঁড়াব। ফসলের ভুঁইতেও আমি থাকব। ওখানেও আমার বীজ ঘুমিয়ে থাকবে। জল পেলেই আমি লাফিয়ে উঠব। চাষা আমায় কেটে ফেলে যেই এক পা তুলে নিড়ানী করে এগোবে, আমি সাথে সাথে ওর পেছনে গজিয়ে যাব। গল্পটা বলেছিল তমিজ সেখ। বলেছিল সুখেন গুঁইকে। মুথার গোড়া অব্দি কেটে ফেলে পাঁচ মিনিট পর হাত ধরে টেনে এনে দেখিয়ে দিল, দ্যাখ সুখেন, মুথার চোট দ্যাখ! পাঁচ মিনিটেই মুথি ধরেছে। কাল এসে দেখবি, আজ যতেক খানিক ঘন আর লম্বা ছিল, তারও চার গুণ ঘন আর লম্বা হয়ে দাম-পাটি বেঁধে থাকবে। মুথার আশীর্বাদ না থাকলে গরু বাঁচত না।

এসব হল রূপকথা। রূপকথা হলেও সুখেনের কাছে সত্যি। পৃথিবীর বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তা করে নিতে হবে, সুখেন কেন গরুর রূপকথা ভালবাসে, কেন সে কম বুদ্ধির শৈশবে বয়সকে বেঁধে রেখে এই জগতের মুথা ঘাসকে অভিশাপ দেয়। সুখেন

ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফেইল করেও বর্তমানে বড় জোর নিত্যদিন বাংলা ভাষায় পাঁচশ'টি শব্দ ব্যবহার করে। এবং প্রতিদিনই কেন একই শব্দ ব্যবহার করে। তার অভিধান পাঁচ-ছয়শ'টি শব্দেই সমাপ্ত (খবর কাগজ পড়া বাদে)। সে নিঃশব্দে গরুর পশ্চাদ্দেশে চেয়ে থাকে। ঐ ভাষাহীন গহ্বরই দিনমান তার শ্রোতা ও বক্তা।

অতএব গরু যে কথা বলতে পারত, এ কথা মিথ্যা নয়। মুখা একদিন গো-খাদ্যের দায়িত্ব নিয়েছে, কোন মিনিস্টার নয়, এ কথাও সত্য। সুখেন হঠাৎ শুনতে পেল, নিঘাস জমিনে কোথায় একটা ব্যাঙ ডাকছে শুকনো গলায়। সুখেন ধাঁ করে রেগে উঠল। ক্ষ্যাপা ঘ্রাণ-শক্তিসম্পন্ন শিকারী কুকুর যেমন করে ওঠে, তেমনি লোম-খাড়া করে তুলল সুখেন। সমস্ত সত্তা আগুনের পিণ্ড হয়ে জ্বলে উঠল। আজ ব্যাঙটাকে খতম করে দেবে সুখেন গুঁই। নাড়ীভুঁড়ি ছিটিয়ে দেবে। গলা টিপে মেরে দেবে। বাঁচতে দেবে না। শালা মিথ্যুক। শালা ভগবানের কাছে বৃষ্টির জন্য কাঁদবে বলেছিল। আজ তিন মাস এই খরায় শুকনো দগ্ধানো দিনে কিম্বা রাতে সেই ব্যাঙের গলা শুনতে পায়নি সুখেন। মুখা ঐ ব্যাটার কারণে গজাতে পারছে না। শালা কাঁদে না কেন? ব্যাঙের কটকটে গলা অনুসরণ করে জমিনের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ল সে। খুঁড়তে লাগল পাগলের মতন। কৃষ্ণা আর সরস্বতী (সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত নাম শুধুই সতী) আলগা পেয়ে পায়ে পায়ে গোর আলি ব্যাপারীর আম বাগানে চরতে ঢুকে গেল। সুখেনের খেয়াল রইল না কিছুক্ষণ। মাটি থেকে সহসা কেমন অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ উঠতে লাগল। সুখেন গুঁই মাতোয়ারা হয়ে উঠল। এমন শুকনো মাটির তলায় এমন গন্ধ কিসের? কোন ফলটল নেই তো? এই ধারা গন্ধ ছড়িয়ে ধরিত্রী সন্তানকে কী বলতে চায়? অনেক খুঁড়েও ব্যাঙ বা ফল কিছুই পেল না। ব্যাঙটা ঠিক এই সময় খানিক দূরে মাটির তলায় ফের ডেকে উঠল। কী মারাত্মক ছলনা ঃ মনে মনে বিড়বিড় করে লক্ষ মতো লাফিয়ে পড়ল সুখেন। খুঁড়তে খুঁড়তে পরিশ্রান্ত হয়ে ধোঁকাতে থাকল। পেটে দানাপানি নাই। ঘরে অন্ন নাই। ভাতের জোগাড় নাই বলেই সুখেন সামান্য চাল কয়টা ভেজে কোঁচড়ে নিয়ে বেরিয়েছে। গাই দু'টিকে খাইয়ে নিয়ে যাবে। দুইবে। তারপর সেই দুধ বাজারে বেচে চাল আনবে। এতদূর এসেছে, শুধু দু'মুঠো কাঁচাঘাস পাবে বলে। আকাশ থেকে আগুনের হল্কা মারছে সূর্য। সব ছারখার হয়ে যাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের ফল আমষি হয়ে বায়-নড়া হয়ে ঝুলছে। এ বছর আমও ধরেনি তেমন। কারো বাগানে আম ধরলেই বা সুখেনের কী এসে যায়? যখন বউল ধরে, তখনই তো বাগান বিক্রি হয়ে যায়। ঝড় হলেও সেই আম মাটিতে পড়ে থাকে না। গরিব ছুঁতে পায় না। বাগান যারা কেনে, তারা পাহারা দিয়ে সেই আম খুঁতিতে ঢোকায়। কলকাতায় চালান দেয়। সুখেন এ বছর একদিন মাত্র আধ কে.জি. কিনে জিভে দিয়েছে। তাও আধ কে.জি. দুধের বদলে। ধরিত্রীর এই গন্ধ কিম্বা ব্যাঙের ডাক আসলে মিথ্যা মায়া। আকাশে চাইল সুখেন গুঁই। দিগন্তে চোখ পড়ল। এত হাহাকারের মধ্য দিয়ে একটি যুবতী মতন কে যেন দেখা যাচ্ছে দূরে। সেটাও মায়া হোতে পারে। চেয়ে দেখল, কৃষ্ণা

আর সতীকে দেখা যাচ্ছে না। সুখেন ভাবল, কেউ কথা রাখে না। ব্যাঙ বা মানুষ। কেবল ধরিত্রীর বুকে আশ্বাসের সুবাস ওঠে। তাও এক আশ্চর্য অনুভূতির মধ্যে বিপন্ন করে মানুষকে। সুখেন গুঁই লাফিয়ে উঠে গোর আলির বাগান-মুখো ছুটতে লাগল। বাগানে ঢুকে অবাক হল। একি! বাগানের পুকুরের পাড়ে জলের কাছাকাছি প্রচুর মুথা জন্মেছে। সামান্য জল রয়েছে শান্ত হয়ে। তলার মিষ্টি কাদা শুয়ে আছে। কৃষ্ণা বা সতী এ দৃশ্য দেখতে পায়নি। ওরা কোথায়? ঘাড় তুলে ওদের দেখতে পেয়ে দ্রুত ছোটে। হঠাৎ সুখেন কৃষ্ণার নামানো ঘাড়ের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। মুখের তলায় পাকা একটা হলুদ ল্যাংড়া আম। কৃষ্ণা মুখে তুলে নিয়েছে। এক লাফে কৃষ্ণার গায়ে হাত দিল সুখেন। গলা চেপে ধরল সাথে সাথে। দ্রুত কৃষ্ণার মুখে হাত ঢুকিয়ে আমটাকে টেনে আনল। তখন কৃষ্ণা কথা কইল, মৃদু আর্তনাদ করল, গোঁ-ও-এ করে ডাকল। কৃষ্ণা কি কাঁদতে পারে? কৃষ্ণার কান্নাকে উপেক্ষা করে সুখেন একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ির ওপর চেপে বসল। আম খেতে লাগল।

গরুর নাম কি মহেশ হয়? যাত্রায় দেখেছে সুখেন গুঁই। তা যদি হয়, তবে কৃষ্ণাও হয়, সরস্বতী না হোক, সতী তো হয়ই। বিড়বিড় করে বলতে বলতে সুখেন হি হি করে হেসে উঠল। এখন সে জোয়ান ছেলে। ছেলেবেলায় গরুতে আম খেত। বাগানে গরু চরে বেড়াত। আঁটি আম ছিল গো-খাদ্য। কোন শালা বিশ্বাস করবে না। অম্বল আম মানুষ স্পর্শ করত না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকত: গরু সেই আম খেয়ে গড়াগড়ি দিত। আয়েস করত। জামগাছ তলায় পুরু আস্তরণ পড়ে থাকত জামের।

সে সব সুখেনের চোখে এখন সিনেমা হয়ে গেছে। তারও কত আগে শরৎবাবু যাত্রা (?) লিখলেন, নাম দিলেন মহেশ। গরুর নামে নাম। গফুর ক্ষুধার্ত মহেশকে ভাঙা চালের খড় টেনে খাইয়ে মানুষকে কাঁদিয়ে দিল। হায়, হায়! মানুষ কত শখ করেই না কাঁদতে পারে। মানুষ কত রকম করে কাঁদে! কৃষ্ণা সুখেনের মুখে মুখ বাড়ায়। সরস্বতী মুখ দিতে আসে। ওদের পেট ওঠেনি। মাটি চেটে পেট ওঠার কথা নয়। বাঁটে দুধ নামেনি। আকালের টানে বাঁটগুলি পেটে লেগে আছে। চেয়ে দেখতে, দেখতে, ভাবতে ভাবতে, সুখেন গুঁই টস্ টস্ করে কেঁদে ফেলল। বলল—দাঁড়াও মা জননীঃ আগে সন্তান খাক্, পরে তুমি চেটেপুটে খেও।

এই দৃশ্য গাছের আড়াল থেকে দুই চোখে গিলে নিচ্ছিল সেই দিগন্ত থেকে বয়ে আসা মেয়েটি। তার চোখ আশ্চর্য চকচক করছিল। সুখেন মেয়েটিকে দেখতে পেল না। আম খাওয়ার পর আঁটি ছুঁড়ে ফেলল সে। কৃষ্ণা বা সরস্বতী দু'বার দু জনে শুঁকে দেখল মাত্র। খেল না। ভগবতী কারো এঁটো খায় না বুঝি? এঁটো-চুকাই তো খাদ্য তার।

হাতের হেঁসো বাগিয়ে পুকুরপাড়ের জলের কাছে নেমে গেল সুখেন। কচ্ কচ্ করে মুথা কাটতে লাগল। পাঁচ পোঁচ লাগিয়ে থেমে গেল। জল তেষ্টায় বুক খাঁ খাঁ করছে। এমন সময় কৃষ্ণা আর সতী এগিয়ে এল পুকুর পাড় বেয়ে। পেছনে সেই মেয়েটি।

সুখেন মেয়েটিকে দেখে সমগ্র বোধ দিয়ে অনুভব করতে গিয়ে সচকিত হল। এমন ভাল গড়ন কখনও দেখেনি সে। অমন টানা চোখের শান্ত দহ কোথাও নেই। অমন নাকের তীক্ষ্ণ পাহারা কোথাও কি দেখেছে? গায়ের স্বাস্থ্যে যৌবনের গাঢ় পুষ্টতা যেন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। পাতলা শাড়ির নিচে ফুল হয়ে ফুটে আছে জীবন। আকালের মুখে ছাই দিয়ে চমকে উঠছে বিজলি-বাহিতা মেয়ে। চোখের মধ্যে কোথায় যেন গভীর একখানা মেঘ উঠেছে। কৃষ্ণা আর সরস্বতী গলা বাড়িয়ে জল চাইছে। মেয়েটি বলল—আমার এই বাটিটায় দু'ঢোক জল দিবা গুঁই মশাই?

সুখেন সত্যিই এবার মনে মনে চমকে উঠল। জল চাইছে ওরা। কৃষ্ণা জল চাইছে। সরস্বতী জল চাইছে। গাই দু'টিতে চুমুক দিলে এক ফোঁটাও এই পুকুরের কোণায় জমে থাকা জলের অবশিষ্ট থাকবে না। তার নিজের গলাও শুকিয়ে উঠেছে। কী করবে স্থির করতে পারছে না সুখেন। হতভম্বের মতন মেয়েটির দিকে চেয়ে আছে। মেয়েটি পায়ে পায়ে আরো নেমে এল। তার আগেই কৃষ্ণা সরস্বতী পা নামিয়ে জলে শোষণ দিয়েছে। তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাত থেকে বাটি নিয়ে সুখেন বাটি ভরে মেয়েটিকে এগিয়ে দিল, দেখতে দেখতে জল শেষ। মেয়েটিও চুমকুড়ী মেরে দুই চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বাটির কাণাতে ঠোঁট ঘষছে। সুখেন গুঁই আঁজলা নামিয়ে জল পেল না মুখে দেবার মত। বোকা হয়ে ঘাস কাটতে লাগল। মেয়েটি তখন খিলখিল করে হেসে উঠল, হাসি থামিয়ে বলল—এসো, উঠে এসো। তোমার জন্য রেখেছি। খেয়ে নাও। তুমি আমায় দিয়েছ। আমি তোমায় দিলাম। আজকাল কেউ কিছু দিতে চায় না। তুমি দিয়েছ বলে তোমায় দিলাম। কি বলো?

কথা শুনে সুখেনের আধেক তেষ্টা মিটে গেল।

—তেষ্টার সময় এঁটো বলে ভাবতে নেই। আমি তোমার গরুর এঁটো খেয়েছি। নাও। ধরো। বলে মেয়েটি সুখেনকে বাটি এগিয়ে দিল। সুখেন জল খেল। তারপর ঘাস কাটতে কাটতে মেয়েটির সাথে কথা শুরু করল।

—তোমার বাড়ি কোথায় মেয়ে? প্রশ্ন করল।

উত্তর ঃ টিয়ামুড়ি।

প্রশ্ন ঃ নাম?

উত্তর ঃ শ্যামা।

প্রশ্ন ঃ কে কে আছে তোমার?

উত্তর ঃ বাপ নাই। মা আছে। ভাই বোন আছে।

প্রশ্ন ঃ কোথায় গিয়েছিলে?

উত্তর ঃ মামা বাড়ি। থাকা গেল না। সেখানেও আকাল চলছে কিনা। চলে এলাম।

প্রশ্ন : কেমন আকাল চলছে সেখানে ?

উত্তর : সেখানেও অন্ন নাই। ঘাস নাই। জল নাই।

—অ

ঘাস কাটা শেষ করল সুখেন। ঘাস বাঁধল আঁটি করে। মাথায় নিল। কৃষ্ণা আর সতীকে গলায় জুড়ে বাঁধল। তারপর মেয়েটির মুখের কাছে চোখ এনে দেখল, পাতলা ঠোঁটের কষে ছেঁড়া একটা দাগ। রক্তের রেখা গাল অব্দি ছড়ানো। ভয় হচ্ছিল, মেয়েটি হয়ত আরো কিছু চাইবে। কী চাইবে আর ? ঘাস ? ভাবনার মধ্যেই আঁৎকে উঠল সুখেন। মেয়েটি ঘাস কী করবে ? কৃষ্ণা বা সরস্বতীকে আম খেতে দেয়নি সে। মেয়েটি নিশ্চয়ই বুঝেছে, গাই দু'টিকে সুখেন কত ভালবাসে। বোঝা উচিত। সুখেন যে কেঁদে-ছিল, মেয়েটি কি দেখেনি ? শুধিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

গরু দু'টি সামনে সামনে। পেছনে মেয়েটি। মাঝে সুখেন গুঁই। ঘাস সে কিছুতেই দেবে না। হাত দিয়ে শক্ত করে ধরল ঘাসের আঁটি। দ্রুত পা চালানোর জন্য গাই দু টিকে হাঁকিয়ে দিল ধমক দিয়ে। আর তখনই, সত্যিই মেয়েটি প্রার্থনা করল—কেউ দেয় না। তুমি দাও।

—কী ?

—ঘাস।

সুখেন কিছুক্ষণ কোন কথাই বলল না। চুপচাপ হাঁটতে থাকল। হঠাৎ শুধালো—ঘাসের বদলে তুমি আমায় কি দিচ্ছ ? সবাই যা সহজে দেয় না, সব মেয়ে, তুমি তাই দিবে ? বলেই দাঁড়িয়ে পড়ে সুখেন শ্যামার মুখের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। শ্যামা ঘাড় গোঁজ করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। বোঝা গেল না, শ্যামা রাজি কিনা, কিম্বা অপমানিত কিনা। কিন্তু মনে হল, শ্যামার কপালটাও খুব করুণ দেখাচ্ছে। ঠোঁটের কষে ছেঁড়া দাগ। ভীষণ দুঃখী দেখাচ্ছে শ্যামাকে। সুখেন হো হো করে হেসে উঠে পা চালিয়ে দিল। ডিপ-টিউব-ওয়েল বিকল। আকাশ দয়াহীন। চরাচরে নির্মমতা। ঘাসের নেতা মুথা সাহস করে ফুটতে পারে না। অতএব কে কাকে দেয় ?

ধরিত্রীর বুকে তবু গন্ধ থাকে কেন ? আবার পিছন ফিরে চাইল সুখেন গুঁই।

শ্যামা ঘাড় নিচু করে হেঁটে আসছে। এইখানে এসে দু'জনের পথ দু'দিকে আলাদা হয়ে গেছে। সুখেন থমকে দাঁড়াল। ঘাসের আঁটি আলগা করে ঘাসের প্রায় অর্ধেক মেয়েটিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—নাও, দিলাম। চাইছ যখন।

মনে মনে বলল—আকাশ যখন বৃষ্টি দেয় না, পঞ্চায়েত যখন ভগবতীকে ভুসি দেয় না, দেশের মিনিস্টার যখন গো-খাদ্য খেয়ে ফেলে। মাঠ যখন ফসল দেয় না, গাছ যখন আম দেয় না। ঘাসের নেতা যখন আকালে মাটির তলায় মুখ লুকিয়ে থাকে, তখনও মাটির তলায় সুবাস থাকে। ভূমিহীন ক্ষেত মজুর আমিই কেবল এ কথা জেনেছি।

কেউ জানে না। তুমিও জানো না শ্যামা। কেন তোমায় ঘাস দিচ্ছি। আমিও কি জানি ?

বলতে বলতে সুখেন গুঁই এগিয়ে চলল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মেয়েটির চোখে অশ্রুর দানা ফুটে উঠল সূর্যাস্তের মেটে আভায়। শ্যামা ঘাস কাঁধে করে সোজা গঞ্জে চলে এল। মোহন মুদির কাছে সেই ঘাস বিক্রি করে দিল। চাল কিনল, আর নুন। বাড়ি ফিরে এল রাত ন'টায়। উনুন জ্বালল মা। সাত দিন বাদে ওদের রাত্রি ভাতের গন্ধে ভরে গেল। শ্যামা ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বার সময় দেখল—তাদের গোয়ালে বাঁধা ভগবতীর চোখে জল চুইয়ে নামছে। ছটফট করছেন ভগবতী। ভগবতী আজ, সবার শেষে ভাতের ফেনটুকুও পান নাই।

হস্তান্তর

অমর মিত্র

এক

বিবিজানের কথা ভাবতে ভাবতেই দুপুর গড়িয়ে সন্ধে নামে। দুই ভাই সকাল থেকে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। দলিলের খোঁজ নেই। দলিলের খোঁজে মনের ভিতরে বিবিজান ভাবির খোঁজ পড়ে। মতিন মিঞা তো দলিলের কথা ভাবে না, ভাবে বিবিজানের কথা। অথচ হারানো দলিল খুঁজতে গিয়েই না বিবিজানের কথা মনে পড়া।

আচ্ছা মিঞা জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ মতিন, তোর ঘরটা ভালভাবে দেকিচিস ?

মতিন আকাশের দিকে হাঁ করে বসেছিল। আচ্ছার কথা তার কানে গেল না। কখনো ভাবছিল বিবিজানের কথা, কখনো ভাবছিল আচ্ছা মিঞার শয়তানির কথা। গোলমালটা আচ্ছাই করছে কিনা তার ঠিক কী। এসবে তো তার নাম কম নয়। এক জমি দশজনকে দশবার গোপনে বেচে আসে। দলিলটা তো ও বেটাই লুকিয়ে রাখতে পারে।

মতিনের কাছ থেকে জবাব না পেয়ে আচ্ছা মিঞার সামনের দুটো হলুদ দাঁত ভিতরে, ঢুকে মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তাহলে শয়তানিটা মতিনই করছে। ওর ঘরের কোথাও না কোথাও আছে। চালের বাতায় কিংবা পুরনো কলসীতে। দলিল লুকিয়ে জোচ্চুরি করার ধান্দা। আর এসব তার মাথায় থাকতেই পারে বেটা জুয়োর আড্ডায় বাঁশী বাজায় চৌকি দেয় জুয়োর বোর্ড। বদবুদ্ধি ষোল আনা।

আচ্ছা মিঞা হেঁকে উঠল, ও মতিন কানে শুনতিচিস ?

মতিন চমকে গেল, এই শুনলাম।

—দলিলডা গেল কোথা ?

মতিন ভাবছিল আচ্ছা কতটা সরল কতটা কপট। দলিলের কথা তাকে জিজ্ঞেস করে। সত্যিই কি ও জানেনা!

আচ্ছা মিঞা আর মতিন মিঞা পরস্পরকে জরিপ করছিল। ওদের চারপাশে কখন যে আঁধার ঘনায় তা খেয়াল হয় না কারোর। এমনিতে এখন বেলা ছোট. দুপুরটা কখন আসে আর কখন যে যায় বোঝা যায় না।

দুই ভাই উঠোনে বসেছিল। ওদের পিছনে বাঁশঝাড়ে এর মধ্যে ঝুপসি অন্ধকার নেমেছে। অন্ধকারের সঙ্গে বিনবিনে শীতও। বাঁশবাগান, বনবাদাড় একধারে রেখে দুই ভাইয়ের দুটো ধ্বস্ত কুঁড়ে ঘর। আজ সারাদিন দুই ভাই আঁতিপাতি করে দলিলটা খুঁজেছে। শেষে হাল ছেড়ে ঘরের বাইরে গালে হাত দিয়ে বসেছে। অথচ দলিলটা তো চাই। জমি বেচতেই হবে। বিবিজান ভাবির দলিল করে দেওয়া সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি না বেচলে এই অঘ্রান পোষ যে আর কাটে না। বিবিজান দুইজনকে যে সম্পত্তি বেচে গিয়েছিল, সেই সম্পত্তিই বেচবে দুজনে।

—ভাবির সম্পত্তি কতডা হবে? মতিন জিজ্ঞেস করল।

আচ্ছা মিঞা ভাবতে বসল। বিবিজান তাদের মৃত বড়ভাই কালু মণ্ডলের বিবি। কালু মণ্ডলের মৃত্যুর পর কিছু সম্পত্তি তার বিবির কাছে বর্তায়। একেবারে ইসলামি ফরাজি নিয়মে। সেই সম্পত্তি বিবিজান এই দুইজনকে বেচে অন্য গাঁয়ে নিকে করে।

আচ্ছা মনে মনে হিসেব ক'রে ভাইকে বলে, হিসেব জানিনে, তবে কিনা বড়ভাইয়ের যা ছিল পেথমে, আমাদের দুজনেরও তা ছিল, মানে বাপের সম্পত্তি তো তিন ভাগ হয়েছিল, বুন ছিল না মা, মাটি নেছলো আগে।

হিসেব মতিনের মাথায় ঢোকে না। তবুও সে মাথা নাড়ে বিজ্ঞের মত। তার তুলনায় জমিজমা আচ্ছা বেশি বোঝে। বুঝবেই তো মতিনের তো বোঝার কথা নয়। সে তো এতটা কাল গোলাবাড়ি হাটে হায়দর আলির জুয়োর বোর্ডের পাহারাদার হয়েই কাটিয়ে দিল। যেদিকে দেগঙ্গা, সেদিক থেকেই তো দারোগা পুলিশের মুখ দেখানোর কথা। পুলিশের গাড়ির মুখ কাঁচকলের বাঁক থেকে এদিকে ঘুরলেই মতিনের মুখে হুইস্‌ল বেজে ওঠে। পুলিশ আসছে। হুইস্‌ল বাজলেই হায়দর আলি বোর্ড তুলে ভোঁ ভাঁ। মতিনের বাঁশী বাজলেই একটাকা। আর ভুল বাজালে আগের পাওনা থেকে আট আনা কাটা। হাটের দিন সতর্ক থাকতে হয় বেশি। বাস থেকেও নামতে পারে হাবিলদার কনস্টবল। সাদা পোশাকেও হাট করতে পারে দারোগাবাবুর পিয়ন! জুয়োর বোর্ড দেখলে পিয়ন বাবুর উপরি আয় হয়। নতুবা সব সমেত থানায় চালান করার ব্যবস্থা করবে। বাঁশী বাজানো যার পেশা, সেই মতিন মিঞা জমির হিসেব বুঝবে কিভাবে?

এ বছর রোদে খরায় গেছে। পাতাল অবধি জল শুকিয়ে খাঁক হয়ে গেছে মাটির বুক। ধানের বদলে জমির খড় কেটে কদিন আগে ওরা বেচে দিয়েছে কিন্তু তাতে কি আর দিন চলে। এখন বেচতে হবে জমি।

হায় ! অঘ্রান মাসে জমি বেচতে হয় একথা কি কেউ শুনেছো ? দুই ভাইয়ের এতোটা বয়স হলো, তবু এমন কাণ্ড কেউ করেনি কখনো। দশ কাঠার মত জমি দুই ভাইয়ের দখলে আছে। সে জমি কার দুই ভাই জানে না। যখন তখন জমি বেচেছে দুইজনে, এখন আবার বেচবে। তার জন্য চাই জমির দলিল। দাগ নম্বর, অংশ ভাগ দেখতে হবে। বিবিজান ভাবির কাছ থেকে যে সম্পত্তি কিনেছিল দুই ভাই, তা বিক্রি করবে।

আচ্ছা মিঞা বোঝাচ্ছিল, মতিন মিঞা ঘাড় দুলোচ্ছিল। ওদের মাথার উপরে শীত পাখি তার অন্ধকার ডানা মেলে চরাচর আড়াল করছিল। শীতের ছোঁয়ায় দুজনে আর নড়ছিল না। আচ্ছা মিঞা তার গায়ের গামছা বেশ করে জড়ায়, আর মতিন তার আদ্দিকালের ছেঁড়া খদ্দরের চাদরে মুড়ি দিয়ে জবুথবু।

আচ্ছা ফিসফিসিয়ে বলল, 'যে জমিডা পড়ে আছে, তা বিবিজান ভাবির সম্পত্তি, ও ছাড়া আর নাই, সব বেচা হই গেছে।'

মতিন ভাবছিল বড়ভাই কালু মণ্ডল এ্যাদ্দিনে নিশ্চয় মাটির নিচে মাটি হয়ে গেছে। তার বিবি ভিনগাঁয়ে ফের নিকে করেছে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি এই দুজনকে বিক্রি করে।

মতিন তার চাদরের ভিতর দিয়ে জুলজুলে চোখে ভাইকে দেখছিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ভাবির কথা তোর মনে পড়ে আচ্ছা ?

আচ্ছা অবাক হয়ে ভাইকে দ্যাখে। এ কথা কেন ? ভাবির কথা মনে পড়বে কেন, মনে পড়ছে দলিলের কথা। জমি ছাড়া সে কিছু বোঝে না। এ ব্যাপারে তার মাথা খুব সাফ। মাদ্রাসায় যাতায়াত করেছিল কম বয়সে। আর মৌলবী সায়েবের পিয়নও হয়েছিল দু বছর। জুতো আর ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে হত। আচ্ছা ভাবল, এ কথা মানে মতিনের চালাকি। হচ্ছে দলিলের কথা, এর ভিতরে ওসব কথা আসে কি ভাবে ? দলিল আর মেয়েমানুষ কি এক।

এ ভাবনা আচ্ছার ভিতরে আসতেই তার চোখের মণি স্থির হয়ে গেল। দু চোখে যেন বারুদ ছুটতে লাগল। মুখগহ্বরে যে কটি দাঁত অবশিষ্ট আছে তা উপর নিচ পরস্পরে ঘষে গেল। দুটো হাত নিসপিস করতে লাগল। আচ্ছা ভাবল মতিন কথা ঘুরোচ্ছে, মানে দলিল ওর কাছে আছে।

সে হেঁকে উঠল, দ্যাখ মতি আমারে ফাঁকি মারতে যাসনে।

একথা শুনে মতিন লাফ দিয়ে ওঠে আর কি ! তার সমস্ত দেহটা হঠাৎ যেন আগুন হয়ে উঠল। ফাঁকি মারার কথা ওঠে কিভাবে ? দাঁত কিড়মিড় করে উঠল মতিন মিঞার।

সে বলে উঠল, মিছে দোষ দিবিনে বলতিছি, বিচার করতি আমি হায়দর আলিরে লে আসপো।

আচ্ছা চিৎকার করে উঠল, লে আয় তোর জুয়োর পাটি, দলিলড়া লুকোয় রেকিচিস, বললি দোষ !

অন্ধকারে দুজনে উঠে দাঁড়িয়েছে। মতিন লাফ দিয়ে আচ্ছার দিকে তেড়ে গেছে। গলাবাজিতে কেউ কম যায় না। এ বলে তুই চোর, ও বলে তুই চোর। দুটি একরকম মানুষ লাফ দিতে থাকে উঠোনের শক্ত মাটিতে একই রকম হাত পা মুখ চোখ আর মাথা।

আচ্ছা আর মতিন, দুই যমজ। এমনিতে চেনা দায়। মতিনের দাঁত নেই, আচ্ছার গায়ে গামছা। মতিনের গায়ে আদ্দিকালের ছেঁড়া চাদর, আচ্ছার দেহটা একটু ন্যুব্জ।

দুই ঘর থেকে দুই বিবি দৌড়ে এল। সকাল থেকে এইরকম পরস্পরে দাঁত দেখানো যে কতবার হল তার ইয়ত্তা নেই।

দুই

কতকালের কথা হবে। বছর হিসেব করা দুই মিঞার কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তা বড়বন্যার আগের বছর তো বটে। বছর পাঁচেক কেটে গেছে। সেই সময় দুই যমজের বড় ভাই পেটের ভিতরে ঘা নিয়ে মারা যায়। হাসপাতাল অবধি নিয়ে যেতে হয়নি, তার আগেই শেষ।

কালুমিঞার দেহ ছিল ছোটখাট। কিন্তু বড় ভাই তো। দুই যমজকে কী এক গোপন ছায়ায় ঢেকে রেখেছিল। পেটের ব্যথায় দুমড়ে মুচড়ে যখন কালু তিনবার থরথর করে স্থির চক্ষু হয়ে গেল, তখন বিবিজানের কোলে এক বছরের বাচ্চা। আর এই দুইজনের দুই বিবির পেটেও প্রথম সন্তান।

কালুমণ্ডল মরার পরে মতিন একদিন ফিসফিস করেছিল আচ্ছার সঙ্গে, 'ভাবিরে বে করতাম, কিন্তু আর এক দু বছর গেলি হত, এহন লয়।'

আসলে প্রথম সন্তানের আহ্লাদে মতিনের তখন মাথা খারাপ। কী করবে ঠিক করতে পারছে না। ক'দিন বাদেই তো সে বাপ হচ্ছে।

কালু মাটি নেয়ার পর বিবিজান স্থির নিশ্চল হয়ে ঘরে বসে থাকত। তার রূপ ছিল দেখার মত। তারিফ করার মত। ঠিক যেন ইমানদার ঘরের বউ বিবি। কালুর ভাগ্য বটে! যে কদিন বাঁচল এই বিবির সঙ্গে কাটিয়ে গেল।

কালুমিঞা হলো বিবিজানের দ্বিতীয় পক্ষ। আগের স্বামীকে মনে ধরেনি তার। কালুর যাতায়াত ছিল সেই বাড়ি। সেখানে বিবিজান নিঃঝুম হয়ে বসে থাকত। আজগার মণ্ডলের বউ-এর মনের ভিতরে ঢুকবে কে?

আজগার মণ্ডল, বিবিজানের প্রথম পক্ষ। সে ছিল কসাই। হাড়োয়ার নামকরা মানুষ লতিফ মণ্ডলের পিলখানার এক নম্বর ওস্তাদ। শেষ রাত থেকে গরু কাটত। আকাশ ফর্সা হতে না হতে গোটা তিনেক জবাই শেষ। আর তখন পিলখানার চারদিকে শকুন নামত। আজগার মণ্ডল শকুন পরিবৃত হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। দুপুর নাগাদ বিবিজানের সেই প্রথম পক্ষ ঘরে ফিরত লুঙিতে গরুর খুন মাখামাখি ক'রে। এ স্বামীর ঘরে বিবিজানের মন বসে কিভাবে?

না, আজগার মণ্ডলের বাচ্চা তার বিবি তখনো পেটে ধরেনি। বিবিজানের ভয় ছিল। কসাই নাকি নির্বংশ হয়। কসাইয়ের অঙ্গে অঙ্গে নাকি ভবিষ্যৎ কালে রোগ দেখা দেয়। চামড়া খসে খসে যায়। চোখ গলে যায়। সেই ভয়ে বিবিজান আজগার আলিকে ত্যাগ ক'রে চলে এল কালু মণ্ডলের ঘরে।

সেই আজগার আলি ছ'মাস পরে সত্যিই মাটি নিল। তিনদিনের জ্বরে শেষ। খবর এনেছিল মোতালেব মিঞা। আজগার আলির এক স্যাঙাৎ।

মোতালেব কালুকে এসে বলেছিল, আর ছড়া মাস যদি অপেক্ষা করত বিবিজান, তাহলি আজগার এর সম্পত্তির অংশ পেত, এখন সেই সম্পত্তি বারোভূতে লুটে খাচ্ছে।

কালু আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়েছে, উঁহু, কসাইয়ের সম্পত্তি ভোগের হত না, বিবিজান এ্যাদ্দিন ওর কাছে থাকলি বাঁচতিই পারত না।

কালু মণ্ডল মাটি নেয়ার পর বিবিজান নিশ্চুপ। চোখের জল ভিতরেই শুকিয়েছে বোধহয়। বেওয়া মেয়েমানুষের পায়ের শব্দও শোনা যায় না। নীরব চোখে কালুর গোরস্থানের দিকে চেয়ে থাকে বিবিজান। তারপর একদিন ওই পথেই আসতে দেখল মানুষজন। আনাগোনা শুরু হলো পুরুষ মানুষের।

বুদ্ধিটা আচ্ছা মিঞার, সে বলল, ভাবি তুই আবার নিকে কর, আর—।

আর কি? বিবিজানের চোখ আচ্ছা মিঞার চোখে।

—বড় ভাইয়ের যে সম্পত্তিডা পেয়েছিলি ওয়ারিশান হয়ে, তা ছেড়ে দে আমাদের দু ভাইরে, হ্যাঁ টাকা দেব।

মতিন কিন্তু আচ্ছার এই কথায় রুষ্ট হলো মনে মনে। বিবিজান ভাবি তার ঘরে এসে উঠুক, এই ছিল তার মনের কথা। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। ঘরে তার বিবির পেটে বাচ্চা, এখন কি নিকে সম্ভব? বড় ভাইয়ের বড় আদরের ছিল বিবিজান। জন্মেও সে ভাবেনি এমন বিবির সঙ্গে ঘর করা তার ভাগ্যে লেখা আছে, আর এমন বিবিকে ছেড়ে মাটি নিতে হবে অকালে। বিবিজানকে এই ভিটেতে রাখতে পারলে মাটির নিচে কালু মণ্ডলের বুক স্থির হবে।

আচ্ছার তখন ভবিষ্যতের ভাবনা। কম পয়সায় যদি ভাবির কাছ থেকে জমি পাওয়া যায় তো তাদের জমি বেড়ে যায়।

বিবিজান জলের দামে তার পাওয়া জমির ভাগ বিক্রি ক'রে দিল দলিল করে। দুই ভাই তা কিনল। সেই টাকা নিয়ে বিবিজান ঘর করতে গেল জীবনপুরে। এসেছিল মোতালেব মণ্ডল, আজগার আলির পুরনো স্যাঙাৎ। সে নিয়ে গেল বিবিজানকে জীবনপুরে।

মতিন তার দাওয়ায় বসে দেখল ফাল্গুন মাসের ভোরে বিবিজান তার মেয়ে কোলে করে মোতালেবের সঙ্গে যাচ্ছে ঘর করতে। তখন আমগাছে বোল এসেছে, নিমগাছে ফুল। ভোরের সব সুবাস বিবিজানের পিছু পিছু হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে বিবিজান একবার পিছনে ফিরল।

মোতালেবের এ ইচ্ছে অনেককালের। এই আশাতেই তো সে আজগার আলির ঘরে যেত। কিন্তু তখন হল না। কাল্লু মণ্ডল নিয়ে চলে এল বিবিজানকে। কাল্লু মাটি নেওয়ায় মোতালেবের আশা পূরণ হল।

তিন

রাতে আচ্ছা মিঞা ভাবল, ভাবি কি দলিল সঙ্গে নিয়ে গেল?

মতিনও তাই ভাবছিল, ভাবি কি দলিল দিয়ে গেল না?

আচ্ছা ডাকল, ও মতিন শোন।

মতিন বলল, আমিও ভাবতিছি তোরে ডাকপো।

দুই ভাইয়ে ভাবতে বসল। বিবিজান কি দলিল তাদের দিয়েছিল! উঁহু, রেজিস্ট্রি করে আনার পর তো দলিলটা ভাবির কাছেই ছিল। আর তো চেয়ে নেয়া হয়নি।

চেয়ে নেয়া হয়নি বোধহয়। কিন্তু বিবিজান যখন কাজ করল মোতালেবের সঙ্গে, তখন তো দলিলটা দিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। জমি লোকে জমিতেই কেনে, কাগজে নয়! কাগজের দরকার না পড়লে খোঁজ হয় না বড়, বিশেষত যাদের জীবন জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দুই ভাই কথা বলে না। মতিনের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। দলিল কি বিবিজান নিয়ে গেলিছ? তাহলে কি সে ভেবেছিল মতিন যাবে দলিল আনতে? মতিনের বুকটা হা হা করে ওঠে। চোখের সামনে গৌরবর্ণা পরীর মত বিবিজান বিবি ভেসে ওঠে। সে তো জানত মতিন তাকে নিকে করতে চায়। কিন্তু হল না। এমনিতেই হল না! শেষে মোতালেব এসে নিয়ে গেল তাকে। তখন তার না গিয়ে উপায় ছিল না। এই বয়সের মেয়েমানুষ কতদিন একা থাকবে? আর মোতালেব তো খোঁজ রেখেছিল বিবিজানের। তক্কে তক্কে ছিল।

আজগার তালাক না দিলে, সেই ছ' মাস পরে আজগার মাটি নিলে বিবিজান তো মোতালেবের ঘরেই যেত। আজগার মরার আগে কাল্লু মণ্ডল গিয়ে হাজির। আর কাল্লু মাটি নেয়ার পরে মোতালেব এল।

মতিনের মনে পড়ে সামনে যাচ্ছে আশমানি জোব্বা পরা মোতালেব মণ্ডল। দীর্ঘকায় শয়তানের মত পুরুষ! চোখে মুখে ধূর্তামি। সে যেন আর এক কসাই। তার পিছনে ফুলের মত বিবিজান। কোলে এক বছরের বাচ্চা, যার বাপ কাল্লু মণ্ডল, হাতে ঝুলছে পঁটুলি। সেই পুঁটুলির ভিতরে কি দলিল ছিল! যার আকর্ষণে মতিন গিয়ে হাজির হবে ভেবেছিল।

বিবিজান ভাবি ক বছর গেল? মতিন জিজ্ঞেস করে।

—তা বছর পাঁচ তো হবে, ধর গে, আমার তোর ছাওয়াল দুটোর যত বয়স, তারা তো তখন ন মাস পেটে।

বাহ্! আচ্ছার মাথাটা সত্যিই সাফ। অক্লেশে হিসেব করে ফেলল। দেখতে দেখতে এতদিন কেটে গেছে! মতিনের মনে হয় হায়দর আলির জুয়ার বোর্ড পাহারা দিয়ে সে বড় ভুলটা করেছে। না হলে তো দলিল খুঁজতে খুঁজতে বিবিজানের ওখানেই হাজির হতে পারত।

মতিন বিড়বিড় করল, জমিতো বেচতি হবে।

বিষণ্ণ আচ্ছা বলল, না বেচলি খাব কি, বেচতিই হবে।

মতিন বলল, তাহলি তো ভাবির কাছে যেতি হয়।

আচ্ছা ঘাড় কাত করল, যেতে তো হবেই।

চার

জীবনপুর কোথায়? না সেই বিদ্যেধরী নদী পার হয়ে দক্ষিণে। বিদ্যেধরীর এপারে হাড়োয়া, ওপারেও হাড়োয়া। যেন দুই যমজ।

হাড়োয়ায় ছিল আজগার আলির বাস। সেখান থেকে অন্তত মাইল আটেক ডাউনে জীবনপুর। নদী পথে যাওয়া যায়, নদী আড়াআড়ি পার হয়ে পায়ে হেঁটেও।

ভোর ভোর দুই যমজ বেরিয়েছে। একরকম মুখ, একরকম চোখ। শুধু মতিনের লুঙির উপরে খাঁকি শার্ট, গায়ে সেই ছেঁড়া ফাটা চাদর। আর আচ্ছার গায়ে কোঁচকানো গোলাপী পাঞ্জাবি, রঙ তার ধুয়ে গেছে। কাঁধে চেককাটা গামছা। দুই ভাই যাচ্ছে দলিল আনতে। না আনলে এ বছর খরায় শুকিয়ে মরতে হবে!

এই ভোরে যেন কুয়াশা দখল করে ফেলেছে গোটা পৃথিবী। মতিন এগোয় তো আচ্ছা ওকে যেন কুয়াশায় হারিয়ে ফেলে! আর আচ্ছা তো সর্বক্ষণই মতিনের মনে হারিয়ে আছে। কুয়াশায় মতিন যেন বিবিজানের মুখমণ্ডল ধরার চেষ্টায় আছে। সেই চোখ সেই মুখ যেন হারিয়ে না যায়।

আবছা নীল কুয়াশায় ওরা দুজন ভিজে যায়। সমস্ত দেহটা কেমন স্যাঁতসেতে হয়ে যায়! মতিন দেখছিল কুয়াশার নীল আর ধূসরতায় মেশামেশি রঙ যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠছে। ওরা এসে পৌঁছয় দেবালয়ে। এখান থেকে পিচঢালা রাস্তা সোজা বিদ্যেধরী নদীর গায়ে পীরগোরাচাঁদের মাজারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

পথে মতিন একবার জিজ্ঞেস করে, মোতালেব মিঞার ঘর জানিস তো?

—মৌজায় গে জিজ্ঞেস করলি হবে।

বাস বন্ধ। ওরা দুই ভাই ভ্যান রিকশায় উঠে বসল। কুয়াশায় সামনেটা পরিষ্কার

দেখালেও দু হাত দূরে ধূসর নীল পর্দা। দুই যমজ বোঝে তারা বারে বারে আবছা নীল থেকে নীলচে ধূসরে ঢুকে পড়ছে। জোরে ছুটছে তিন চাকার ভ্যান রিকশা।

মতিন ভাবছিল, কতক্ষণে পৌঁছবে জীবনপুর, বিবিজান খুব অবাক হবে। আচ্ছা ভাবছিল, কতক্ষণে হাতে আসবে সেই দলিল।

দুই যমজ শীতের ঘায়ে কাঁপছিল। কুঁকড়ে যাচ্ছিল দুজনে। কাঁপতে কাঁপতে মনের ভিতর বিবিজান আর দলিলের খেলা খেলতে খেলতে ওরা এসে পৌঁছয় বিদ্যেধরীর কোলে। মতিন মিঞা অবাক হয়ে দেখল এখানে কুয়াশা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। রোদ ছড়িয়ে পড়ছে নদী আর পৃথিবীর উপর। অঘ্রানের প্রথম রোদ যেন গলন্ত সোনা। সোনার জলের পুকুর। তার ভিতরে পাখিরা সাঁতরাচ্ছে অকাতরে।

এখানেই দেরি হয়ে যায়। নৌকো ছিল না। নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করে বেলা বেড়ে ওঠে। তখনই আবার নদীতে জোয়ার ঢুকল। জোয়ারে ডাউনে যাওয়া কষ্ট। মতিন হাঁটতে চেয়েছিল। নদী বাঁধ ধরে হেঁটে, জীবনপুরের ঘাটে পার হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না।

নদীপথে, স্রোতের বিরুদ্ধে জীবনপুরে পৌঁছতে সূর্য আকাশের মাথা থেকে নামার উদ্যোগ করেছে। মতিনের বুক কাঁপছিল। সে আর সময় নষ্ট করতে চাইছিল না। জীবনের অনেকটা সময় হারিয়ে গেছে। জীবনপুরে পা দিয়ে আর দেরি করা নয়। সে কি জানত, বিবিজান দলিল নিয়ে জীবনপুরে এসে তাকে গোপনে এতকাল ধরে ডেকেছে।

নৌকো থেকে নেমে আচ্ছা জিজ্ঞেস করল, ও মতিন, ভাত পাওয়া যাবে এখেনে?

মতিন যেন সব জানে। যেন মতিনের ঘরে মতিন ফেরে। সে হেসে বলল, কি করে জানব, ওকি আর আমার ঘর?

দুই যমজে একসঙ্গে হাসল। ক্ষিদে চেপে থাকার অভ্যেস আছে দুজনেরই। সকালে পান্তা খেয়ে বেরিয়েছে। সন্ধে অবধি চলে যাবে।

দুপা এগিয়ে দুজনে ধরল এক চাষাকে, 'মোতালেব মিঞার ঘর জান?'

লোকটা কাটা ধান বোঝাই করছিল একা একা। অতবড নিঃঝুম প্রকৃতিতে তার চারদিকে আর কোন মানুষ নেই। সে চমকে যায় এদের দেখে। চোখে ভুল দেখছে না তো। একটা মানুষ কি ডবল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

আস্তে আস্তে তার বিস্ময় কাটে। সে বোঝে, না দুজনই দাঁড়িয়ে। দুটোই একরকম, শুধু জামা কাপড়ে যা তফাৎ। সে খুঁটিয়ে ওদের দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কোন মোতালেব?'

কোন মোতালেব। বিপদে পড়ে যায় দুই ভাই। মোতালেবের বাপের নাম তো জানেনা। তাহলে কি পরিচয় দেবে?

আচ্ছা বলল, হাড়োয়ার এক কসাই ছেল, আজগার আলি, তার স্যাঙাৎ।

মতিন বলল, তেনার বিবি হলো বিবিজান, সেই বিবিজান যে আজগার আলির বিবি ছেল পেথমে, তারপর হয় আমার বড় ভাই কালুর··· ।

আর পরিচয় দিতে হয় না। লোকটি মাথা দ্লোতে লাগল। মাথা দ্লোতে দ্লোতে মতিনকে থামায়, বুঝতি পেরেছি, এখেন থেকে সিধে হেঁটে যাও, অশথতলা পাবা, তা থেকে বাঁ দিক ঘোর, সামনেই মোতালেব মিঞার ভিটে।

দুই ভাই তখন প্রায় দৌড়য় আর কী। নদীকে পিছনে ফেলে দুই ভাই রোদ ছেড়ে ছায়াময়তায় প্রবেশ করে। অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ভীষণ অন্ধকার, যেন গাছের জন্মইস্তক এ মাটিতে রোদ পড়েনি।

এই ছায়ায় দাঁড়িয়ে দুজনের হঠাৎ যেন শীত লাগল। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে। মতিনের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। সে বুকের বাঁদিকে হাত চাপা দেয়। দুজনে একসঙ্গে দেখতে পেল মাটির ভিটে বাড়িটা।

বড় অগোছালো ! উঠোনে খাবলা খাবলা মাটি তোলা। গোবরছড়া কতকাল পড়েনি বোঝা যায় না। চালের খড়ও এলোমেলো। কোণের ক্ষেতে অবহেলায় বোনা মুসুরি আর সর্ষে, সবুজে হলুদে একাকার হয়ে পড়ে আছে। উঠোনের একধারে ধানের স্তুপ, তাও যেন বড় এলোমেলো, অস্থির।

আচ্ছা ভাবল, জমি থাকতেও এ লোকটা তার মর্যাদা বোঝে না। তার যদি এমন জমি থাকত, রাখতে পারত যদি জমি, সর্ষের রঙের বাহার দেখিয়ে দিত। জমি বেচে বেচে চাষবাস ভুলে যাচ্ছে সে !

আচ্ছা মিঞা হেঁকে উঠল, বিবিজান ভাব, বিবিজান।

মতিন যেন দম আটাকে দাঁড়িয়ে আছে।

আচ্ছা আবার হাঁক দিল, মোতালেব ভাই।

একটা শীর্ণকায় মানুষ তখন মাথায় করে ধানের বোঝা এনে উঠোনে রাখছিল। ওদের আসার ফাঁকে সে ছিল ভিটের পিছনের জমিতে। সে মোতালেব মণ্ডল।

মোতালেব ক্ষেত থেকে উঠোনে আসার পথে দূর থেকে দেখছিল দুটো মানুষ পায়চারি করছে তার সর্ষে ক্ষেতের সামনে। সে উঠোনে ধানের বোঝাটা ফেলে গামছা দিয়ে গায়ের খড় ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে আসে।

আই বাপ। দুজনে যে একরকম। তার মানে। মোতালেব হাঁ করে নিরীক্ষণ করতে থাকে দুই যমজকে।

আর আচ্ছা মতিন দুজনে দেখছিল, রোগা ডিগডিগে, এ যে দেখি তালপাতার সেপাই। দুটো চোখ কোন গহ্বরে সেঁধিয়ে গেছে। চোখের মণি বোঝা যায়, দেখা যায় না। এই বয়সেই চুল দাড়ি সব পেকে সাদা। একটু বাঁকা বাঁশের মত হয়ে গেছে লোকটা। যখন হেঁটে আসছিল এদিকে ওর বুকের ভিতরের সব কলকজা যেন কাঁপছিল। বুকটা দপদপ করে উঠছে নামছে। হাড়ের উপর চামড়া যেন ফেটে যায় যায়।

—কেড়া ? চিনতে না পেরে মোতালেব ওদের সামনে এসেছে।

দুই যমজ অবাক। সেই মোতালেব। মস্ত চেহারায়, প্রায় শয়তানের মত পুরুষ. গায়ে ছিল নীল আশমানি পাঞ্জাবি, সেই মানুষে আর এই মানুষে যে মেলে না একেবারে। দুই যমজে যেমন মিল, দুই মোতালেবে তেমনি অমিল।

—চিনতি পারছো, ভাবির আগের পক্ষ কালু মিঞার দুই ভাই মোরা।

আচ্ছা মিঞার কথায় মোতালেব হঠাৎ যেন শক্ত হয়ে ওঠে। সে বসে পড়ল উঠোনে। গায়ে গামছা জড়ায়। তার চোখমুখে কেমন নিস্পৃহের ভাব। সে জিজ্ঞেস করে, 'তা হঠাৎ, বেপার কি?'

—ভাবির কাছে দরকার, মানে এটডা দলিল, ভাবিরে ডাক দিনি।

মোতালেব আচ্ছামিঞার কথা কিছু শোনে কিছু শোনে না। মতিন ততক্ষণে এগিয়ে গেছে, 'তুমার এর'ম চেহারা হলো কী ভাবে মোতালেব ভাই, একেবারে ভেঙে গেছো দেখতিছি।'

মোতালেব অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ম্যালেরিয়া জ্বর ধরেছে সেই বৈশেখ মাস থেকে, বছর ঘুরতি গেল, জ্বর আসে আর ছাড়ে, এই এখন যেন আবার কাঁপুনি আসতেছে, এই রোগেই খেয়েছে আমারে।

মতিন তার গায়ের চাদর ফেলে দিল মোতালেবের গায়ে। চেপে ধরল জীর্ণশীর্ণ দেহটিকে। মোতালেব থরথর করছিল।

আচ্ছা বলল, মিঞা ঘরে ঢোক, ক্ষেতে লোক আছে তো?

মতিন বলল, না হয় আমরা দেখতিছি, কোন জমি দেখায় দ্যাও।

মোতালেব আস্তে আস্তে বলল, ভিটের ঠিক পেছনে।

তখন মতিন প্রায় ফিসফিসিয়ে বুক ভার করে বলল, ভাবিরি এটটু ডাকো, পানি খাব, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মোতালেব মাথা নামিয়ে কাঁপছিল জ্বরে। সেই অবস্থাতেই ধ্বঁকতে ধ্বঁকতে বলল, বিবিজানের খোঁজে তো এয়েচো, আরও মানুষ এয়েছিল, তা সে তো নেই!

—নেই! মতিন যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

—তালাক হয়ে গেছে, ফের নিকে করেছে ও।

মতিন বসে পড়ল। ওর পাশে মোতালেব হাসফাঁস করতে থাকে। আচ্ছা ছুটল মোতালেবের ক্ষেতের দিকে।

মতিন একটু পরে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, কবে হলো তালাক?

—তা বছর ঘুরতি চলল পেরায়, গেল বৈশেখে, যবে রোগে ধরল আমারে।

—বিবিজানেরে তালাক দে দিলে মোতালেব ভাই! মতিনের কণ্ঠস্বরে হতাশা।

মোতালেব অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর ধ্বঁকতে ধ্বঁকতে বলে, আমি কী দেছি তালাক, বিবির রূপ যেন ফেটে পড়ছিল, অমন মেয়েছেলে ঘরে রাখাই দায়, কালু মিঞার এটডা, আর আমার দুটো বাচ্চা লে সে পাটকেলঘাটার মাজারুল হকের কাছে গেছে, হক

সায়েব, ইমানদার, জমিঅলা মানুষ। তারে নে গেল পেরায়, বিবিজানেরে সে দেখিল হাডোয়ার মেলায়।

ওরা রাতে থেকে যায়। মোতালেবের ঘরে এখনো নতুন বিবি আসেনি। সব ধ্‌ধ্‌ পড়ে অছে। ঘর গেরস্থালি ভাঙাচোরা। শীতে তিনজনে ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়।

· সন্ধে বেলা আচ্ছা মিঞা তাদের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তার কথা শুনে জোরো মোতালেব লাফ দিয়ে ওঠে। তাই তো! সে যে দুবিঘা জমি দানপত্র হেবানামা করে দিয়েছিল বিবিজানকে। সে দলিল কোথায়? বিবি তালাক হয়ে গেলে তো আর সেই বিবিকে জমি দেবে না মোতালেব।

খোঁজ খোঁজ! খংজে পাওয়া যায় না দলিল। গা ভর্তি জ্বর নিয়ে মোতালেব বাক্স পেঁটরা উপুড় করে দেয়। দলিল নেই।

তখন মতিন বলে, লে গেছে বিবিজান, দলিল আনতি হয়ত তুমি যাবা, তাই ভেবেছেলো।

মোতালেব মুখ ঢেকে বসে থাকে, কোনরকমে বলে, 'হবে হয়ত, জ্বরের কাঁপুনিতি মাথার ঠিক ছেল না আমার!'

পাঁচ

রাতে দুই যমজে ঠিক করল পাটকেলঘাটা যেতে হবে। তখন জোরো মোতালেবও ধরে বসল ওদের, আমারেও নে যেতি হবে।

কিন্তু তুমার যে ধুম জ্বর, আচ্ছা বলল।

সহালে থাকপে না।

রাতে মতিনের দুচোখের পাতা এক হয় না। সে ভাবছিল গত চৈত্র বা বৈশাখে আসতে পারলে সে নিয়ে যেতে পারত বিবিজানকে। এখন যেতে হয় মাজ্জারুল হকের ওখানে। আরো অপেক্ষার দিন এল।

শেষ রাতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল মোতালেবের। সকালে গা ঠাণ্ডা। সে ঘরে তালা দিয়ে সঙ্গ নিল দুই যমজের। দুর্বল শরীর টলেমলে হাঁটে। যেতে যেতে মোতালেব বলল, বিবিজানের যেন মন বসে না কারো ঘরে।

আচ্ছা মিঞা ভাবে দলিলটা পেয়ে কবে জমি বিক্রি করে দেবে! মাটি তাদের কপালে নেই। আজ কিনলে কাল বেচতে হয়। বড়মানুষে কিনে নেয়।

মতিন জিজ্ঞেস করল, পাটকেলঘাটা পৌঁছতি কি সূয্যি ডুবে যাবে?

মোতালেব ঘাড় কাত করল, 'জে, সে তো অনেক দূর, যখন পৌঁছব, বেলা আর থাকপে না।'

হাঁটতে হাঁটতে মোতালেব মণ্ডল হঠাৎ দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গো, তুমাদ্দের ভেতর কোনডা কেডা ?

মানে ? মতিন দাঁড়িয়েছে।

—আচ্ছা মিঞা কেডা ?

আচ্ছা সরে এসে বুকে হাত দিয়ে বলে, এই আমি।

—তুমার কথা খুব বলত বিবিজান।

মতিনের বুক একা একা ভেঙে যায়। মাথাটা ঝুলে পড়ে। এ কী বলছে মোতালেব মিঞা ! সত্যি। বিবিজান কি জানত তাদের কোনটা আচ্ছা'কোনটা মতিন। তাকেই তো ভুল করে ক'দিন আচ্ছা বলে ডেকেছিল না ! সে বিষণ্ণ হয়ে হাঁটতে থাকে, চোখ-মুখ কালো হয়ে গেছে। পা যেন আর এগোতে চাইছে না, পাটকেলঘাটার দিকে।

তিন মানুষ হাঁটছে। দুই পাশে দুই যমজ আর মাধ্যখানে হাড়জিরে মোতালেব। বিবিজানের ঘর আর কতদূর ! তার কাছে যে গচ্ছিত রয়েছে নানা মানুষজনের নানা সম্পদ। চাষার জমি চাষার হৃদয়। সেই খোঁজে দুজন থেকে তিনজন, তিন থেকে চার, এমনি করে গাঁ উজাড় পাড়ি।

দ্বৈরথ

আফসার আমেদ

হ্যাণ্ডলাই ডান হাতে ঘোরানো অবস্থায়, ছায়ার মত উঁচু নীচু মাটিতে মচকানোর ঘটনার মত মেশিনটায় লেপটে থাকে ভীমের আঁকাবাঁকা ছিপছিপে শরীর। ছায়ার মত যদি সে মিশে যায় মেশিনে, তাহলে হৃৎপিণ্ডটা ঝুলছে যেখানে মাল বাঁধা আছে, সেইখানে হেডস্টকের যাওয়া আসা, ধারালো টুলবিটের কাছাকাছি। সে এভাবেই শেভিং মেশিনটায় শরীর এমন মিশিয়ে দেয়। মেশিনের গায়ে ভীমকে ছায়া লাগে। বাঁকা মত। জলের ভেতর যেমন পা মচকে যায় চোখের দেখা দিয়ে। তেমন হৃৎপিণ্ডের শব্দ, যেমন বাটালিতে কুঁদে ওঠে বৃষকাঠের মুখ, তেমন যেন বুকের সবচেয়ে ভেতরের চাপ চাপ আঁধার রক্তের মত দু হাত ডুবিয়ে মেশিনটা তুলে নেয় সে শব্দ, আর. এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি ভীম, ছেলেকে মাই দেবার মত পায়ের আঙুলে শরীর রেখে সারা বুকটা ঝুঁকিয়ে দেয় ছিলার মত টান টান। অথচ নরম জ্যোৎস্নার মত সে। কামার কুণ্ডু লেনে নরম জ্যোৎস্না কখনো সখনো ভীমের চোখে নেমে আসে। তখন সে হয়ত ও-টি করে ফিরে যায় যখন। আবার ছোট ঘরের একফালি জায়গায় যখন ঘুমভাঙা চোখে জানলার ফাঁক দিয়ে নরম জ্যোৎস্না চোখের ওপর এসে পড়ে, একা একা কল্পনা ও স্বপ্নের মত ভাবনা দিয়ে জ্যোৎস্নাময় হয়ে যায় সে।

এত এত জ্যোৎস্নার মধ্যে লুটিয়ে পড়া গঙ্গার স্বাধীন বাতাসের মত ভীমের শরীর সেই বিছিয়ে থাকা চাঁদের আলোয় থাকে না। দু হাত ডুবিয়ে মেশিনকে চাপ চাপ রক্ত দেবার মত। তখন সে ভাবতে পারে করোগেটের টিনের ছাউনির ফুটো ধরে আকাশের বিন্দু বা আলোর স্ফটিক, একটুকরো চাঁদ নয়, একরত্তি আলো তাকে বিঁধে রাখে একরাশ ভাবনার জ্যোৎস্নার মধ্যে। তখন সে সেই ভাবনার মিথ্যেতে থেকে ভুল করে দিয়ে দেয় যেমন জ্যোৎস্না পাবার মত হাত ডুবিয়ে তোলা রক্ত, তেমন করে মরে যাবার মত তার প্রচণ্ড সাধ

আহ্লাদ করোগেটের টিনের তলায় থাকে। প্রচণ্ডতা মেশিনকে বুক ঢুলিয়ে দেয়। কিন্তু ওপরে ঝোলা বাল্বের আলোর নীচের সব মেশিনগুলোর ছায়া ও মিস্ত্রি-হেডমিস্ত্রি-হেলপারের ছায়াতে, হাত ছুঁড়ে বাতাস কাটলে ও হ্যাণ্ডগ্লাই-এ শরীর ঝাঁকিয়ে দিলে একটা ছায়া ছায়া আলো এবং আলো আলো ছায়া থাকে, ভীমের এ থেকে কিছু ভাবনায় থাকে যেন। ভীমের সে ভাবনার বিশেষ বিশেষ কোনো আকার থাকে না। যেমন তার শুধুমুধু একরাশ রাতভর ঘুমিয়ে পড়বে, ভেবে নেবে। তেমন জ্যোৎস্না তাকে গায়ে উপুড় করে দেয় না, বুকের মধ্যে রাখে।

এমন একটা জানলা আছে, টুলে বসে থাকা হেলপার ফড়িংয়ের কাছে থাকে, ভীম জানলাটাকে বুকে রাখে চোখে রাখতে সময় পায় না। তেমন করে সে কখনোই ভুলতে পারে না যে সে এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি ছাড়া অন্যকিছু। এ কথা ভোলার কথা মনে এলে হাসি পায় ভীমের। তার শরীর, সে, দেখে তখন। চোখ বুলিয়ে নেয়। বুক ধরে আরো নীচে চোখ দুটোকে চাকার মত গড়িয়ে দেয়। জানলাটায় একফালি ন্যাকড়া ছেঁড়া আকাশ আছে। বাড়ির ছাদে তারে মেলা রঙিন শাড়ি লুটিয়ে পড়া আছে, আছে অ্যান্টেনা, টুকরো মেঘ, চিলে ছাদের কাক। কবে কখন মেসিন থেকে শরীরটাকে খুলে নিয়ে টুলে চড়ে হাঁটুমুড়ে দেখেছিল এসব, এখন হ্যাণ্ডগ্লাই-এ দুহাত গুঁজে দিয়ে শরীর ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে জানলায় দেখা সত্যি এখনো মিথ্যে করতে পারে না। কেন পারে না বললে, সে যখন কারখানার বাইরে থাকে সে-সত্যি ভীমের কাছে কত গভীর হয়ে ওঠে! নিজে যে এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি এটা যে মিথ্যে নয়, তবে সে সাহস করবে কেন মেশিনে ভুল কাটার মত আর-সব-কিছু। মেশিনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে নিজে নিজে কাউকে না দেখিয়ে হাসার মত এটা এত সহজ নয় এটা জানে ভীম।

যেমন রণো গ্যাংনিং-এ জিরো মাপে মাল ফিনিস করছিল, লেডে বাঘাদাকে ডান পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, মিলিং-এ রোলার ফ্রেম ফিনিশ করছিল বাচ্চুদা আর জিতু, ড্রিলিং-এ একাই নান্টু ছিল, হেলপার ফড়িং টুলে বসে হাঁটুদুটোতে মাথা গুঁজে ছিল, আপারলিঙ্ক দশ পিস কাটা শেষ হল ভীমের, তখন ভীম জানত যে এখনই গ্যাংনিং-এর রণোর সঙ্গে তার চোখাচোখি হবে। আর কী আশ্চর্য তখন চোখে চোখে দেখাদেখি হয়ে গেল। কারণ ওখানে মালটা জিরো মাপে ফিনিশ হবে কি না! মালটা পৌঁছতে গিয়ে টুলের ওপর ফড়িং মাথা গুঁজে তখনো ছিল, রণো কাজের মধ্যে এমন গভীর হয়েছিল যে ভীমের দিকে রণোর মনটা ছিল চোখ ছিল না। এখানে যখন তখন নিজের মনে হাসা কত সহজ সেটা জানে ভীম। হাসতে হাসতে নিজের মেশিনের দিকে চলে আসে। এবং কী আশ্চর্য হাসতে হাসতে এমন হয় যে, সেখান থেকে ভীমকে কেউ দেখতে পায় না, সেখানে গিয়ে মেশিনের আড়ালে আরো সব মেশিনের দেওয়ালে আটকে পড়ে, গোপনে হাসে। মেশিনগুলোই তার প্রহরা। তখন সে নিজের মেশিনের গায়ে হাত-দুটোকে পুরে দিয়ে মোষের মত ঠেলতে ঠেলতে হাসে। মেশিনটা বন্ধ। মেশিনটা

হুকুম করবে সে ক্ষমতা মেশিনের নেই। তাই ভীম মেসিনের গায়ে আঙুলের অসংখ্য রেখা এঁকে এঁকে দেয় মৃত পশুকে স্পর্শ করবার মত।

এমন করে হাসার মত যদি সহজ হত তাহলে এন বি নিউমেটিকস পাওয়ার টুলস-এর হেডমিস্ত্রি ভীম প্রথমে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করত। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ানো সেই সব সুন্দর যুবকদের কাছে সুন্দরী মেয়েরা আসে, জানতে চায় কোথায় কোন বাস যাবে। রাস্তার নাবারও জানতে আসে। তারপর তারা এমনভাবে কথা বলে যে তাদের কতদিনের চেনাজানা, মুহূর্তে তারা প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে যায়। ওই হাসির সহজের মত তারপর সে মানানসই শার্ট প্যান্ট পরবে। যাতে সে হেঁটে যেতে পারবে সহজ ছন্দে। তারপর সে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তার চশমার ছায়ার মধ্যে চোখ দুটি নরম শান্ত হবে আরো, প্যান্টের ভেতরের জাঙ্গিয়া গুটিয়ে গিয়ে বেখাপ্পা ফুটে উঠে তাকে কদর্য প্রত্যাখ্যানে কাচুমাচু করাবে না। ইস্ত্রির তার কোঁচকাবে না। ঘামে ভুরুর চুল না খসে নিপাট থাকবে।

তেমন সে যদি ভাবে মেশিন চলার সময় মেশিনের সঙ্গে নাটবল্টু দিয়ে তার দুটো দুটো হাত পা জুড়ে থাকে না, তা ভুল। তাই সে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কখনো ফুটপাথে হাঁটে, পায়ে পায়ে গঙ্গায় চলে যায়, কখনো চা-দোকানে, বন্ধুদের আড্ডায় চলে যায়। তাই তার নিয়মিত হাঁটা চলার মধ্যে কখনো সে শখ করে ডাব কিনে খায়। কোলড্রিঙ্কস কিনে খায়, চানাচুর খায়, শশা-পেয়ারা খায়। কোনো মেয়েকে ভালবাসার সাধ তার এমন করে আসতে পারে না, সে জানে। কারণ তার হাসির মত এসব এত সহজ নয়। তাই সে এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি তা ভুলতে পারে না কখনো।

এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্ একটা নর্দমার সামনে মুখ থুবড়ে, গহ্বরতার আরো অন্ধকারের দিকে চলে গেছে। আর একটা কারখানার পাঁচিলের অন্ধকারে কারখানাটা শেষ হয়ে গেছে। ওপরে ফাঁকা ফাঁকা লোহার বিম। ওপরে অনেক উঁচুতে করগেটের টিন। লম্বা তারে ঝুলে আছে কয়েকটা বাল্ব। অসম্ভব রকম ঝুল। দেওয়ালে দেওয়ালে মাকড়সা ও টিকটিকি অসংখ্য। নীচে কাস্টিং না হওয়া কাঁচামালের ডাঁই। কিছু ফিনিশ মাল একদিকে গোছানো। মেশিনগুলো নানাদিকে নানামুখে ঘোরানো। পাশে মাল কেটে বেরিয়ে আসা খাবার জমে উঠেছে। কতরকম মাল হতে আসে, কতরকম তার হিশেব, কতরকমভাবে তাকে কাটতে হয়। তার হাতের আঙুলের মাঝখানে চুলের মত বিন্দুর মত স্থির না-নড়া না মোটা চিকণ মাপজোক ধরা দেয়। না-হলে সে চুলের হাজার ভাগের হিশেব মত মাল কাটে কি করে অত মোটা মোটা আঙুল দিয়ে ?

লেডের বাঘাদা মাল ফিনিস করে মেশিন বন্ধ করেই খোঁড়া কুকুরের মত লাফাতে লাফাতে রণোর কাছে চলে এল। কম দামি গেঞ্জিটা প্যান্টে গোঁজা ছিল। বাঁ হাতে খামচে তাতে মুখটা মুছে নেয় মুহূর্তে। সেই ফাঁকে ভীমকে দেখে নেয়। 'অত কাজ

করলে মালিকের বউ ত আঁচল ঘুরিয়ে বাতাস করবে নি, দ্যাক্, মালিকের বোন আতপ আছে যদি ভীমকে আঁচল চাপা দেয়।'

রণো দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বাঘাদাকে ভয় দেখায়। বাঘাদা দরজার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে আবার যেমনকে তেমন। 'ও ম্যানেজার শুনলে মরে গেল' গলাটা খাটো করে 'ফাসকেলাস বিয়ে করেচে ম্যানেজার' চোখ মারে বাঘাদা থাপটা গালে। বাঘাদা প্যান্টটা দুদিকে হাত দিয়ে নাচার ভঙ্গিতে ওপরে তোলে। ওই সঙ্গে ঠোঁটদুটো ছোঁচালো করে—'শালা ঘুমোচ্ছে দ্যাকো!'

ফড়িং ঘুমোচ্ছে টুলের ওপর দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে।

'অ্যাই গেঁয়ো ভূত!' ভীম বাঁ হাতটা ডান হাতের হ্যাণ্ডেলে এনে ডান হাতের ঝাপটা মারে ফড়িংকে।

ফড়িং লালা গড়ানো সভীর ঘুম থেকে উঠে আসে। টুপ করে মালে ফেনাঅলা জল ঢালে।

ভীম ফড়িং-এর দিকে কটমট চোখে দেখে। ফড়িং হাসে। আধলা। ডান হাত নিশপিশ করে ওঠা চড়টা ফড়িংকে না দিয়ে মেশিনে গুঁজে দিল যেন সে বয়লারে বেলচা মারার মত।

রণো বলছে—'নান্টুকে শুধাও, নান্টু যদি বলে তাহতে জামাইয়ের হোটেলে পেটপুরে মাংস রুটি খাওয়াব।'

'খাওয়াবি?' বাঘাদার চোখ নাচছে। আলোময় উজ্জ্বল মুখ। চতুর হয়ে উঠছে মুখটা আরো। 'কিরে নান্টু সত্তি নয়?' চোখ মারে নান্টুকে।

'সত্তি, সত্তি।' নান্টু কাজে মগ্ন।

'ওই সুখে থাক, বাঘাদা মাংস রুটি খাবে, ভীম, বাঘাদার প্যান্টটা খুলে নে ত—হা হা—বুড়ো!'

'বুড়ো না দেকেচে কি।' বাঘাদা আবার নাচতে নাচতে প্যান্ট তোলে।

'না কচি খোকা, বুড়ো ভাম!'

'এই শালা গেঁয়ো ভূত, ফের ঘুমুচ্ছিস? নাথি মারি এবার?' ভীমের হাত ছুটে যায় ফড়িঙের দিকে। ফড়িং দেওয়ালের দিকে গুটিয়ে সেঁটে যায়। ভীম মেশিনে থেকে অনেক চেষ্টা করেও ফড়িংকে মারতে পারে না। কোনো একটা চড় ফড়িঙের গারে লাগে না বলে ভীমের বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে লাগে। মেশিনে বুক মিশিয়ে থাকে। মেশিনে যন্ত্র ভরে দেবার কষ্ট আর এই কষ্ট দুটোতে কষ্ট পায় ভীষণ ভীম। এমন অনেক কষ্ট আছে তার সে ঠিক কী কী জানে না। একটা অস্পষ্ট কষ্টের আকার তার বুক জুড়ে থাকে। কামার কুণ্ডু লেনের বিছানায়ও। রাস্তায়, ফুটপাথে। গঙ্গার ধারে, বাসস্টপে। এটুকু জানে যে কোথাও পালাই এটা তার সব শেষে মনে হয়। তবে সে কোথায় কোনখানে কিরকম জায়গায় কল্পনায় জুড়তে জুড়তে কষ্টটা কখন মুছে যায়, কপালের ঘামের মত শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তেমন এই সময়ের কাজের

সময়ের যন্ত্র ও প্লাই ঠিক ঠিক ঘোরানোর মধ্যে যে কষ্ট হয় তা ত ফুটে ওঠে ঘাম হয়ে, এই ঘামও একসময় মুছে যায়। সে তখন উচ্ছন্নে যাবার ফন্দি আঁটে। ফূর্তি করবার মতলব করে চুপি চুপি। তাছাড়া তার ত নিজস্ব কিছু নেই। এইটা বাদ দিলে আর আর ভাবনাকে দাঁড় করাতে পারে না। তখন সে মনের ভেতর চোখ নিয়ে নাচানাচি করে। ভারি ভাল লাগে সঙ্গী সাথিদের, রণো, জিতু, নান্টুদের, ফড়িংকেও। পয়সা ওড়াবে সে যেখানে খুশি। এই সন্তুষ্টির জন্যে সে রোজ রোজ পায়ে পায়ে কারখানায় চলে আসে ঠিক সময়। ছুটির সময় চোখে মুখে জলের থাবড়া মেরে তক্ষুণি পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়।

তাই উচ্ছন্নে যাবার স্বাধীনতা ভয়ানক ভাবে পায় বলে বুঝি সে মেশিনে থাকার কষ্ট পেলে সে চিৎকার করে ভাংচুর করে না। এটা ভেবে সে আনন্দ পায়। ফড়িংকে ভাইটির মত পিঠে হাত দিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। ভেতর থেকে হু হু আবেগ এসে কণ্ঠনালিতে জমাট হয়, গুর গুর করে বুক, চোখে জল এসে যায়। মেশিন আর সে আলাদা সত্তা এই দুটোকে আলাদা করে ভাবতে পারে বলে সে উচ্ছন্নে যায়।

'গেঁয়ো ভূত বল কেন?'

'অ্যাঁ? ভীম দেখল ফড়িং টুলে বসে হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে মায়াভরা চোখে। ঠাশ করে একটা চড় মারতে ইচ্ছে যায় ভীমের।

'গেঁয়ো ভূত বল কেন?'

'গেঁয়ো বলে।' ভীম হাসে।

'জানো মানিকতলায় দু বছর সুটকেসের কারখানায় কাজ করেচি।'

ভীম ঘাড় বাঁকায়। 'কতবার শোনাবি?' ভীম মারমুখী। এবার বলবি বৌদির কথা, লজ্জা 'থুম।'

'বাবা কোতাকে কাজ করে জানো?'

'কোথায়?'

'বেহালায়।'

'মালটা কেমন কাটা হচ্ছে দেখচিস মন দিয়ে?'

'সবসময় দেখা যায় নাকি একই ত?'

'নাথি মারি, মেদনিপুরিয়া ভূত?'

'মেদনিপুর জেলাকে ঘর মেদনিপুরিয়া যদি বল মুখে হাত চাপা দুবুনি, কিন্তু দাদুর কালে একুনে এগার বিঘা জমি না চলে যেতোক তাহলে এখানে আসতে হোতকনি।'

'বড়লোক ছিলি বল্।' ভীম ঘাড় ফেরায়।

'দুটা দিদির বিয়া দিছে বড় ঘরে, দাদা বিয়া করেছে লোহাদায়—কাঠের ব্যবসা আছে বৌদির বাপের।'

'তোদের পুকুর আছে?'

'দুটা, একটাতে মাছ হয়।'

'বড় বড় মাছ ?'

'ছোট বড় সব। চিংড়ি পুঁটি কালবোশ তারুই মিরগেল রুই ট্যাংরা। বোয়াল একটা আছে চুনোমাছ খায়।'

'কি করে জানলি একটা আছে ?' ঘাড় বেঁকিয়ে রাখে ভীম।

'ঘাই মারে।'

'এদিকে তাকা, দ্যাক্ না মালটা ফিনিশ হতে চলল।'

'একটু একটু করে শিখব। এটা জেনে গেছি—আরো কত…'

'তুমিই কাজ শিখবে বুড়ো ধাড়ি, লাথি মারতে মারতে বাইরে বার করে দোব।' মেশিনে ঝুঁকে পড়ে আবার ভীম। এবারও বুকে চিড়িক করে উঠল আজ বুধবার মাথায় এসে। কাল ছুটির দিন। সকাল দশটায় মেশিনে উঠে বহুবার একথা তার মনে এসেছে। ভাল লেগেছে। কিন্তু ছুটিতে কি করবে? ফুর্তি করবে। উচ্ছন্নে যাবে। ফড়িঙের চোখ দুটোকে গেলে দেবে? তার পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পিঠে হাতের হাড় দুটোর চলাফেরা দেখছে ফড়িং। 'জল দে, হাঁ করে দেকচিস্ কী, একি কাস্টিং মাল ?'

মালে জল দেয় ফড়িং।

স্লাই ঘোরায় ভীম। 'তুই ঘরে কোথায় ঘুমোস ?'

'দোতলায়কে, দখিন দিককার ঘরে, একা। হাওয়া দেয় খুব, সামনে পুকুর কি না।'

'অনেকগুলো ঘর বল্ ?'

'হ্যাঁ চারখানা, মাটির, চারদিকে বাঁধানো তাই বানে পড়ে নি।'

'বানে কোথায় ছিলি ?'

'বাঁধে।'

'সাঁতার জানিস ?'

'হ্যাঁ।'

ভীমের মনে হয় সাঁতার জানলে কী আর হবে মেশিনের মাপজোক কি ফড়িং জানে? লাথি কষাতে ইচ্ছে করে।

'তোদের কলাগাছ আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কলা হয় ? পেঁপে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'রাতের বেলা অন্ধকার লাগে না ?'

'না, আঁধারে একটুকুনি থাকলে ঠিক হয়ে যায়।'

ভীম কাজ করে। ফড়িং হাঁ করে দেখে।

ম্যানেজার কখন এসেছিল ভীম বুঝতে পারে নি। আজও ও-টি করতে হবে বলতে কখন চুপি চুপি এসেছিল লক্ষ করে নি ভীম। এখন সকলে মেশিন বন্ধ করে ছুটোপাটি

করে প্রতিদিনের মত। ড্রিলিঙের চাতালের সামনে এসে সকলে জড়ো হয়েছে দেখে বুঝতে পারে ভীম। জিতু আর বাঘাদা মুখোমুখি বিড়ি ধরাচ্ছে। বাঘাদা প্যাণ্টটা বাঁ হাতে ওপরে তুলছে। রণো নস্যির ডিবেয় দুটো আঙুল ডুবিয়ে দেয়। নাণ্টু চাতালে মিশে তক্ষুণি পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়। সাট্টায় কী ঘর লেগেছে জানতে চলে গেল টুক করে। জিতু গান ধরেছে। ভীমের ঘেন্না লাগে। সে বরং কাজই করবে। সে ও ফাড়িং একা একা থাকে।

ফড়িং মাকড়সা দেখছে টুলের ওপর বসে বসে। ভীম দড়াম করে ফড়িঙের পিঠে থাপ্পড় মারে—'অ্যাই শালা গেঁয়ো ভূত!'

ফড়িং চমকে ওঠে। সুউই করে নেমে আসে নীচে।

প্যাণ্টের চোরা পকেট থেকে পয়সা বার করতে করতে ভীম ডান দিকের পেটের তলায় হাত গলিয়ে দেয়। ফড়িং সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জাঙ্গিয়ার রবারের পটির তলায় চুলকোতে শুরু করে ভীম। ভীম আরো কিছুক্ষণ ফড়িংকে দাঁড় করিয়ে রেখে চুলকোতে পারে কিন্তু চুলকোনোর সুখ পুরোপুরি না পেয়েই পকেট থেকে টেনে বার করে আনে আধুলিটা। ফড়িঙের হাতে গুঁজে দিল। 'দুটো কিং সাইজ।'

'বড় ?'

'হ্যাঁ চার্মস।'

'মালটা হয়ে গেল ?'

'হ্যাঁ।'

'মালটা এবার মুই বাঁধব।'

'গেঁয়ো ভুত, মালটা মুই বাঁধব।' ভ্যাংচায় ভীম। 'যা।'

ওরা এখনো বিড়ি টানছে। কথা বলছে। গান করছে। ভীম টুলটার ওপর উঠে বসে। ভয়ানক ইচ্ছেতে জানলার দিকে তাকায়। আকাশ উজ্জ্বল। গভীর নীল। ইলেকট্রিক তারে গেঁথে গেঁথে সেলাই করা একফালি ন্যাকড়ার মত আকাশ জানলায় এঁটে আছে। ভীমের মুখের সামনে। ভীম মরীয়া হয়ে চুরি করে জানলার দিকে তাকায়। একা থাকতে তার বেশ লাগছে। জিরোবে কি, মাল কাটার ঘোর তার মধ্যে। তাকে পেড়ে ফেলে সব সময়। হেডস্টকের যাতায়াতে টুলবিটের ধার সব সময় যেন মালে চুমু খাচ্ছে। বাবরি বেরচ্ছে অবিরত। অবিরত শিন্ শিন্ শব্দ। ডান হাত যেখানে পড়ে সেখানে যেন হ্যাণ্ড-প্লাই আছে ভুল করে ভীম। জানলার মুখোমুখি হয় তাই সে।

ফড়িং কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

নীচে সুউই করে নামে ভীম। খপ করে সিগারেট দুটো নিয়ে নিল। মেশিনের ওপরের খাঁজ থেকে লুকিয়ে রাখা দেশলাইটা পেড়ে সিগারেট ধরাল। তারপর উঁচু টুলটায় ফের লাফিয়ে বসে পড়ে। ফড়িং ভীমের পায়ের তলা দিয়ে মাথা গলিয়ে মেশিনের ওদিকটা চলে যায়। মেশিনের চারপাশে বাবরির ডাঁই। বাবরিগুলো পা দিয়ে সরাচ্ছে ফড়িং—'যেন পোয়াল গো।'

'পোয়াল কী রে ?' সিগারেটে লম্বা টান দেয় ভীম। পা দোলায়।

'তুমি কী জানো ?'

'গেঁয়ো ভূত মেদ্‌নিপুরিয়া।'

'ধান হয় জান ত, ভাত খাও—সেই খড়ের।'

'গেঁয়ো ভূত। তোর বৌদির 'খুম' লজ্জা না ?'

'খাটতে পারে খুম।'

ভীম জানে ফড়িং এখন রাগবে না, মাল বাঁধার মেজাজে আছে। ভীম সিগারেট খেতে খেতে ফড়িংকে দেখে। কি আগ্রহ নিয়ে মালটাকে বাঁধছে। ভীম টুল থেকে গলা বাড়িয়ে দেয় সেদিকে। ফড়িং হাসছে না, কাজ করছে। ভীম হাসছে।

'ভীমদা লাঙল দেকেচ ?'

'হাঁ৷ ছবিতে।'

'লাঙলকেও বাঁধতে হয় গরুর সাথে।'

'ঝামেলা বল্।'

'ঝামেলা কি!'

'চ যাবি কামার কুণ্ডু লেনে? এক বিছানায় শুবো—এক জায়গায় দশটা থেকে ভি-ডি-ও হয়, ফাসকেলাস সব সিনেমা হয়, যাবি ?'

'অমিতাভ বচ্চন রেখা ? গব্বর সিং ?'

'ধ্যেৎ সে আলাদা সিনেমা দেখব, বেলা পর্যন্ত ঘুমবো, মাছ আনব বাজার থেকে, দুপুর বেলা মাছের ঝোল ভাত খেয়ে বঙ্গবাসীতে 'নয়া কদম' মেরে দোব। কী করবি যাবি ? চল না!'

'না গো ভীমদা, ঘরে গরমের চায় করেছে নি, কদিন খালে জল নেই কো, গত জোটালে জল ওঠে নি, খাঁ খাঁ করছে ধানগাছ, পোকাও নেগেচে ঢের, জল না পেলে বুকে মারি না মাথায় মারি অবস্থায় হয়। দাদা শনিবার ছাড়া ঘরকে যেতে পারে নি। বৌদির কষ্ট জমি নিয়ে।' ফড়িং মালটা বেঁধে মালের টাল ভাঙছে।

দূরে কোথাও নির্জনে কারো কারো এমন কষ্ট আছে। বিশেষ কারো কষ্টের কথা শুনলে এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি, ভীমের মনটা খচ্ খচ করে ওঠে।

'মা ত খোঁড়া মানুষ, জ্বরের সময় ছটফটাই, বৌদি মায়ের মত কাছে শোয়।'

লাফিয়ে নামল ভীম। 'সরে যা'—ঠেলে দিল বাবরির স্তূপের দিকে ফড়িংকে। ফড়িং পোয়ালে বসে থাকা রাখাল ছেলের মত মুখ ছোট করে ভীমের কাজ দেখছে। ভীম কেমন মালের টাল ভাঙছে গোগ্রাসে গিলছে। ভীমের ঠোঁটে ধরা সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। মালের টাল ভাঙা হয়ে গেল মুহূর্তে। ঘুরে এল। সুইচে হাত দিল। মেশিন চলছে। ভীম মেশিনে আসে। প্লাই ঘোরায়। মালের দিকে লক্ষ্য রাখে।

ফড়িং টুলের ওপর এসে বসেছে।

ফড়িঙের সঙ্গে এর ফাঁকে কথা বলতে ইচ্ছে করে ভীমের। 'তোরা চাষ করিস?'

'হ্যাঁ ত।'

'তবে কারখানায় এলি?'

'খাব কী?'

'কেন ভাত, মাছ?'

'তুমি বুঝবে নি।'

ভীম হেডমিস্ত্রি হয়েও বুঝতে পারবে না? আশ্চর্য! ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে সে অবহেলায় ফড়িংকে। 'থাকবি সিনেমা দেখব?'

'না ধানে জল নেই গো।'

'আরে ধ্যেৎ থাক না।'

'তালরস খেয়েচ?'

'না তাড়ি খেয়েচি।'

'দুটা গাছে রস দিচ্ছি, গুড় হয়।'

'রস খেতে ভাল?'

'খুউব।'

'তোদের বাড়ির সামনেটা ফাঁকা?'

'দূরের মাঠ. মাঠ পেরিয়ে সকলে হাট যায়।

'গাছপালা নেই?'

'অনেক।'

'গাছে চড়তে জানিস?'

'হ্যাঁ।'

'গাছের তলায় ছায়ায় হাওয়া দেয়?'

'গা জুড়িয়ে যায়।'

'তেঁতুল তোদের কিনতে হয়?'

'না গাছ আছে, দিদিরা সুপুরি দেয়!

'এক কলসি রস কমে গেলে তোদের গুড় কমে যাবে?'

'রস কেউ চাইলে দিয়ে দিই এত।'

'জলের বদলে যদি কেউ রস খায়?'

'কত খাবে?'

'আম গাছ আছে? আম হয়েছে?'

'কাঁচা আমের টক করে বৌদি রোজ।'

'যত খুশি খাওয়া যায়, না?'

'হ্যাঁ!'

ভীম অবিশ্বাসে ঘাড় বেঁকিয়ে ফাড়ংকে দেখে। ফাড়ংকে শুধোতে তবু তার ভাল লাগছে। 'বেশ বড় বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুমনো যাবে ?'

'হ্যাঁ হাওয়া দেয়।'

'ধানগাছের কেমন ফুল রে, ঘরে এনে রাখা যায় ?'

'সে বুঝবে নি, গেলেই দেখতে পাবে।'

'নিয়ে যাবি ?'

'যাবে।'

'আজ ?'

'হ্যাঁ ভাল তো, কাল ছুটির দিন।'

'গাড়িতে ক-ঘণ্টা ?'

'দেড়ঘণ্টা, তারপর সাইকেলে আধঘণ্টা।'

'তোর ভাত চাপা থাকে ?'

'না মোর জন্যে বৌদি না খেয়ে থাকে, মা ত খোঁড়া।'

'গেলে ত ভাত পাব না অত রাতে।'

'মোদের পান্তা থাকে এত।'

'ও।'

'চল না, আজকেই চল।'

ভীম কোনো কথার আর জবাব দেয় না।

'চল না, আজকেই চল।'

ভীম চুপ। মেশিনটা বন্ধ করে এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি ভীম দূরে চোখ নিয়ে গেছে। সামনের মেশিনটা যেন একটা খেত।

উদোম গায়ে গামছাটা জড়িয়ে ফাড়ঙের সঙ্গে নেমে এসেছে ভীম বাঁশবনে। চারদিকে গভীর বাঁশবন। মাথার কাছে নুয়ে পড়া বাঁশ, পিছলানো জ্যোস্নায় বাঁশের সরু শরীর ছড়িয়ে আছে পা মাটিতে না রাখতে পারার মত। খিড়কির দরজার সামনে উঁচুটায় হ্যারিকেন হাতে ফাড়ঙের বৌদি। মা আছে উঠোনে। হাঁটতে চলতে পারে না মা। বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। ফাড়ঙের বৌদি কি করে দাঁড়িয়ে আছে ভাবতে পারে না ভীম। একটু আগেও নাকি কাতরাচ্ছিল। সোনার মাকেও ডাকা হয়ে গিয়েছিল। ফাড়ং ভীম আসার পরও অ্যাঁদালে ক্যাঁদালে ফিসফাস চলছিল। তখনো নাকি কাতরাচ্ছিল ফাড়ঙের বৌদি। সন্তানকে ভূমিষ্ঠ দেবার যদি ব্যথা হয়, তাহলে বৌদি কত ব্যথা সারাটি শরীর জুড়ে ভরে রেখে আলো তুলে এক হাতে দরজায় হাত রেখে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, এটা ভাবতে গেলে বাঁশের নুয়ে পড়া ভাবের মত শিকড়ে টান টান বৌদিও জ্যোস্নাময় হয়ে উঠবে। উজ্জ্বল। গালের একপাশে আলো। জ্যোৎস্নার মত। চোখের তারায় জোনাকির মত আলো।

'চল্ নদীর দিকে নিয়ে চল্।'

'এখন ?'

'হ্যাঁ। চল্।'

বাঁশবনের গভীরে ঢুকে পড়ল ওরা। বাঁশের পাতায় পাতায়, কোমরে পিঠে গলায় জ্যোৎস্না লুকোচুরি করে। ভেতরে অন্ধকারের বদলে হালকা খয়েরি আলো। দুজনে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে। কখনো ফড়িং এগোয় কখনো ভীম। ভীমের যেন কত চেনা। বাঁশবন যদি সামনে আরো আরো থাকে তাহলে শুধু বাঁশবনের ভেতর ভীম হাঁটবে যেন। পায়ে পাতার শব্দ। কান পেতে থাকা রাত্রি পাতায় পায়ের শব্দে ব্যথার শব্দ শুনতে যেন অভ্যস্ত। ফড়িঙের বৌদি যদি এখনি হাঁটু মুড়ে কাঁদে ? তাহলে পাতায় পায়ের শব্দের থেকেও বেশি ব্যথাময় হয়ে উঠবে।

কাজললতার মত বাঁশবন পেরিয়ে এসে বাঁধ। তারপর নিচুতে গড়িয়ে যাওয়া নরম নরম মিহি জোৎস্না। বাঁধে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সব গাছ। ফড়িং নামছে। ভীম নামছে। গড়িয়ে গড়িয়ে। নেমে যায়। এগোয়। সামনে ধানের সবুজ জমি। কাছে এলে আরও সবুজ হয়। আল ধরে হাঁটে দুজনে। নদীর দিকে চলে। এই নদী এই নদী এল নিশ্বাস নিতে ও শেষ হতে যেন নদীকে দেখতে পাবে এখনি মনে হয় ভীমের। ভীম শিশিরে ভেজা মাটিতে বৃষ্টি এগিযে যাবার মত চলেছে। হাওয়ায় টালমাটাল হচ্ছে। সামনে চর। আরো নরম মাটি। ভীম বাতাসের ঘায়ে লুটিযে পড়তে পড়তে যায়। জ্যোৎস্নায় চিকন নদী চলকে উঠল ভীমের চোখে। এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি ভীমের। ভীম পাগলের মত এগোচ্ছে নদীর কাছে। প্রতিটি পা ফেলা চিহ্ন আঁকছে। নদীর পাড়েব দিকে এগোয় ভীম আরো। হাঁটু মুড়ে নদী বাতাসের ঘায়ে সন্তান দেবার মত এপাশ ওপাশ করছে।

এমন করে নির্জনে রাতের নদী দেখে নি ভীম। ছিপছিপে সরু নদী। উঁচু পাড়ে নরম মাটিতে দাঁড়িয়েছে। আরো নরম নদীর গায়ে চাঁদের আলো। চরের এপাশে ওপাশের গাছগুলো যেন চুপি চুপি কাছে আসছে একটু একটু করে। মনে হয় নদীটিও অনেক কাছে এসেছে হঠাৎ। তখন মনে হয় কামার কুণ্ডু লেনের কাছেই ছিল এই নদী, মনে করে আসতে পারে নি। চমকে ওঠে সে-যে এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি। সে যদি তার ডান হাত ছোঁড়ে ভুল করে হ্যাণ্ডল্লাই খুঁজবে, অথচ তার হাত আলোকবর্ষের হিসেব দিয়ে কষা তথাকথিত জীবিত-মৃত ছায়াপথের গায়ে আঁচড়ে দিল। ভীম এখন হ্যাণ্ডল্লাই ঘোরানোর জন্যে বাঁ-কাঁধ ঘুরিয়ে দিয়ে একটু উবু হয়ে মেশিনে শরীর ঢুলিয়ে দেবার ভঙ্গি করলেও হাতের কাছে মেশিন পাবে না। গাছের কোমর, বাহু, নদীর আছড়ানির দিকে তার হাত চলে যায়।

নদীর অনেক কাছে গেছে ভীম, যেখানে নদীর পাড় ভাঙে। ধস নামে।

'চল।' ভীমের কাঁধে হাত দিল ফড়িং।

ভীম পিছু ফেরে।

'দেকচ, ফাট নিয়েছে পাড়, আজকেই ধস নেবে।'

হঠাৎ ঘরে ফেরার টান বোধ করল ভীম। কামার কুণ্ডু লেনের পাশেই যেন এই ঘরটা ছিল, অথচ তার সন্ধান যেন পেয়েছিল না মনে হয়।

চেনা পায়ে ভীম এগিয়ে যায়। দুপাশে চারা তাল খেজুরগাছ রেখে, ছোট ছোট মেঘের স্তূপের মত বাবলাগাছেদের রেখে এগিয়ে চলেছে সে। একটু একটু করে ওপরে উঠছে। মিষ্টি গন্ধ, প্রজাপতির গায়ে রেণুর মত আরো মিহি। ঘুমের মধ্যে হালকা স্বপ্নের মত ফনফনে। শরীরের মধ্যে হালকা মাটি গাছ-গাছালির গন্ধ চারিয়ে গেছে। ঘ্রাণের মধ্যে এঁটে বসে আছে। একটা তালগাছের তলায় এসে দাঁড়ায় সে। একটু জিরোয়। 'এটা তোদের গাছ ?'

'হ্যাঁ, কি করে ধরলে বল ত ?'

'রস খাব।' ভীম নাক টেনে গন্ধ নেয়।

ফড়িং কাঠবেড়ালির মত গাছে উঠে গেল।

ভীম তালগাছে দুহাত জড়িয়ে নাক ঠেকায়। বাতাস লেগে তালগাছের পাতায় খড় খড় শব্দ হচ্ছে। পাশ দিয়ে কাঠবেড়ালি সর সর পালাচ্ছে! ভীমের শরীরের একদিকে আলো অন্যদিকে ছিপছিপে অন্ধকার। চোখ দুটো গিনির মত ঝিকিয়ে উঠছে।

ফড়িং নীচে নামে। কলসীটা এগিয়ে দেয় ফড়িং। 'নাও।'

কলসীটা দুহাতে জড়িয়ে রসে মুখ ডোবায় ভীম। কলসীটা ওপরে উঠতে থাকে ভীমের উচ্ছন্নে যাবার আবেগের মত চরম গতিতে। শরীরময় রস গড়াচ্ছে। মেশিনে দুহাত ডুবিয়ে দেবার মত রসের প্রাচুর্য। গলায় বুকে পিঠে কিলবিল ঘামের মত যেন শিরা উপশিরা ফুটে ওঠা রস গড়াচ্ছে। চাঁদের আলো পড়ে তাতে। কলসীটা মুখে উপুড় করে দেয় ভীম। সব শেষ। তক্ষুণি কলসীটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাবলাগাছের গোড়ায় লাগে। ঠং। ভেঙে গেল।

ফড়িঙের সঙ্গে ভীমের চোখাচোখি হয়—'ডাব মনে করে ফেললে বুঝি ?'

হ্যাঁ-ভুলে' হাত নাড়ায়, যেন হ্যাণ্ডগ্রাইটা ডান হাতে ধরে ফেলবে। হেডস্টক যাতায়াত করবে। প্লেসবিট মাল কেটে দেবে। মাপে মাপে।

'চল, হাত মুখ ধুয়ে খাবে চল।'

'চল্।' পেছু পেছু হাঁটে ভীম।

'বৌদির দিনমাস, আজ হয় কি কাল হয়।'

'হ্যাঁ।'

ভীম উঠোনে ধুলোয় খুস করে বসে পড়েছে। ফড়িঙের মা খুঁটির সামনে।

মা কত কথা বলে চলেছে।—'মোদের ফড়িংকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিও বাবা। ঘরকে থাকলে গাছে পালায় উঠবে, দুরন্ত খুম।'

'মুই ?' ফড়িং মায়ের কথায় তেতে ওঠে।

'তুই নয় তো কে ? ওর কোলে দুটো ভাই আছে, তারা ছোট ছোট, তবু তারা লেখাপড়া করে, ওর দাদা—সি এখন সুটকেশের কারখানায় ভালই হপ্তা পায়, আধলা যখন ছিল, মিস্তিরি মারে বলে কাজ ছেড়ে দিল। রতনের বাবা, বড়ছেলের নাম রতন বাবা, এই যে বৌমা, বৌমার শরীর ভাল নেই, রতনের বাবা তিনি বুড়ো বয়েসে বাঙালি বাবুর বাড়িতে দেখাশোনা করে নিজেরটা চালায়।—ও ফড়িং তোর বৌদি বুঝি আর উঠতে পারবে নি, তোর দাদাকে খেতে দে তুই।'

রান্নাঘরের দিকের ঘরটায় ঠক করে শব্দ। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ফড়িঙের বৌদি। রান্নাঘরে চলে গেল।

মায়ের মুখে আঁকিবুঁকি। 'ও বৌমা তোমার ওই শরীর নিয়ে আর…'

কাঁসার থালা ঝন ঝন বেজে উঠল।

ঘাড় বেঁকিয়ে রাখে মা। 'এখন ভাল আছো ত ?

কাঁসার থালায় আবার ঝন ঝন।

'তা বাবা তোমরা কটি ভাই বোন ?'

আড়ঘোমটার দেওয়ালের দিকে মুখ করে ভারি শরীরে উঠোনে আসন পেতে দিয়ে গেল বৌদি। সবাই চুপচাপ। লম্বা কাঁসার গেলাসে জল দিয়ে গেল। আবার কাঁসার দুটি থালায় ভাত দিয়ে গেল। যাওয়া আসার কষ্ট হয় না ? কী ভাবে পারে ? কাঁসার বাটি ভরে ভরে তরকারি দিয়ে গেল। পাতে মাছভাজা আলুভাজা। দিয়ে থুয়ে বৌদি খুঁটিতে হাত ঠেকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। খেতে বসার জন্যে নীরব আবেদন।

মা ছটফট করে। 'খেয়ে নাও বাবা।'

ভীম আর ফড়িং খেতে বসে গেল তক্ষুণি। ভীম ভাতে হাত দিয়ে বৌদিকে দেখে। খুঁটিতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভার শরীরে। খাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখছে। মুখে কাজলের মত ধ্যাবড়ানো অন্ধকার। ভীমের মুখ গুঁজে খাওয়ার সময় তারই মধ্যে কয়েকবার যদি ব্যথা এসে বৌদিকে ব্যথাময় করে দেয় দুহাতে ধরা খুঁটি জানবে, ভীম জানবে না। ভীম ভাত খায় উঠোনে বসে। বাড়ির বাইরে নুয়েপড়া গাছ গাছালি। ভীমের এবারও মনে হয় কামার কুণ্ডু লেনের পাশেই এরকম একটা উঠোন ছিল, সে জানত না। গাছগাছালি লুটিয়ে পড়া সুন্দর একটা উঠোন।

বৌদি থালায় করে ভাত এনে চুপি চুপি ভারময় পায়ে এগিয়ে আসে। পা দুটি লক্ষ্মীর পায়ের মত ছড়ানো, চিকন। পায়ের ডান কড়ে আঙুলে রুপোর রিং। ভীম মাথা গুঁজে খায়। পাতে বেশি করে ভাত দিয়ে চলে যায় বৌদি। ভীম দৃশ্যে ভারময় হয়ে থাকতে থাকতে, একবাটি দুধ এনে থালার পাশে বসিয়ে দিয়ে যায় বৌদি। দুধের বাটিতে আঙুলটা ডুবে ছিল বৌদির।

খাওয়া শেষ। জলের ঘটি নিয়ে উঠোনতলায় দাঁড়িয়ে আছে বৌদি। ভীম নেমে যায় উঠোনতলায়। ভীমের হাতে জল ঢালে বৌদি। এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার

টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি খ্যাপার মত হাত মুখ ধোয়, খ্যাপার মত বৌদিকে আরো কষ্ট দেয়। বাঁ হাতের গামছাটা বাড়িয়ে দিল।

'তোর বৌদি সারাদিনে মুখের থির দিলুনি, মা, ফড়িং এসে রাতেরবেলাকে একটু যেন ছেঁচে দেয়, সকলে ধানে জল দিতে নেগেচে। জিরিয়ে নিয়ে একঝোঁক ছেঁচে এস।'

লম্ফর আলো উঠোনতলায় টল টল করছে। মা অন্ধকারের গভীর থেকে কথা বলছে। 'একটু জিরিয়ে যেও, চাঁদের আলো আছে।'

'মুই ?'—ফড়িং।

'তুই নয়ত কে ? মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

বৌদি এঁটো থালাবাটি নিয়ে যায়, কষ্ট হচ্ছে বুঝতে না দিয়ে।

'একা ?'

'একা নয় ত দোকা পাবে কেথো ?'

'ডিস দিয়ে ছিঁচব ?'

'হ্যাঁ দেকে এসো না যাও না, ভরা খাল, হাত দিয়ে চোল চোল করে জল উঠবে।'

'মুই পারবু নি, সিউনি ধরুক কেউ।'

থালাবাসনের জোরে শব্দ হয় রান্নাঘরে। শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে থাকল। উঠোন চুপ। দুপদাপ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল বৌদি। উঠোনতলায় জ্যোৎস্নায় নেমে যায় বৌদি। গোলার ধারির ওপর থেকে সিউনিটা টেনে বার করে এনে উঠোনতলায় শব্দ করে ফেলে দেয়। জ্যোৎস্নায় আকাশের তলায় বৌদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'কই চল, মুই তমার সনে সিউনি ধরব।'

'বৌমা।' মা কেঁপে ওঠে। 'তুমি শুয়ে পড়ো গে যাও।'

বৌদির আঁচল মাথার ওপর থেকে খসে গেছে। 'না।'

'বৌমা তুমি ঘরকে শোও গে।'

'না, মোর শরীল ভাল আছে মা।'

'সারাদিনকে ব্যথা এসেচে ধেয়ে ধেয়ে।'

'এখন নেই।'

'যেদি কিছু হয় ?'

'মরবু নি।'

'ছেলেমানুষি করো নি বৌমা।'

'এই তো মুই ভাল আছি।' হাসে বৌমা।

খিড়কির দরজার দিকে ঘাপটি মেরে ছিল কেউ। এগিয়ে এল। 'ওগো রতনার মা, তোমার বৌমা ছেলে দেবে, তাই অমন কষ্ট দেয়া ব্যথা আগে আগে জানায়, এঁড়ে ব্যথা।'

'সোনার মা।'

'হ্যাঁ গো দিদি, তখন বৌমা আতার কাতার করছিল, একটু ঘুরে দেখে যাই কেমন আছে, ও বাবা তোমার বৌমা রণে চলল।'

বৌদি টলে পড়ে যাচ্ছিল। গোলার বাড় ধরে।

ভীমকে ওপরে নিয়ে যায় ফড়িং। দখিন দিকের ঘরে। জানলা ধরে হু হু হাওয়া দিচ্ছে। বড় তক্তাপোষের বিছানায় গড়িয়ে পড়ে ভীম। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে লুটিয়ে পড়েছে বিছানায়। বাইরে বেছানো আরো আরো জ্যোৎস্না।

'ভীমদা, ঘুমোও, জল ছেঁচে এসি একঝোঁক—ধানে জল নেই।'

'আমিও যাব।'

'না তুমি ঘুমাও কেন।'

'না।' বিছানায় উঠে বসে ভীম।

বেছানো জ্যোৎস্নায় হাওয়া লাগে; ভীম, এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি আকাশের তলায় জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় ধানের জমির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চারপাশে ঝাঁকড়া গাছ, গাছের জটলা। পাশ দিয়ে খাল বয়ে গেছে। একবুক কানায় কানায় জল। পোকারা ডাকছে কাছে-দূরে। খালের পাড় ধরে তালগাছের সারি। মাঝে মাঝে বাবলা খেজুর। চারদিকে কালি দিয়ে ধেবড়ে দেয়া গাছগাছালি। সামনেটা সবুজ, তারপরে হালকা সবুজ, তারপরে দিগন্তে গাঢ় কালো। ভিজে মাটি নরম মাটি। মাটিতে জল পড়ে সোঁদা গন্ধ। কাছে-দূরে অনেকে জল ছেঁচে। জল বাতাস কেটে আছড়ে পড়ার শব্দ। গড়িয়ে যায়। হঠাৎ বেশি হাওয়ায় গাছগাছালি বেশি নড়ে চড়ে উঠলে মনে হয় পাশ ফিরতে গিয়ে হঠাৎ জেগে উঠেছে। তখন গায়ে চাঁদের আলো ছেটানো মাখামাখিতে সে ঘুমোতে পারে না। ভীমেরও ঘুম পায় না। ভীম খালের পাড়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। ধানগাছ কেমন? তার ফুল কেমন দেখতে? কি ভাবে চাষ করে?

ফড়িং আর বৌদি সিউনিতে জল তোলে। বৌদির নুয়ে পড়া শরীর। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গাছেদের মত। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় নিখুঁত দেখা যায় না বলে আঙুল গলানো খোপায় টান টান মুখ। জলের ভেতরে ছায়া, তার ছায়ার ভেতর থেকে যেন মুখটা চেনামুখের ছায়ায়, ছায়ার মত অস্পষ্ট হয়েছে। ঘোমটা ভেঙে গিয়েছে তার। ছায়াময় মুখ, পাথরের মত ভারি। গাছের মত পা গেঁথে যেন হাওয়ায় লুটিয়ে পড়েছে। শরীরে ভার। ব্যথা যদি এসে কাঁপায়? শরীর চৌচির করে বেরিয়ে আসতে যদি চায় শিশু? সে কি পায় না কোনো ব্যথা? কিন্ কিন্ কিন্ কিন্! ঝনাক্ ঝনাক্!

ফড়িং ও ফড়িঙের বৌদি দুজনে জল তুলছে। সিউনি দিয়ে। দুদিকে সিউনির দুই দড়ির হাতল টিনের পাত্রটাকে জলে ডুবিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে সামনের নালায়। সেই নালা ধরে ধানের গাছে গাছে জল যাচ্ছে। গাছেরা সেই জলে খুশি হয়ে উঠছে। ধানের গাছে জল দেয় যেন অঞ্জলি ভরে দেয়। আঁচলে ভরা আনাজের খোসা গরুকে দেবার মত জল দেয়। শিশুর মুখ মুছিয়ে দেবার মত জল দেয়।

খালের জলে নেমে যায় ভীম। ছপাত ছপাত জল আছড়ে পড়ার শব্দ। বৌদি ঠিক

নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে পড়ে ভীম। জল নিয়ে খেলা করে। পাঁকের ভেতর পা পুঁতে যায়! চোখ দুটো হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে। বাছুরের চোখের মত আয়ত। ছোট ছোট মাছেরা তার পায়ে এসে জমেছে। যেন কোনো গাছের ডাল সে, হয়ত তবুর কোমর খালের জলে ডুবে আছে। মাছেরা এসে খেলা করছে এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস্-এর হেডমিস্ত্রি ভীমের শরীরে।

ভীমের লম্বাটে মুখ। চোখ দুটো ঢোকা ঢোকা! ছড়ির মত ছিপছিপে শরীর। কোনো মতে প্যান্টকে ধরে রাখতে পারে তার কোমর। অনেক ঘামে ভিজে ভিজে প্যান্টটাও ভীমের অঙ্গ হয়ে গেছে। গামছায় মুখ মোছার মত জলে সে তার স্বেদ মোছে। মাছেরা এসে তার শরীরে জমেছে।

এক ঝোঁক জল ছেঁচে ফড়িং ঘাড় ফেরায় 'খুব মাছ? কামড়াচ্ছে?

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' গভীর মাটির বুক থেকে যেন ভীমের কণ্ঠ ঢিপ ঢিপ করে বাজছে। ফড়িং সিউনির দড়ি ফেলে আলের ভেতরে ঢুকে যায়। ছুটতে থাকে। লুটোতে লুটোতে ছুটছে বাড়ির দিকে। দড়ির সঙ্গে আঁটা খুঁটো দুটো ধরে বৌদি পায়রাকে দানা ছড়িয়ে দেবার মত দাঁড়িয়ে আছে আল্‌গা হয়ে।

ভীম অবাক হয়। 'ফড়িং কোথায় গেল?' মাটির বুক থেকে ভীমের কণ্ঠ।

'খালে মুগরী আড়বে—ঘরকে গেল আনতে।' ভীমের বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করে উঠল বৌদির কণ্ঠ। মাটির বুকে।

তারপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

ভীম এই নিঃশব্দতার আবেগে ভেসে যায়। পেছন ফিরে খালের পাড়ে হামা দেয়। শিশুর মত উঠে আসে বৌদির কাছে। সিউনির খুঁটো দুটো দুহাতে তুলে নেয়। সেও জল ছেঁচবে। বৌদি কি ভাবল সেও সায় দিল হয়ত তার ধানে জল নেই বলে, বুকে মারি মাথায় মারি হচ্ছিল বলে, আনাড়ি ভীমের সঙ্গেও জল ছিঁচতে চায় খ্যাপার মত। না হয় ভীমকে করুণা করছে। ভীম শিশুর মত তার কাছে এসেছে। খুঁটো ধরে সিউনিটাকে জলে ফেলে ভীম পাগলের মত। কণ্ঠনালীতে তার আবেগ। কিছুতেই জল তুলতে পারছে না। আবার ডোবায়। কিভাবে ডোবাতে হয়, তুলতে হয় আছড়াতে হয় জানে না সে। সিউনিটা গেঁথে যাচ্ছে কাদায়। আবার ডোবাতে সাহায্য করে বৌদি। সিউনি জল ভরে। বৌদি ঠিক ঝোঁকে তুলে দেয়, ভীমের দিকটা ওঠে না। জল অনেক পড়ে যায়। কিছুটা জল নালায় পড়ে। বুকটা হালকা হয় ভীমের। তবু ত কিছু জল দিতে পারল ভীম। তারপর আবার ডোবায়। জলটুকুকে যেন দুজনে দুই হাতে ঠেলতে ঠেলতে গড়িয়ে দিচ্ছে ক্রমশ। পাখির বাসায় কুঁটি তোলার মত একটু একটু করে।

বৌদির হাত থেকে খুঁটো দুটো ছেড়ে গেল। হাত দুটো খালের পাড়ে আঁচড়ে কামড়ে উপুড় হওয়া ভারী শরীর ওপরে তুলল। দাঁড়াতে পারছে না বৌদি ব্যথায় চিৎকার করে কাতরাতে পারছে না। পাড় থেকে নেমে যায় আলের দিকে। পেছনে তাকায় না। আবার বুঝি ব্যথা জাগল। এঁড়ে ব্যথা। বৌদি চলে যাচ্ছে। ভীম অবাক হয় কি করে

ছিল বৌদি ? খালের পাড় হামা দিয়ে ভাঙবার মত আল ধরে বৌদি দুধারে ধানখেতের ভেতর দিয়ে হেঁটে যায় জ্যোৎস্নায় ভারময় হয়ে ব্যথায় কুকড়ে। এমন ব্যথা তাকে সইতে হবে, কতবার। ভীম নিথর চুপ। রাতের মত গভীর তার বুক। মনে হালকা ওড়াওড়ি ফনফনে কিছু ভাবনা। সে হালকা পাখির মত খালপাড়ের নির্জনে একা।

ফড়িং উলটো দিক থেকে এসে ঝপাঝপ ঝাঁপিয়ে পড়ে খালে। আগে থেকে বাড় বাতা খালে পাং মুগরী এড়ে দেয়। আবেগে নিশ্বাস তার ঘন ঘন পড়ছে। সম্পূর্ণ সেই গ্রামের দুরন্ত ছেলেটা হয়ে গেছে। তার সে হেলপার সে আর নেই। ভীম অবাক হয়ে ফড়িংকে দেখছে। ফড়িং কিভাবে মাছ ধরবে এই সব দিয়ে ? বুক সমান তার জল। তাতে সে হুটোপাটি করছে।

ফড়িং উঠে দাঁড়ায় পাড়ে। ছোট একটু ভিজে গামছায় ফড়িং। 'বৌদি চলে গেল ?'

হ্যাঁ।' রাতের শব্দ অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

'ধানে জল হলু নি।'

'আয় না আমি ধরব।'

'তুমি ?' ফড়িং হাসে।

'হাসিস কেন ?'

'তুমি কিছুই জান না।'

ভীম সত্যি কিছুই-জানে না। আবেগে গর গর করে ভীমের কণ্ঠনালী। 'আয় না। অসহায়ের মত ডাকে ভীম।

ফড়িং ভীমকে সঙ্গ দেবার মত খুঁটো দুটো ধরে। জলে সিউনি নামায়। সিউনি কাদায় গেঁথে যায়। হো হো করে হাসে ফড়িং।

'হাসিস যে ?'

'একি তোমার হ্যাণ্ডপ্লাই, শুদু ধরে রাখলে হবে নি, ছুঁড়ে ফেল না।'

'এবার পারব।

'হা হা হা। ডান হাতটা তুলে বাঁ হাতটা নাবো করে সিউনি জলে ভাসিয়ে জল তুলো, তারপর বাঁ হাতটা আগে তুলে ছুঁড়ে দাও।'

'এই ত।'

'ধ্যেৎ কোতায় বাঁ হাত নাবো হল ?'

'এই ত।

'ডান হাত আগে তুললে কেন ? জল পড়ে গেল সব। এই মিস্তিরি তুমি ?'

'মিস্ত্রি তো কী হয়েছে।'

'মালের হার্ডনেস দেখে তবে রেসবিট—'

'ওই জেনে রেখেচিস, কচু জানিস।'

'জলটা কত ভারি হবে তুমি না জেনে কম জোর দিচ্ছ।'

'আরো গায়ের জোর দোব ?'

'হ্যাঁ। তোমার জুটি ত হাঁফিয়ে যাবে। বাবু হয়েচ।'
'বাবু ?'
'হ্যাঁ শহরে থাক, কিংসাইজ সিগারেট খাও, চার্মস। সিনিমা দ্যাখো, ভিডিও দ্যাখো।'
'এই মার খাবি।'
'হা হা হা হা।'
'পারব পারব।'
'জলটা নাচিয়ে ফেলো।'
'হ্যাঁ, এই ত পারছি।'
'জল যে কম উঠছে।'
'আরো বেশি ?'
'হ্যাঁ এই টুকুনি করে জল উঠলে ধানগাছে কি জল যাবে ?'
'বল দিকি লেদে একজন মিস্ত্রি সারাদিনে ক'পিস স্পিনড্রিল কাটবে ?'
'ছটা।'
'দশটা।'
'তুমি ওই ত জানো।'
'মারব।'
'এত মাঠো হলে হয়!'
'কী ?'
'আরো তাড়াতাড়ি কর।'
'এই ত জল উঠছে।'
'তোলে।'
'এই ত।'
'নাচিয়ে তোলো'
'এই।'
'তোলো। হাঁফিয়ে গেলে ? হা হা হা।' ফড়িং এসে লুটোপুটি খায়।

ঘামে ভীমের শরীর জব জব করছে। ফড়িং হেসে লুটোয়। ভীম জানে ফড়িং তাকে ভালবেসে হাসছে। ফড়িং লাফিয়ে কাছে আসে। ভীমের কোমরে হাত দিয়ে ঠেলে। 'হাঁফিয়ে গেলে ?' জড়িয়ে ধরে কোমরটা। কোমরটা জড়িয়ে ভীমকে শূন্যে তুলে ধরবে যেন ফড়িং। ভীম আনন্দ পায়। ফড়িংকে ঠেলে দেয় ভীম। ফড়িং লাফিয়ে নিজের জায়গায় যায়।

ভীম খুঁটো ধরে আবার। 'নে।'
'আস্তে আস্তে হলে চলবে নি।'
'না।'
'কাদায় গেঁথে যাচ্ছে কেন ?'

'দাঁড়া দাঁড়া।'

'জলটা ভাল করে এমন তোলো।' চিৎকার করে ওঠে ফড়িং।

ভীম আবেগে বুক কাঁপিয়ে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হাসে। 'এই রকম ত ?'

'হ্যাঁ। থামলে চলবে নি।'

'অত হুটোপুটি করলে প্যারি ?'

'বেশ ত জল উঠছে।'

'থাম, জিরোই।'

'সিগারেট কিনতে পাঠাবে না ?' হো হো হাসে ফড়িং।

'হাঁপায় ভীম। দরদর ঘামছে। হাত দিয়ে কপাল মোছে।

'এবার নাও দিকি, কত রাত হল ঠিক আছে ? একি ও-টি করছ ?'

'ও-টি ?' হাসে ভীম। নেশায় পায় ভীমকে। সিউনির খুঁটো ধরে আবার। জল তোলে। নাচিয়ে জল ফেলতে থাকে ফড়িঙের সঙ্গে। আশ্চর্য ভীমের ঘুম পায় না। কোনো অবসাদ নেই। জল তুলছে। কিন্তু সে ত এন বি নিউমেটিকস্ পাওয়ার টুলস-এর হেডমিস্ত্রি ?

'দেখলে ত ঝোঁকে ঝোঁকে কত জল উঠে গেল ?'

'জল উঠল ?'

'বোকা !' ফড়িং খুঁটো ছেড়ে দেয়। আলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জমির ভেতর ঢুকে যায়। লুটোপুটি খেতে খেতে দেখছে গাছ কত জল পেল। এদিক থেকে ওদিকে ছুটতে ছুটতে দেখছে। খপ খপ পায়ে জলের শব্দ। ভীমও জমির মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেও দেখছে জল পেয়েছে কিনা। জলে কাদায় পা হড়কায়। গাছের পাতার সূক্ষ্ম করাতে পা শির শির করে। ধানের গাছে গাছে সে হাওয়া লুটিয়ে পড়ছে। ভীমও লুটোয়।

ভীম আলের ওপর বসে পড়ে। ফড়িং এসে পাশে দাঁড়ায়। ভীমের মনটা খুশি হয়ে উঠছে। ফড়িং তাকে ঘরের দিকে টানছে। কোনো কথা না বলে আল ধরে পেছু পেছু চলেছে ভীম। ডাঙায় ওঠে। কান্না কাতরকণ্ঠ। দুজনে থেমে যায়। বৌদি কিংবা অন্য কেউ সন্তান দিতে গিয়ে কাঁদছে। দুজনে সামনাসামনি চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। নদীর পাড় ভাঙার শব্দ হল। কালকে যেখানে পা রেখেছিল সেই মাটি ধসে গেল। গাছেরা এখন মাতাল হাওয়ায় দোলে। নতুন পাতায় ভরে ওঠার প্রতিশ্রুতিতে ভয়ানক পাতা খসানো খেলা করে।

নবান্নে এসো

মুজতবা আল্ মামুন

চৈত্র-ছপ্পর বাতাস।

তার মধ্যে উঠান নিকোয় এলোকেশী। গোবর জলে। ঝাঁটার পাছড়িতে মোলায়েম হয়ে নিকিয়ে আসে উঠান। পোষের সকাল। শীতের আল্‌সে মেজাজ ঘুরে ফিরছে চারপাশে।

দক্ষিণবঙ্গে কি দালানবাড়ি কি মাটির বাড়ি—সবেরই দাওয়াগুলো উঠান থেকে তিন চার হাত উঁচু। জলের ঝাপটা থেকে বাঁচার জন্যেই বুঝি। এলোকেশীর মেটে বাড়ি। তার উঁচু দাওয়ায় বসে ভুড়ুক ভুড়ুক খোল হুঁকো টানে শেতল ওরফে শীতল দাস। এলোকেশীর শ্বশুর। তিন কুড়ি বয়েস। চামড়ার তলায় জেগে ওঠা চওড়া হাঁড় বুঝিয়ে দেয় মানুষটা বেশ শক্তি-পোক্ত ছিল। শেষদিকের অনাহার অর্ধাহার খানিক তাকে কাবু করেছে মাত্র। তা সত্ত্বেও এখনও সমানে পাল্লা দিতে পারে সব ব্যাপারে। মনের জোর আছে।

বুড়ো মানুষ বলে ছেলেপুলেদের সাথে আবাদে যেত দেয় নি শাশুড়ী। মাসখানেক আগে দুই ছেলেই চলে গেছে দক্ষিণের আবাদে। বুড়ো শেতলের সে কী ছটপটানি। ছেলেদের সঙ্গে যাবে। শাশুড়ী যেতে দেয় নি। ধমকে উঠে বলেছে, এই বয়েসে ওসব ধকল সয়! দু-দুটো জোয়ান ব্যাটা গেছে। তোমার না গেলিও চলবে। শেতলের ছটপটানি তাতেও না কমলে, শাশুড়ী বলেছিল, হাঁপানিটা চেগেচে। তার ওপর জাড় ফাঁকা বাদায় পড়ে, থাকলি নিঘ্‌ঘাত নেমোনিয়ে, আচ্ছা বেশ, শেষকালে যেও। টঙে বসে হুঁকো টেনো আর ছেলেরগা হুকুম কোর।

আজ সেই 'শেষকাল'।

কুইন্ট্যাল বস্তা কেটে বানানো শীতের 'গরমপাটি'। তার ওপর তিন মাথা এক

করে বসে হুঁকো টেনে চলে শেতল। হুঁকো টানে আর রোদ পোহায়। পৌষ মাসের কাঁচ রোদ বড় মিঠে লাগে। বেশ মৌজ করে দা-কাটা তামাক সহযোগে উপভোগ করে শেতল।

গোবর জলে উঠান নিকোচ্ছে এলোকেশী। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা শুকিয়ে তকতকে হয়ে আসছে। বাষ্প উঠে মিশে যাচ্ছে বাতাসে। দুটো শালিক হলদে পা নাচিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে নিকোন দিকটায়। উঠানের একপাশে জোড়া উনন। তাতে এক-সঙ্গে দু কড়াই ধান সিদ্ধ হবে। আর পাশে রাশি করা নাড়া। 'নাড়া' হল ধান গাছের শুকনো গোড়া। জ্বালানি হয় ভালো।

রান্নাঘরের আলাদা উননে তাতারসি ফুটছে। সকালের তাজা বাতাসে সেই তাতা-রসির ম ম সুবাস। বুক ভরে যায় এলোকেশীর। সব মিলে আজ যেন বাড়িটাকে সত্যিই গেরস্ত বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। মনে পড়ে, তার মা-ও ধান-চালের মরশুমে রোজ সকালে উঠে এরকম উঠান নিকোত। ঘুঁটে দিত ঘরের দেয়ালে, গাছের গায়ে। জোড়া উননে কাদা লেপত। বাবা ঠাট্টা করে বলতো সাত তাড়াতাড়ি উঠন নিকোচ্চ যে, তোমার ধান কই! সে তো এখনো কাটাই হয় নি! এলোকেশীর মনে আছে, মা জবাব না দিয়ে হাসত। কি জবাব দেবে? জবাব হয় নাকি! ধান তো ধান নয়—সন্তান। সন্তান আসছে বাড়িতে। তার আবাহনের কাজ কি এক-আধ দিনের ব্যাপার? সেকথা কে বোঝাবে পুরুষ মানুষদের? বাড়ি পোয়াতি থাকলে, তাঁর কাঁথা-কাপড় সেলাই-ফোঁড় হয় দু-তিন মাস আগে থেকে। এও তো সে রকমই নাকি। সে সব দিনের কথা মনে পড়ে আর বুকটা ভরে ভরে ওঠে এলোকেশীর।

দেওরকে নিয়ে এলোকেশীর স্বামী গেছে দক্ষিণের আবাদে। সেখানেই আছে মাস-খানেক। ধান পাকলে একশো ভয়। চোরে কেটে নিয়ে যায়। গোবর কুড়ুনিরা শিষ ছিঁড়ে নিয়ে যায়। গরু-ছাগলে চিবোয়। তার ওপর আছে ধান কাটা, বাঁধা, ঝাড়া, বস্তা বোঝাই করা। এরপর ধান আর খড় বয়ে নিয়ে আসা। সব মিলিয়ে মাস খানেকের ধাক্কা। সেখানে একটা অস্থায়ী সংসার পাতা আর কি!

এলোকেশী উঠান নিকোয় মন দিয়ে। দীর্ঘদিনের অনভ্যাস। তা হলেও জাত চাষার মেয়ে তো! শ্বশুর বাড়ি এসে অবধি তৃপ্তি করে উঠান নিকোতে পারেনি। ভাগচাষী শ্বশুর। এ যেন পরের ছেলে পোষার মত। একটা আশঙ্কা বুকে চেপে থাকত। তীক্ষ্ণ কাঁটার মত কলজেতে খচ্‌খচ্‌ করতো। কি জানি ভাগের ভাগটা পাবে তো? ধান উঠানে এসে পড়বে তো?

প্রায় বছরই উঠত না। চৌধুরীবাবুরা মাঝ পথে গরুরগাড়ির মুখ ঘুরিয়ে কাছারি মুখো করতেন। অবশ্য সেখানে বস্তা দুয়েক মোটা ধান নামিয়ে বলতেন, নিয়ে যা। বাকি ধান গচ্ছিত রইল। সুখে-দুঃখে তো দেখতে হবে তোদের।

কালো মুখে দু বস্তা ধান নিয়ে বাড়িতে ঢুকলে, শাশুড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। শ্বশুর বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসে উদাস দৃষ্টিটাকে পাঠিয়ে দিত দূর আকাশে।

বোধ হয় সাক্ষী মানত কাউকে। আর এলোকেশীর স্বামী অঘোর, শুকনো মুখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। বউয়ের কাছে মুখ দেখানর লজ্জা এড়াতে চাইত। সারা বছর গাধার মত খেটে ধান ফলিয়ে, তা যদি বাড়ি না আনতে পারল তা হলে কিসের চাষা সে!

বাড়ির পাঁচজন মানুষ, সোহাগী তখনও জন্মায় নি, পরস্পর পরস্পরকে মুখ দেখাতে যেন লজ্জা পেত। লজ্জা বা সংকোচটা যে কিসের, তা তারা ঠিক জানত না। শুধু অনুভব করত। সে সব দেখে নতুন বউ এলোকেশীর দুঃখের মধ্যেও হাসি পেত। ওদিকে নিকোন উঠানে পুণরায় কেঁচো মাটি তুলত।

এ বছরই বর্গায় প্রথম জমি পেয়েছে শেতল। যে জমি চষতো, তারেই কিছুটা। চৌধুরীবাবুরা খুব একটা রা কাড়ে নি। সরকারী নিয়ম বলে কথা। শেতলের পাওনা হত অনেক। চৌধুরীবাবুরা বলেছিল, শেতল, বুঝিস তো সব। আমাদেরও জাহাজ জাহাজ সংসার। ভরসা এই জমি। বেশি দাবী করিস নি। বিঘে খানেক নে।

নিজেদের জমি। তাই বড় উৎসাহ এলোকেশীর। বালতি ভর্তি গোবরজল নিয়ে বসেছে। ছৈ-ছপ্পর বাতাসে ওড়া রুক্ষ চুল ঝাপটে যায় তার বিনবিনে ঘামে ভেজা গালে। হাঁফিয়ে ওঠে সে। উঠানটাতো কম বড় নয়। তবুও কষ্টটা কষ্ট মনে হয় না তার। এবারের কিছু ধান তার উঠানে আসবেই। যা একেবারে নিজেদের। তাই কষ্টটা আশ্চর্য এক সুখে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কষ্টটা আনকোরা স্বামীর আনাড়ি আদর হয়ে ওঠে।

বিয়ের পর থেকে শুধু কষ্ট আর কষ্ট। এলোকেশীর মনে হত, জগতটা বুঝি দুঃখের। রক্ত ঢেলে ফসল ফলালেও, সেই সারা বছর চৌধুরীবাবুদের কৃপা ভিক্ষা। কোন কাজেই তাই উৎসাহ পেত না কেউ।

চৌধুরীবাবু। এলাকার জমিদার। বেনামে লুকিয়ে রাখা কয়েকশ বিঘে জমির মালিক। ফিনফিনে আর্দির পাঞ্জাবী পরে, জুতো মসমসিয়ে শেতলের কাছে এসেছেন, হেসেছেন। স্বামী অঘোর ডাব কেটে মুখের কাছে ধরেছে। এলোকেশী পান সেজে এনে দাঁড়িয়েছে। তার শ্বশুর শেতল সেই যে গলায় গামছা জড়িয়ে, হাত জোড় করে দাঁড়াত, তা আর খুলত না। লাগাতার আজ্ঞে আজ্ঞে করে চোয়াল ব্যথা, তবুও চুপ করতো না ক্ষণেকের জন্যেও। মাঝে মাঝে অবশ্য ধানের গাড়ি শেতলের উঠান পর্যন্ত আসত। চৌধুরীবাবুরা দু বস্তা মোটা ধান নামিয়ে দিয়ে হাসতেন। বলতেন, যা দিয়ে গেলুম, ফেলে-ছড়িয়েও খেয়ে শেষ করতে পারবি নে রে শেতল।

শেতল বলতো, তা ঠিক আজ্ঞে।

শেতলের সংসারে তখন একবেলা ওবেলা পাঁচটা-পাঁচটা দশটা পাত পড়তো। তবুও আজ্ঞে বলতে হত। নইলে বর্গা দেবেন না।

এলোকেশীর এক মেয়ে। নাম রেখেছে সোহাগী। ছ'বছরে পড়েছে। সে এসে এলোকেশীর হাতের কাছে দাঁড়ায়।

সর গায় গোবর লাগবে।

সোহাগী নাকে কাঁদে, খিদে নেগেচে।

রান্নাঘরে কোটোয় মুড়ি আচে। মুটোখানেক বার করে নে গে।

সোহাগী চলে যায়। এই সোহাগী তখন ছোট। গাঁ-গেরামে কে আর কোলের ছেলেপুলেকে কোলে-কাঁখে করে রাখে? মাটির সন্তান, মাটিতেই এড়িয়ে-গাঁড়িয়ে তারা বড় হয়। নাকে সাঁদ গড়ায়। মুখে হাতে কাদা মাটি। কিছু পেলে আঁকড়ে ধরে। দাঁড়াবার চেষ্টা করে। একবার চৌধুরীবাবু এই উঠানে মোড়ায় বসে আছেন। চোখ এড়িয়ে সোহাগী কখন মোড়ার কাছে চলে এসেছে। তারপর যা হয়। চৌধুরীবাবুর হাঁটু জাপটে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। পা ছট্‌কে হাত দুয়েক দূরে সোহাগীকে ছিটকে ফেলে দিয়েছিলেন চৌধুরীবাবু। সিঁটকে উঠে বলেছিলেন, ভাবলুম বুঝি কেন্নো বাইছে। আহারে তোর মেয়ে বুঝি! তা কেন্নোর সাথে তফাৎ রেখেছিস কই! বড় লেগেছে বুঝি রে। নে, মিঠাই কিনে দিস, বলে পকেট থেকে একটা সিকি বার করে-ছিলেন চৌধুরীবাবু।

চার আনায় যে মিঠাই হয় না, একথাটা সেদিন মুখের ওপর বলতে পারে নি এলোকেশী। তিনি যে অন্নদাতা। লাথি মারতেই পারেন।

সেই মেয়ে সোহাগী এখন ফ্রক পরে গাঁয়ের স্কুলে যায়। বগলে স্লেট-বই। লম্বা চুল বেয়ে ছাঁচ তেল গড়ায়। মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করতে, ফ্রক কিনতে এলোকেশীর শেষ সম্বল রূপোর নাকছাবিটা বেচতে হয়েছে। তার জন্যে খুব একটা দুঃখ নেই। মেয়েটা দুপাতা পড়তে শিখলেই সে দুঃখ চাপা পড়ে যাবে। চঞ্চলা লক্ষ্মীকে সোমবচ্ছর বেঁধে রাখাটা কি চাট্টিখানি ব্যাপার! প্রত্যেক লক্ষ্মীবারে গলায় আঁচল জড়িয়ে পূজো দেওয়া আর পাঁচালী পড়া না হলে মা রাগ করতে পারেন। তাই সোহাগীকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে এলোকেশীর এত ব্যকুলতা। পাশের বাড়ির দেমাকি মেয়েছেলেটাকে পাঁচালী পড়ার জন্যে হাতে-পায় ধরতে হবে না আর। তাও যদি গড়গড় করে পড়তে পারত!

উঠান নিকোয় এলোকেশী। আর ভাবে—উঠানের একপাশে ইঁটের গায়ে কাদা ধরিয়ে তুলসি মঞ্চ বানাবে। তার পাশে বসাবে পাঁচালীর আসর। সোহাগী পড়বে। লক্ষ্মী অচলা হবেন। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব থাকবে না। নিজের গায়েও দু-এক ছিটে রূপো, বরাতে থাকলে সোনাও উঠতে পারে।

দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছে শেতল। বেলা যেন হৈ হৈ করে বাড়ছে। শেতল নড়ে-চড়ে। বলে, 'বউ, বুড়িটা গেল কমনে বলদিনি? যাবার যোগাড়-যন্তরটা করে দেবে তো!'

মেজাজ ভাল থাকলে শেতল প্রৌঢ়া স্ত্রীকে 'বুড়ি' বলেই ডাকে। ভালবাসার ডাক।

এলোকেশী নিকোতে নিকোতে জবাব দেয়, 'মা বার দ্যালে ঘুঁটে দিচ্চে।'

গুড় বানাতে চাই রাবণের চিতা। নেভালে-জ্বালালে চলবে না। একটানা উনুন জ্বলবে। নইলে গুড়ের গুণ খারাপ হয়ে যাবে। ধান সিদ্ধও করতে হবে। তার জন্যেও

প্রচুর জ্বালানী দরকার। শেতলের গোটা চারেক মেয়ে-খেজুর গাছ আছে। নাড়া আর তার বাগালি মিলেও কম পড়বে। তাই শাশুড়ী ঘরের পিছন দিকের দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। যে সে ঘুঁটে নয়। একেবারে হাতীর কানের মত। একটা উননে ফেলে চাই কি চান সেরে এসো। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে বোস। কাপড়-চোপড়ও কাচতে যেতে পারো। উনন ঠিক জ্বলবে। চিতার মত।

'বুড়িটারে ডেকে দে দিনি। রোদির তাপ বাড়লি হাঁটতি পারব না।'

জাড়কালের বেলার এই এক জ্বালা—শুধু পালাই পালাই। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে আসে যেন।

এলোকেশী শাশুড়ীকে ডেকে দিয়ে টোল খাওয়া গালে ঝাপটে যাওয়া চুলগুলোকে সরিয়ে আবার গোবর-জল নিয়ে বসে। এতবড় উঠান। শেষ হতে চায় না! কষ্টের কাজ। তবে সেসব মালুম হয় না এলোকেশীর। বাড়ির সবার মনে একটা ঘোর লেগেছে। এলোকেশী সেই ঘোরেই কষ্টটাকে ভাসিয়ে দেয়। সন্তান ধারণে কষ্ট আছে, তা বলে কি কেউ মা হয় না?

'জানিস বউ—' শেতল হুঁকো থামায়।

এলোকেশী সাময়িকভাবে হাত থামায়। অর্থাৎ বল কি বলবে।

'খোকার মাও তোর মতন এরকম অঘ্যান মাস থেকে উঠন নিকোত। ঘুঁটে দিত। কিন্তু ধান আর বাড়ি আসতো না। তা ফি বচরই পেরায় এরকম হত। আর ফি বছর খালি হাতে বাড়ি ফিরলি খোকার মা'র সে কি কান্না', বলে শেতল হি হি করে হাসে। হাসলে শেতলের পাকা এবং ঝুলে পড়া ভ্রু চোখ দুটোকে ঢেকে দেয়। শেতলের হাসি দেখে মনে হয়, সদ্য শেষ করা কথাটার থেকে বড় রসিকতা আর হয় না বুঝি। এলোকেশী হাসে না।

শেতল আবারো বলে, 'বোজালিও বুড়ি বুজ্‌ত না। বলত, তোমার গতর ভেঙে গে যারা খায় তারগা মুকি নাতি মারি। হে হে, বড় রেগে যেত কিনা! তা রাতে আবার বুইজে-সুইজে আদর—' শেতল হঠাৎ বলা থামিয়ে দেয়। ঘন ঘন হুঁকোতে টান দেয়।

শেষ দিকের কথায় মজা পাচ্ছিল এলোকেশী। হঠাৎ থেমে যাওয়ায় সে শ্বশুরের দিকে তাকাল। শেতল একমনে খড়ের চাল দেখছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে। হেসে ফেলে এলোকেশী। এবং শ্বশুরের অপ্রস্তুত ভাবটা আরো একবার আড়চোখে দেখে নেয়। শেতলের অপ্রস্তুত হবারই কথা। রাতে কোন আদরে বুড়িকে ঠাণ্ডা করত, তা কি সবার কাছে বলা যায়! বিশেষ করে পুতবউয়ের কাছে!

এলোকেশীর কালো মুখে পাকা তোতামুখির রঙ ধরে। অবশ্য রঙ ধরার আরও একটা কারণ আছে। দুদিন আগে স্বামী অঘোর এসেছিল খোরাকি নিতে আর খবরটা দিতে, যে দুদিনের মধ্যে বাঁধা ছাঁদা শেষ হবে। একরাত ছিল। সে রাতে এলোকেশী নিজে ঘুমায় নি, অঘোরকেও ঘুমাতে দেয় নি।

অঘোরকে বিছানায় পেড়ে ফেলে বলেছিল, 'হ্যাঁ গা, তা ধান কতটা হবে বলে মনেহয়?'

'তা বস্তা আট-নয়েক তো হবেই।'

'ওমা বস্তা নয়েক। সব আমাদের ?'

'তা নয় তো কি চৌধুরীবাবুরগা।'

মাতোয়ারা এলোকেশী কি একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। সে সুযোগ পেল না। অঘোরের ঠোঁট তার ঠোঁটজোড়াকে বেঁধে ফেলেছে। সেই সঙ্গে শক্ত দুহাতে শরীরটাকেও। এলোকেশী ছদ্ম-রাগে ছিটকে যেতে চায়। পারে না। অঘোরের ঠোঁটে পোড়া বিড়ির গন্ধ। অন্য সময় হলে এলোকেশী তাকে মুখ ঘুইয়ে ছাড়ত। আজ উচ্চবাচ্য করল না। বিড়ির গন্ধ যেন তার নাকে নতুন চালের গন্ধ হয়ে ঝাপটা মারে। এলোকেশীর খুব মরে যেতে ইচ্ছা করল। অঘোরের বুকের ওপর মুখ রেখে। কিন্তু তার যে আরো কিছু জানবার রয়েছে! তাই অন্যপথ ধরল এলোকেশী। নিজের মুক্ত দুহাতে মুঠো পাকিয়ে বিছানায় দুম দুম কিল বসাতে শুরু করল। পাশের ঘরে বাপ-মা রয়েছে। তাদের কানে বিছানা দাপানোর শব্দ যাওয়াটা কাজের কথা নয়। অবাক মেনে বাঁধন আল্গা করে দেয় অঘোর। এলোকেশী ছিটকে সরে যায়। হাসে। অঘোরের নাক টিপে দেয়। বলে, 'তা ছমাসের খোরাকি হয়ে যাবে কি বল ?'

অঘোর জবাব দেয় না।

'কি হল ?' এলোকেশী একটু এগিয়ে এসে আড় হয়। এমন সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল অঘোর। প্রথমে এলোকেশীর হাত দুটো মুড়ে বুকের ওপর রাখে, তারপর বাকি শরীরটা শরীরের ওপর তুলে নেয়। পাকা শিকারীর মত জড়ায় তাকে। সাপ যেমন সাপিনীকে জড়ায়। এলোকেশীকে টু শব্দ করার উপায় রাখে নি। এলোকেশী তো মরার বিপক্ষে নয়। তাই ক্রমশ পৌরুষের প্রচণ্ডদাহে মৃত্যু বরণ করে।

অনেক রাতে আবার পাশাপাশি। গলাগলি।

এলোকেশী বলল, 'ডাকাত।'

'আমি ? আরে দেকেচিস কি! ধান কটা ভালোয় ভালোয় ঘরে তুলি, তখন মনে আরো ফূর্তি—'

'থাক। আর ফূর্তিতে কাজ নি।'

'আহা, বুজচিস নি, নিজির জমি না থাকলি কি মনে সুক থাকে ? আগে খাটতি মন চাইতো না। আর একন! গাদার মতন খেটেও সুক।'

শুয়ে শুয়েই এলোকেশী কপালে জোড় হাত ঠেকায়। বলে, 'পেন্নাম সরকারের। তারা আইন করে না দিলি—।' অঘোরের একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রাখে এলোকেশী। বলে, 'নাকছাবিটা বিক্রি করতি হল। ওটা আবার কিনে দিতি হবে। সাতে সাতে একজোড়া দুল।

অঘোরের হাতটা অবাধ্য হতে যাচ্ছিল। খপ্ করে সে হাতটা তুলে নিয়ে এলোকেশী ধমকে ওঠে, 'বলি কানে কিছু ঢুকলো ?'

অঘোর হাসে। বলে, 'রূপো কেন, সোনায় মুড়ে দোব। আর এট্টু সবুর কর। এ-

বচর তো পয়লা ধান ওটবে। তাই শুধু নাকছাবিটা হয়তো দিতি পারবো। পরের বারে সোনায় মুড়ে দোব সকী—'

···হাত থেমে গিয়েছিল এলোকেশীর। নেতাটা বালতিতে ডুবিয়ে আবার নিকোতে শুরু করে। আর একটুখানিই বাকি।

শেতল হুঁকোটা নামিয়ে রাখে। তামাক ছাই হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শাশুড়ী গোবর হাত ধুয়ে বাড়িতে ঢোকে।

শেতল আড়মোড়া ভাঙে, 'মা মা করে ধান কটা বাড়ি এনে ফেলাতি পারলি তবেই শান্তি।'

শাশুড়ী বলে, 'বালাই ষাট। আমার দুমুঠো আর কে নেবে।'

'চোর-ডাকাতে কি তা বোজে!'

'যারা চুরি করে তারা তো আমাদের মতনই গরীব। গরীবির জিনিসে তারা হাত দেবে না। কাগ কি কাগের মাংস খায়!'

বুড়ি গামছা ছিঁড়ে-গুড় বেঁধে দেয় পথের খোরাকি। এলোকেশীর উঠান নিকোনও শেষ হয়েছে। সে এসে খোরাকি, কাঁথা কম্বল, দেশলাই, টর্চবাতি, হুঁকোর সরঞ্জাম গুছিয়ে দেয়।

দাওয়ায় বসে আপন মনে হাসে শেতল। টেয়ো-টাবলা গাল থেকে চোখ দুটো হারিয়ে যায়। শুধু মাথার গাছি কয়েক পাকা চুল ছড় ছড় বাতাসে ওড়ে। একটা ভিন্ন সুখ বুড়ো শেতলকে প্লাবিত করছে তা বেশ বোঝা যায়। শেতল বলে, 'নবান্ন হবে তো?'

'তা হবে না!' বুড়ি জবাব দেয়।

'এবার নবান্নে দুই মেয়ে-জামাইরি বললি কি হয়! তার গা তো এনে আদর-যত্ন করতি পারি নি কখনো। কাপড়-চোপড়ও দিতি পারি নি।'

'খুব ভাল হয়। সেই সাতে আমার ভাইটারেও বলব। একটা মাত্তর ভাই। তারে কুটুম বলে তো আলাদা করে কখনো দেকাতি পারি নি। এবার যকন ভগমান মুক তুলে চেয়েচে—।'

'সব হবে, সব হবে।' শেতল উঠে দাঁড়ায়। এতদিন পরে সে তার কর্তাগিরি ফিরে পেয়েছে। বলে, 'সব হবে। তা বৌ, তোর বাপ-ভাই কেন বাদ যাবে। যাবার পতে তো পড়বে। তাদেরও বলি, কি বলিস?'

এলোকেশী জবাব দেয় না। শুধু মাথা নাড়ে।

শেতল নাক, কান ও নাভির গর্তে তেল বুলোয়। স্নান সেরে, একমুঠো খেয়ে বেরিয়ে পড়বে। ধান বয়ে বাড়ি আনার কাজে বাড়ির কর্তা থাকবে না তা কি হয়। স্নানে যাবার আগে বোঁচকাটা তুলে পরখ করে নেয় শেতল। বইতে পারবে তো। না, ঠিকই আছে। পাকানো শরীর। এখনো চওড়া হাড়ে হাতুড়ি মারলে, ছিটকে আসে হাতুড়ি।

স্নান সেরে খেতে বসে শেতল। হাউ হাউ গরম ভাত। ডাল আর নটেশাক ভাজা।

এলোকেশীর বুকের ভিতর তখন অন্য ঢেউ। তার খুব ইচ্ছে করছে, তার সুখের

সংসারটা বাপ-ভাইরা এসে দেখে যাক। এতদিন তো দুঃখের সংসারটাই দেখেছে। বাপটা কবে মরে, তার আগে দেখে যাক—তার এলোকেশী পুরোদস্তুর এক গেরস্তবাড়ির বউ।

সারা বাড়িময় এক সুখ সুখ বাতাস। জোড়খাওয়া পায়রার মত খুশিতে কাঁপছে। তাতারসির সুবাসও তার সাথে মিশেছে।

বুড়ি কুচো সুপুরি দিয়ে পান সেজে আনে। শেতল পানটা নিয়ে মুখে দেয়। তারপর বোঁচকাটা পিঠে তুলে নেয়। বলে, 'সাবধানে থাকিস সব।'

বুড়ি বলে, 'তুমিও সাবধানে থেকো। ঠ্যাণ্ডা নাগে না যেন।'

হাঁটা শুরু করে শেতল। আর দেরি করলে বেলাবেলি পৌঁছানো যাবে না। শাশুড়ী এবং এলোকেশী গলায় কাপড় জড়িয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'দুগ্‌গা দুগ্‌গা—'

হাঁটা পথ। কখনো বা ধানক্ষেত চিরে সরু পায়ে চলার পথ। যাদের অনেক জমি তারা অবশ্য রাস্তা ধরে হুসহাস ম্যাটাডোর হাঁকাচ্ছে আজকাল। চৌধুরীবাবুরাও ম্যাটাডোর কিনেছে। কিন্তু তাতে শেতলের কি! বাবুরা তো ঘ্যাচ করে পাশে গাড়ি থামিয়ে বলবে না, 'সারাজীবন তো হেটেই মরলি। এবার পা-দুটোর জিরেন দে শেতল। আয়, উঠে আয়।' পা চালায় শেতল।

ধান কেটে নেওয়া জমিতে ছাড়া গরুর দল। পাক্কা চার-পাঁচ মাস পর তাদের গলার দড়ি সরেছে! সেই আনন্দে কেউ কেউ লেজ তুলে খানিক দৌড়ে নিচ্ছে অকারণে। দৃষ্টিটা আরো দূরে পাঠাতে গিয়ে বাধা পায় শেতল। দৃষ্টি এরপর পাকা ভ্রূতে ধাক্কা খায়।

সাইকেল চালিয়ে আসছিল নিজামুদ্দিন। শেতলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তার সারা মুখে উত্তেজনা। বলল, 'খুড়ো শুনেছ, ফুলতলির মাঠে কাল রাতে ধান লুঠ হয়েছে।'

'লুট!' কেঁপে ওঠে শেতল, 'তা কারা লুট করলে?'

'জমিদার ঘোষবাবুরা।'

শেতলের গলা কাঁপে, 'ঘোষবাবুরা!'

'হ্যাঁ গো, তারা লোকজন নে এয়েছেল। সব বর্গাচাষীর ধান ম্যাটাডোরে তুলে নে গেছে। বলেছে নাকি, সরকার পাট্টা দেচে! ঘরে ধান তো তুলে দে যাবে না।'

ফুলতলি থেকে দক্ষিণের আবাদ বেশি দূরে নয়। আবার হাঁটে শেতল। রাস্তার পাশের বাবলা গাছে চড়ুই পাখিদের জটলা। কাদের বাড়ি তাতারসি ফুটছে—তার গা-মেটানো ভারি বাতাস খেলা করছে চারপাশটায়।

কুমিরমারির সনাতনের মুদি দোকান। তার বাঁশের মাচায় এসে বসে পড়ে শেতল। এক সাথে এত হাঁটা। হাঁফিয়ে উঠেছে। দোকানে অন্য সময়ের মত ভিড় নেই। শেতল হাঁকে, 'ও সনাতন, বড় ফাঁকা সব যে—!'

সনাতন দোকান থেকেই জবাব দেয়, 'আর কেন! পাড়াজুড়ে কান্নাকাটি। মুকুজ্জেদের জমি বর্গা পেয়েছেল যারা, তাদের মাতায় হাত। কাল রাতে সে-সব জমির ধান জোর

করে তুলে নে গেল মুকুজ্জেবাবুরা। বলে গেছে, 'কোমরের জোর থাকলি ধান ফিরিয়ে আনিস।'

শেতলের শরীর ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। তবুও জিজ্ঞেস করে, 'দক্ষিণের আবাদের খবর কিছু জানো?'

সনাতন বলে, 'ও খবরটা একনো পাই নি।

শেতল কাঁধে পুটুলি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বুড়ি পাট্টাটা ঠিক রেখেছে তো। ওটাই শেষ হাতিয়ার।

পরক্ষণে নিজেকেই ধমকায় শেতল। মাথা নড়ে নিজে নিজেই. না না, চৌধুরীবাবুরা এরকমটা করতি পারবে না। এই তো সেদিন হাটের পথে চৌধুরীবাবুর সঙ্গে দেখা। হেসে জানতে চাইলেন, 'ধান কেমন হয়েছে রে শেতল?'

'আজ্ঞে, তা আপনাদের আশীবাদে—'

থামিয়ে দিয়ে চৌধুরীবাবু বলেছিলেন, 'আমাদের নয়, বল সরকার বাহাদুরের আশীর্বাদে।'

কথাটার মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত ছিল? শেতল আর একবার সেদিনের স্মৃতিটাকে মন থেকে তুলে এনে মিলিয়ে নেয়। না না ভাবাই যায় না। কেননা, তারপরই চৌধুরীবাবু বলেছিলেন, 'জমিটা বেহাত করিস নে রে শেতল। বেচে খেয়ে ফেলিস নে।'

হিসেব গুলিয়ে যায় শেতলের। মাথার মধ্যে হাজারো ঝিঁ ঝিঁ পোকার কিলিবিলি। কপালের তামাটে চামড়ায় সেই পুরানো ভাঁজ। যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা।

সব জমিদারই যে স্বার্থের বেলা এক।

দক্ষিণের আবাদ যদি লুঠ হয়ে থাকে তবে বুড়িটা আবার ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদবে। আর পুতবউ এলোকেশী! তার মিহিন করে নিকোন উঠান, পাঁচালি গানের আসর আর পায়েসের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। আর তার নিজের নিশ্চিত একমুঠো ভাতের কামনা।

শেতলের চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করে।

মাঝে মাঝে শেতল ভাবে, ভগবানের সুন্দর গেরস্থালিতে এত জটিলতা কেন? এত হিংসা কেন? অনেকদিন ধরেই প্রশ্নগুলো তার বুকের মধ্যে ঘাই মারে। কিন্তু জবাব দেবে কে?

আপাতত পা দুটোকে শক্ত রেখে শেতল হেঁটে চলে দক্ষিণের আবাদের দিকে।

পিতৃত্ব

উদয় চক্রবর্তী

সূচনাসার ঃ রুগ্নসকাল

সকালটার বয়স বাড়ছে।

সকালটা সবুজাভ, স্বাস্থ্যবান হতে পারত কিন্তু কেমন যেন ফিকে আর রুগ্ন হয়ে গেল। নিত্যকার মত একরাশ পাখির ডাকে ঘুম ভেঙেছিল শেখ পরিবারের। অথচ তের বছরের একটা একরত্তি ছেলের চঞ্চল ছোঁয়ায় সকালটা রুগ্ন হয়ে গেল। গড়ানে সকাল, এক সময়—

বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়েই চনমনে চোখে একবার চারিদিক দেখে নিল সামাদ। তারপর লম্বা দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে আবারও একবার ত্রস্ত তাকাল পিছন ফিরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আব্দুল সামাদের তের বছরের ছোট্ট শরীরটা হারিয়ে গেল শহরের বাঁকা গলিপথের মোড়ে।

এমন প্রায়ই দেখা যায়। ওর ছোটার গতিই এমন। মনে হয় কিছু চুরি করে পালাচ্ছে। তবে ওর আজকের এই ছোটার ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব মেশানো আছে।

বারান্দার একধারে বসে একটা বিদেশী পিক্‌টোরিয়ালের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন শেখ সওকত আলি, আব্দুল সামাদের আব্বাজান। সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যপ্রান্ত লক্ষ্য করলেন তিনি। আর তখনই একটা সন্দেহমাখা ভয় উঁকি মারল তাঁর মনের আকাশে। ভ্রূকুঞ্চিত করে, হাত উঁচিয়ে, গম্ভীর গলায় তিনি ডাক দিলেন—'আবুল।' সংসারের প্রতি সহকত সাহেবের গভীর মমতা। ওকালতির মোটা ফ্রেমের চশমার ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তিনি সংসার শাসন করেন।

বাড়ির কাজের ছেলে আবুল পাশে এসে দাঁড়াল। চোখে মুখে আতঙ্কিত ভয়।

বাবুকে সে বড় ভয় করে। ঘাড়টা ঈষদ বাঁকিয়ে অথচ দৃষ্টিকে এতটুকু না সরিয়েই. কড়া গলায় সওকত সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—'সামু কোথায় গেল?' তাঁর চোখে মুখে বিরক্তি, আবুল মাথাটা আর একটু নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। নিরুত্তর নির্বিকার ভাব। সওকত আলি দুঁদে উকিল। সদর কোর্টে তাঁর জমানো পসার। আসামীদের জেরা করে করে তাঁর একটা বদ অভ্যাস তৈরী হয়েছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকাটা একেবারেই পছন্দ হয় না তাঁর। সরোষে চিৎকার করে উঠলেন তিনি—'কি হল?' ভয়ে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে মিনমিনে গলায় আবুল সত্যি কথাটাই বলে ফেলল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন সওকত আলি। এ তাঁর স্বপ্ন কল্পনার বাইরে। সম্বিত ফিরে পেতে একটু দেরী হল। পাশ ফিরে দেখলেন, আবুল ভাগলবা। সোফার উপর জোড়াসনে চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একপাশে পিকটোরিয়ালটা বোবা দৃষ্টি মেলে পড়ে রইল তেমনই। ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে একসময় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন শোবার ঘরের দিকে। মন্থর গলায় ডাকলেন—'সাকিনা বেগম।' স্ত্রীকে সওকত সাহেব সাকিনা বেগম বলে ডাকেন। হঠাৎ-ই তাঁর মনে পড়ল বেগম ঝিকে নিয়ে বাজারে গেছেন। শেখ পরিবারের বউ বাজারে যাবে এটা তাঁর স্বমতের পরিপন্থি। তবুও কেমন করে যেন তাঁর মত-বিরোধী এই নিয়মটা সংসারে জায়গা করে নিয়েছে। সময় মত এক আধদিন সাকিনা বিবি বাজারে বের হন। ভীষণ একা একা বোধ হতে লাগল সওকত আলির। বিষাদ ক্লিষ্ট মনে তিনি বিছানার উপর শুয়ে পড়েলেন।

শান্ত সকাল, স্তব্ধ গ্রীষ্মের দুপুরের মত অনন্ত নীরবতা। নরম বিছানায় গা এলিয়ে উত্তেজনাময় চোখে ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সওকত আলি। পুষ্পিত বৃক্ষের মত তাঁর সাজানো সংসার। টিভি, রেফ্রিজারেটার, গাড়ি···। সমুদ্রের মত ব্যপ্ত হয়ে উড়ছে সেখ পরিবারের সম্ভ্রমের পতাকা।

দরজায় খুট্ করে শব্দ হল। বিছানায় উঠে বসলেন সওকত আলি। ফিরে এসেছেন সাকিনা বিবি। তবুও শ্যাওলা পড়া পাথরের মত নিশ্চুপে বসে রইলেন তিনি।

স্বামীকে এমতাবস্থায় আগেও দেখেছেন সাকিনা বিবি। তাঁর একটু ভয় হল। হাতে ধরা প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো নামিয়ে রেখে তিনি এগিয়ে এলেন বিছানার প্রান্তে। সস্নেহে স্বামীর মাথায় হাত রেখে প্রশ্ন করলেন—'কি হল সাহেব? এত নীরব কেন?' শেখ সাহেব এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না।

রুগ্ন সকালটা বৃদ্ধ হল।

আত্মভবন: প্রত্যয়দীপ্ত দুপুর

দুপুরটা ক্রমশ পরিণতির দিকে।

এসময় একটু বিছানায় গড়িয়ে নেওয়া বরাবরের অভ্যাস সওকত আলির। সময়া-

ভাবে আজকাল প্রায়ই তা হয় না। আজ সময় হয়েছে। কিন্তু দু-চোখের পাতাকে এক করতে পারছেন না তিনি। সারা সকালটা একাকার হয়ে তাঁকে পিষ্ট করছে। তিনি পূর্ণায়ত ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন।

মনের দর্পণে ফুটে উঠল গোটা শেখ পরিবারের ছবি। আজকের আর আগেকার। কোথায় যেন ফাটল ধরেছে তাঁর শাসনে। শিথিল হয়ে পড়েছে শেখ পরিবারের ঐতিহ্যের বাঁধন। বেগমকে তিনি খুলে বললেন সব কিছু। 'ওহ! এই ব্যাপার, তা এতে অপরাধটা হয়েছে কি?' বিস্ময়াভিভূত সওকত আলি স্ত্রীর এই কথায় চমকে উঠলেন। উত্তেজনায় তড়াক করে খাট থেকে নেমে বললেন—'কি বলছ বেগম! অপরাধ নয়? শেখ পরিবারের ছেলে পয়সা চুরি করে লটারির টিকিট কিনবে? কেন, ও খেতে পায় না, না পরতে পায় না?' তাঁর চোখ মুখ উত্তেজনায় লাল, থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর, সাকিনা বিবি বললেন,—'তুমি ব্যাপারটাকে এত বড় করে নিচ্ছ কেন? বাচ্ছা ছেলে, শুধু কৌতূহলে পড়েই এ কাজ করেছে। তাছাড়া ওর স্বভাবই এমন নয়। আবুলের সাথে সলা-পরামর্শ করেই হয়ত এ কাজ করেছে।'

আবুল সামাদের থেকে বছর কয়েকের বড। বাস্তবিকই এ পরামর্শ আবুলের। কিন্তু সওকত সাহেব ছাড়ার পাত্র নন। নামী উকিল তিনি। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, সমস্ত ব্যাপারটাকে তাঁর মানহানীর মামলা বলে মনে হল। স্ত্রীকে জেরা করার ভঙ্গিতে বললেন—'অপরাধ শুধু একটা নয়। লটারীর টিকিট তো কেটেইছে, তা আবার চুরি করে।' এই বলে তিনি দেওয়ালের র‍্যাকে টাঙানো কোর্টের পকেট হাতড়ে ফাঁকা হাতটা বিরক্তিভরে স্ত্রীর মুখের সামনে আলগা করলেন, 'দেখ পয়সাগুলো নেই।' স্বামীর ব্যাপার স্যাপার দেখে সাকিনা বিবি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই তিনি টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। দূর থেকে হালকা গলায় স্বামীর উদ্দেশ্যে বললেন—'তুমি একটু স্থির হয়ে বস তো বাপু, সামুকে আমি দেখব।'

স্ত্রীর এই উদাসীনতায় সওকত সাহেব মনে মনে বিরক্ত হলেন। হনহন করে অকারণেই নীচে নেমে গেলেন তিনি ক্ষুণ্ণ মনে। মনের মধ্যে বিপ্লব চলছে তাঁর। স্ত্রীকে অনেক শোধরাবার চেষ্টা করেছেন। আর ভালো লাগে না। ছেলের জন্য জমা রাগটা গলে অভিমান হচ্ছে মনের কড়াইয়ে। দু-চোখ তল্লাস করছে সামাদকে, পায়চারি করতে করতে তিনি বাগানে পৌঁছে গেলেন আনমনে।

আজ ছুটির দিন। গৃহসংলগ্ন বাগানের একটা গুলমোহর ঝোপের আড়ালে সওকত সাহেব আবিষ্কার করলেন ক্রীড়ারত সামাদকে। মনের আনন্দে খেলা করছিল সে। মানহানী মামলার আসামী। কান ধরে টেনে তুললেন তাকে। তারপর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন—'তোকে কে লটারীর টিকিট কাটতে বলেছিল?' সামাদ নিরুত্তর। টিকিট কাটার ইচ্ছাটা তার মজা। তার কাছে লটারীর ব্যাপারটা খেলার মজার মত অনাবিল আনন্দের। ছেলের এই নীরবতা সওকক সাহেবের অসহ্য বোধ হল। মনে হল এ তাঁকে অপমান করা। রাগকে আর দমন করতে পারলেন না তিনি। সপাটে

ছেলের গালে একটা চড় কষিয়ে দিলেন। জেদী ছেলে সামান্য একটুও শব্দ করল না মুখে ; তার শিশুমুখে একরাশ অবাক ভাব এক নিমেষে খেলা করে গেল। ভাবখানা এই—ব্যাপারটা কি ? আব্বাজান হঠাৎ আমাকে মারছেন কেন ? অবাক হয়েই মাথাটা সে আপনি নত করে ফেলল।

সাকিনা বিবি এমনই একটা ব্যাপার আঁচ করেছিলেন। স্বামীকে তিনি যথার্থই চেনেন। টয়লেট থেকে বের হয়ে যখন তিনি দেখলেন ঘর ফাঁকা তখন পুরানো একটা ব্যথা যেন তাঁর বুকে আকস্মিক ধাক্কা দিল। মনের ক্যানভাসে এক একটা আলকাতরার কালো পোঁচ উদ্ভাসিত হতে থাকল। তখন বিয়ের পরে সবে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এখানে নূতন বাড়িতে উঠে এসেছেন। নূতন জীবনের পরতে পরতে মাখানো আছে আনন্দের অভিজ্ঞান। সব কিছুকেই সুন্দর আর স্বাভাবিক বলে মনে হত সাকিনার।

একদিন চাচাত ভাই আহমেদ এসেছে দিদির সাথে দেখা করতে। সাকিনাই চিঠি লিখে আসতে বলেছিলেন। সওকত সাহেবও জানতেন। তবুও সেদিন তাঁকে কেমন যেন অখুশি মনে হয়েছিল। ক্ষুণ্ণ মনের বাঁকাস্রোতটা আরও প্রকটিত হয়েছিল প্রতিদিনকার স্বাভাবিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে হঠাৎ যখন তিনি দুম দুম করে পা ফেলে কোর্টে চলে গেলেন তখন। নাওয়া-খাওয়া আদর সোহাগ শুকনো পাতার মত বিবর্ণ পড়ে রইল। এটা যে রাগের প্রকাশ—আর রাগটা যে কেন, সাকিনা বুঝতে পারলেন না।

পরে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন আহমেদ ফিরে গেছে নিজের ঠিকানায়। কোর্ট থেকে সওকত সাহেব ফিরলেন ঝোড়ো পাখির মত। তার কোথাও যেন বড় কিছু ঘটে গেছে। বাড়ি ফিরেই তিনি বিবিকে কাছে ডেকেছিলেন। সাকিনার বুকে একটা ভয়-ভাবনা চঞ্চলা হরিণীর মত ঘোরাফেরা করছিল। তিনি ধীর পায়ে কাছে গিয়েছিলেন। সওকত সাহেব তখনও কোর্টের পোশাক ছাড়েননি। গম্ভীর গলায় তির্যক স্বরে তিনি বলেছিলেন—'শালাবাবু চলে গেছেন ?' 'হ্যাঁ—তুমি বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই তো···' কথাটা সওকত আলি শেষ করতে দেন নি। জোরের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন—'মিথ্যে কথা !' একটু দম নিয়ে আবার বলেছিলেন—'আমার ভাবতে অবাক লাগে বিবি, তোমার লেখাপড়া শেখার মূল্য কি ? স্বামীর সামনে এতবড় একটা ছোঁড়াকে তুমি যেভাবে জড়িয়ে ধরলে সেটা লজ্জার কথা।' হঠাৎই থেমে গেলেন সওকত আলি। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। কথাটার মধ্যে একটা নগ্ন খোঁচার আভাস ছিল। সাকিনা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ধপ্ করে বসে পড়লেন সোফার উপর। এবার তাঁর সত্যই লজ্জা করছিল। সত্যের থেকে মিথ্যের অস্তিত্বটা যে কত বড় তা তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন।

মানুষের মন কত ছোট ! সন্দেহের দোলা এসে একটা সম্পর্কের বাঁধনকে কত সহজে ছিন্ন করে দিল। একটাও পাল্টা জবাব দেননি সাকিনা। প্রসঙ্গটা অবান্তর. আহমেদ তার চাচার ছেলে। তার থেকে বয়সে ছোট। এক সময়ে দুজনে যৌথ পরিবারে এক-সাথে মানুষ হয়েছেন। দরজার কাছ থেকে ভাইকে দু-হাত ধরে গৃহে আহ্বান করাটা অন্যায় কিনা বুঝে ওঠা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। চুপ করে বসে থাকলেন আরও

কিছুক্ষণ। চোখের জল এসে চুম্বন করছিল তাঁর গণ্ডদেশকে।

এমনি পুরানো দিনের কত ছোট বড় অত্যাচার অবিচারের কথা মনে পড়ছিল সাকিনার। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলেন তিনি। সওকত সাহেব কান ধরে টেনে আনছেন সামাদকে। সাকিনাকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। স্ত্রীর দিকে আগুন দৃষ্টি হেনে বললেন—'বাঁদরটাকে আজ কিছু খেতে দেবে না, আর ও বাড়ির বাইরে যেন যেতে না পায়', বলেই তিনি চলে গেলেন।

সাকিনার মনে পড়ছিল বিশেষ সেই দিনটার কথা। সেদিনও প্রাত্যাহিকতার আস্তরটা কেমন ভেঙেচুরে গিয়েছিল। আজও কষ্টের আঙিনায় একরাশ কালো ঢেকে দিল ছুটির দিনের সোনালী সৌরভকে।

সওকত সাহেবও ভাবনায় ছিলেন। আত্মভাবনে তাঁর মনে হল তিনি কিছু অন্যায় করেন নি। তাঁর মনে হল শাসন না করলে ছেলে হয়ত একদিন মায়ের প্রশ্রয়েই ডাকাত হবে। শেখ পরিবারের মান সম্ভ্রম ধূলায় লুটিয়ে দেবে। বনেদী, প্রাচীন পরিবার তাঁদের। তিন পুরুষের ঐতিহ্য। খাঁটি মুসলমান তিনি। কোন রকম স্খলন তাঁর ধাতে সয় না। তিনি মনে করেন সামাদ লটারির টিকিট কেটে তাঁকে ছোট করেছে। তিনি মানসচক্ষে দেখতে পেলেন সবাই তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলছে—'এই যে শেখ সাহেব; খুব তো প্রতিপত্তির বড়াই করেন। আপনার ছেলে এই মাত্র লটারির টিকিট কেটে নিয়ে গেল। সে কিসের জন্য?' লজ্জায় শেখ সাহেব উপুড় হয়ে বালিশে মুখ ঢাকলেন।

প্রত্যয়ী দুপুরটা পরিণতি পেল।

শেষের কথা : অনুভবঋদ্ধ বিকেল।

বিকেল কথা বলে।

আবদুল সামাদের গালের ব্যথা মরে গিয়েছে, প্রতিদিনকার সহজতা এসে ভুলিয়ে দিয়েছে পিছনের তিক্ততাকে। একদিন শেষ দুপুরে বাড়ির বারান্দার থেকে সে আবুলের উৎকণ্ঠিত ডাক শুনতে পেল। নীচে নেমে দেখতে পেল একজন অচেনা লোক তাদের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় চুল নেই অথচ একমুখ দাড়িগোঁফ। একটু পরে সে চিনতে পারল তাকে। করিমচাচা, লটারির এজেন্ট। মোড়ের মাথায় একটা গুমটি ঘরে ওর দোকান। করিমচাচার হাতে একটা বোর্ড, তাতে ক্লিপ দিয়ে নানা ধরনের, রঙ-বেরঙের টিকিট আঁটা।

বৃদ্ধকে দেখেই সামাদের সেই বাসি দুপুরটার কথা মনে পড়ল। সারা গালটা ব্যথায় চিনচিন করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বলল—'আমি আর টিকিট কিনব না, আব্বাজান মারবে, তুমি যাও।' বৃদ্ধ হেঁ হেঁ করে হেসে উঠলেন। মুখে বললেন, 'তুমার আব্বাজানের ঠেঙে যে একটুন দরকর ছ্যালো বাপজান, তুমি লটারিতে পেরাইজ পেছ।'

সামাদের আনন্দ দেখে কে। সে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে শুরু করল। তারপর

এক দৌড়ে আড়ালে। আবুল একমুঠো ধুলো উঁচুতে নিক্ষেপ করে আনন্দ প্রকাশ করল। মুখে এক নাগাড়ে হেই হেই করে শব্দ তৈরি করতে থাকল। সেদিন সেও মার খেয়েছিল। কিন্তু সেটা তার বেমালুম হজম হয়ে গেছে। সে ক্রমশ বক বক করতে থাকল করিমুল্লার সাথে।

সওকত সাহেব করিমুল্লা খানকে বেশ আদর করেই ঘরের মধ্যে বসালেন। এই প্রথম একজন ছাপোষা সাধারণ মানুষ এর সম্ভ্রমবোধের জাল কেটে [illegible] সহজে প্রবেশাধিকার পেল। সামাদ আর আবুল তখন মুক্তপ্রাণ। এতবড় একটা সংবাদ পাড়াপড়শিদের দিতে হবে তো। ছেলের আজকের এই আপাতে পাগলামোয় সওকত সাহেব বাধা দিলেন না। এরকম একটা সংবাদে শেখ গোষ্ঠীবোধ [illegible] তিনি আত্মতৃপ্ত।

বিনা নোটিশে বাড়ির বারান্দায় একটা চায়ের মিনি আসর বসল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে করিমুল্লা প্রশ্ন করলেন—'তাহলে কি করা যায় শেখ সাহেব?' চোখে মুখে একটা চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে শেখ সাহেব বললেন—'সামাদ নাবালক। তাছাড়া টিকিটটা ওরই কাটা হয়েছে। আর আমি গার্জেন হিসাবে সঙ্গে যাব। ঠিক হল সামনের সপ্তাহে একদিন চাচা এসে ওঁদের নিয়ে যাবেন লটারি-সেন্টারে টাকা তুলতে। বৃদ্ধ হাসি মুখে বিদায় নিলেন।

আর একটা বিকেল। সূর্য মাথার উপর থেকে দিকচক্রবালের দিকে পশ্চিমী গভীরতায় ঢলে পড়েছে। বারান্দায় সমৃদ্ধ চায়ের আসর। আনন্দে ঝলমল করা সাকিনা বিবির মুখে আজ রাজ্যের তিক্ততা। সওকত আলি উজ্জ্বল অনাবিল আনন্দে নিমজ্জিত। মুখে ঝকমকে হাসি। ট্যাক্স বাদ দিয়েও অনাবশ্যক অনেকগুলো টাকা তাঁর হাতে। বালক সুলভ চপলতা ভেবে সামাদের এই হঠাৎ ঘটিয়ে ফেলা কাণ্ডটাকে তাঁর ঐতিহ্যান্বিত শেখ পরিবারের ঐতিহ্যের সমান্তরাল বলেই মনে হচ্ছে।

কদিনই সওকত সাহেবের মনে হচ্ছে বেগম কেমন যেন বিমনা। তবুও কৌতূহল দমন করে তিনি বাসি সংবাদপত্রে মুখ ঢাকলেন। শেখ সাহেবের চেতনা প্রবাহ হঠাৎ ধাক্কা লাগল সাকিনা বেগমের উঁচু গলার নিক্ষিপ্ত প্রশ্নে 'তাহলে তুমি সামাদকে ওভাবে মারলে কেন?' প্রশ্নটা অভাবিত। চোখ তুলে তাকাতেই আবার ব্যথার তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হল—'এত যদি লোভ তোমার তবে কেন ঐ মিথ্যে অহংকারের বোঝা বওয়া? শেখ পরিবারের ঐতিহ্যের তকমা ধরে ছোটো অবোধ ছেলেকে মিথ্যে শাসন করতে লজ্জা করল না তোমার? নাকি তুমি মনে করেছ সংসারে শাসন করবার যোগ্যতা একমাত্র তোমারই আছে? আমরা শুধু খেলার পুতুল! আরও অনেক কথা আমার বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু···তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। কথা বলার শক্তি হারিয়ে উত্তেজনায় আর অভিমানে হঠাৎই তিনি চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখ দুটো তখন অশ্রুর নদী হয়ে গেছে।

সেদিনের দুপুরের সেই ব্যাপারটার মধ্যে সাকিনা দেখেছিলেন স্বামীর আপাত পৌরু-ষত্বের ঈষদ্ আবহ, আর আজ দেখলেন লোভের জয়। সামাদের লটারির টিকিটটা যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন অকারণেই। ভাবতে পারেননি ঐ এক টুকরো কাগজটা তাঁর

সংসারে এমন করে ভাঙন ধরাবে। একটা বড় ভুল ভেঙে গেছে তাঁর।

স্ত্রীর এই অভাবিত আক্রমণে সওকত সাহেব একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। পায়ের শব্দ শুনে পিছু ফিরে দেখলেন সামাদ। তিনি অবসাদক্লিষ্ট কিন্তু দরদী কণ্ঠে ডাকলেন. 'সামাদ', সে তখন তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করেছে। সওকত আলির মনে হল তাঁর ছেলে তাঁকে ভয় করছে। তাঁর অমানুষিকতাকে ভয়। তিনি তড়িৎ গতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটু আগে তাঁর স্বামীত্ব বিপর্যস্ত হয়েছে। তিনি সামাদের পিছু পিছু নামতে শুরু করলেন, তার ছোটার গতির সঙ্গে পেরে উঠলেন না। সামাদ তখন দরজা পেরিয়ে, তাঁর পিতৃত্বকে পদদলিত করে বাঁকা গলিপথ ধরে ছুটছে।

এইভাবে বিকেলটা কথা কয়ে উঠল।